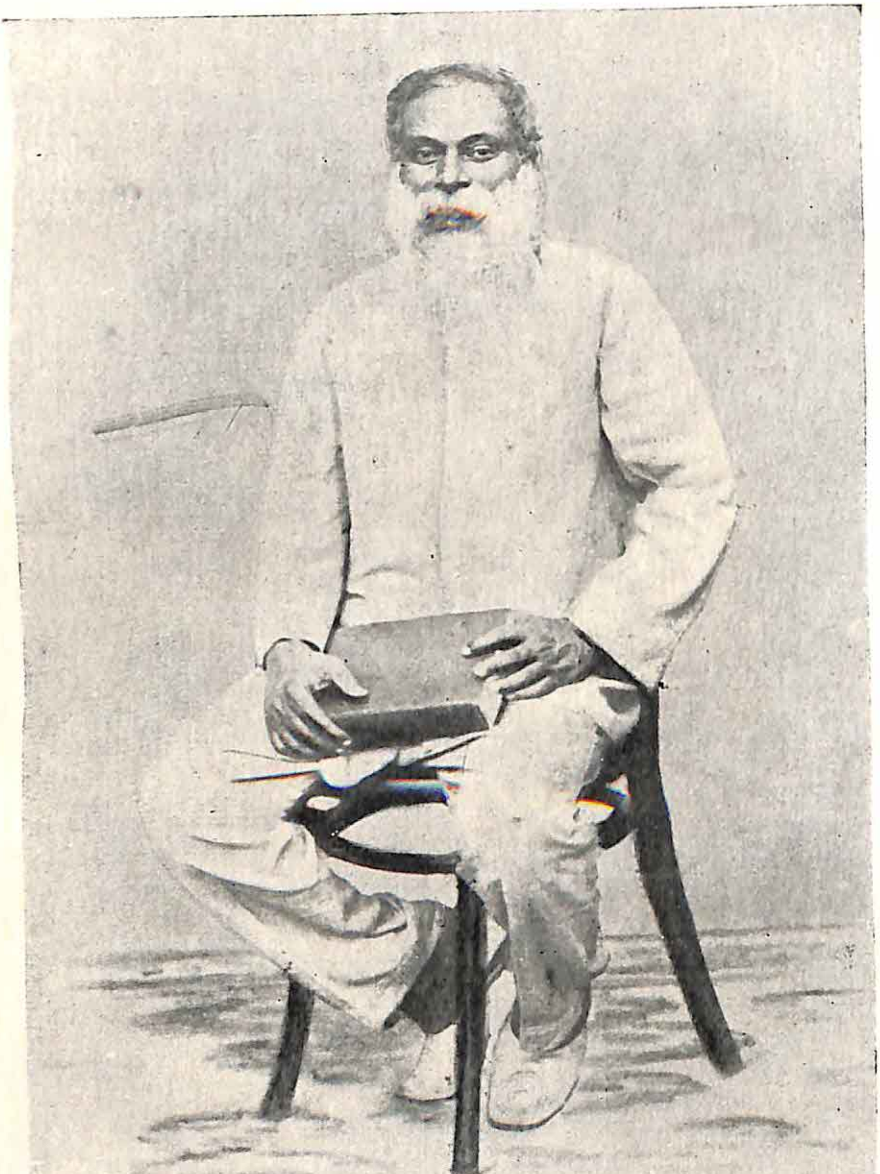
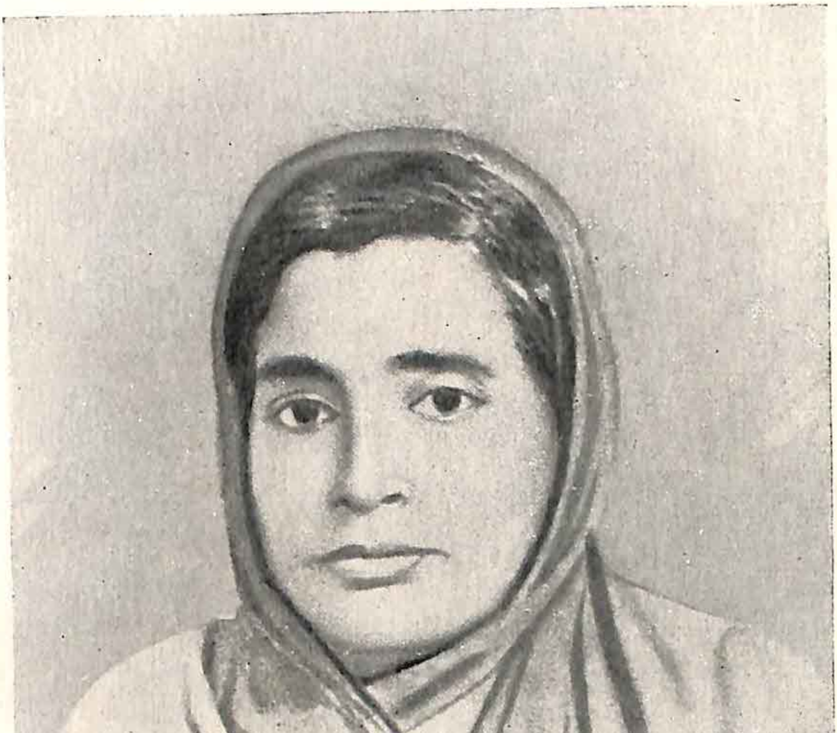


প্রকাশচন্দ্র রায়



অঘোর

অঘোরকামিনী রায়

সূচীপত্র

সূচনা

বিকাশ

চতুর্থ খণ্ড : সেবার্থিনী

পরিণতি

পঞ্চম খণ্ড : সেবিকা

প্রকাশকের নিবেদন

উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের নবজাগরণের যুগ। সেই নবজাগরণ বিচিত্রধারায় উৎসারিত হইয়া আমাদের দেশেরসভ্যতাকে পুষ্ট করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর জীবনীসাহিত্যসম্ভার খুব অল্প নহে। তাহাতে সেই সময়ের ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতির সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

অঘোরপ্রকাশ সেই সময়কার জীবনীসাহিত্যের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ব্যক্তিগত জীবন কিভাবে ধর্মসাধনায় উৎসর্গীকৃত হইয়া জনসমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে তাহার অপূর্ব নিদর্শন এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। একান্তভাবে ব্রহ্ম-সমর্পিতপ্রাণ তদ্‌গতচিত্ত পতিপত্নীর যুক্ত জীবনের অত্যাশ্চর্য সাধনা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের গৃহ কিভাবে গৃহপ্রাচীরের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর জগতের দিগ্‌বলয়ের সহিত একীভূত হইয়া যায় তাহার চমৎকার বর্ণনা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে।

গ্রন্থটি প্রাচীন। বহুকাল পূর্ব হইতেই পাঠক সমাজে অলভ্য অবস্থায় ছিল। ভারত সভ্যতায় উনবিংশ শতাব্দীর দানের মূল্য-নির্ণয়ের একটা আন্তরিক চেষ্টা আজ পশ্চিম বঙ্গে আরম্ভ হইয়াছে। সর্বকালের সর্বস্তরের অবশ্য-পঠনোপযোগী পরমভাগবত সাধক-সাধিকার যুক্তজীবনীগ্রন্থটি এমন সময়ে পাঠক সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হওয়ায় পুস্তকটির পুনঃপ্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। অঘোর-প্রকাশের সুযোগ্য পুত্র পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় মহাশয় পুস্তকটি পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়া আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে চিরতরে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় বইটির ভূমিকা লিখিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন।

আজ পুণ্য ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিন পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। নিবেদন ইতি।

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

উ দ্বো ধ ন

অঘোরপ্রকাশ !

তোমার দেহত্যাগের পর ত্রিশ দিনের দিনে তোমার সঙ্গে যে কথোপকথন হয়, তাহাতে তুমি বলিয়াছিলে, শুদ্ধাচার, শুদ্ধচিন্তা, শুদ্ধ-ব্যবহার না হইলে তোমার সঙ্গে আর অধিক মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই। আরও বলিয়াছিলে, তোমার মত না হইলে উন্নত মিলনের ভূমিতে উপনীত হইতে পারিব না।

সেই দিন হইতে তোমার মত হইবার জন্য আরও ব্যাকুল হইলাম। আবার সেই দিন হইতে, কি জানি কেন, তোমার গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই জীবনীর সূত্রপাত। কত সময়ে তোমার গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছি। দেহে থাকিতে তুমি মিলিত জীবনের এই কাহিনী শুনিতে কত ভালবাসিতে। কতবার পত্রে সে কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করিয়াছি। আজ তুমি আমার কত নিকটে ! এস, দুজনে আবার চিরপরিচিত সেই পবিত্র কাহিনীর আলোচনা করি।

যতদিন তুমি দেহে ছিলে, সদাই দুজনা দুজনার জীবনে যুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছি ; এখনও তাহাই করিতেছি। ইহাতেই আমাদের উন্নতি, ইহাতেই আমাদের অনন্ত আশা। গঙ্গা ও যমুনার মত একেবারে আত্মহারা হইয়া পরস্পরে মিশিয়া গিয়া সাগরে মিলিবার এখনও বুঝি অনেক বিলম্ব আছে। ততদিন, দেখ, আমি তোমার প্রকৃতি লাভের জন্য যত্ন করিতেছি ; এই বৃদ্ধ বয়সে যাহাতে তোমার মত সেবা-পাগল হইতে পারি, নিরন্তর সেই ভিক্ষা করিতেছি। ঈশ্বর করুন, এইরূপে যেন আমি মিশিয়া যাইতে পারি। ঈশ্বর করুন, এই যুক্ত জীবনের কাহিনী যেন নরনারীর কাযে লাগে।

অঘোর পরিবার

বাঁকিপুর, পাটনা

১৯০৭

অঃ প্রঃ

নিবেদন

শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই কাহিনী সঙ্কলন বিষয়ে আদ্যোপান্ত সাহায্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

অঘোর পরিবার
বাঁকিপুর, পাটনা

—প্রকাশচন্দ্র

পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই জীবন-কথা পুনরায় মুদ্রণ করিয়া ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

—সুবোধচন্দ্র রায়

মাঘোৎসব
১১ই মাঘ, ১৩৬৪
৫৭, ল্যাণ্ডস্‌ডাউন রোড, কলিকাতা।

ভূমিকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বহুকাল আগে ছেলে বেলায় অঘোর-প্রকাশ বইখানি পড়িয়াছিলাম; অগ্রজ স্থানীয় শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যায় খানিকটা করিয়া পড়িয়া শুনাইয়া বইখানা শেষ করিয়াছিলেন। কিছুই মনে ছিলনা, কেবল একটি পুণ্য সৌরভের নীহারিকা স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল। তারপরে এতকাল পরে বইখানার একটি নূতন সংস্করণ হাতে আসিল, শুধু তা-ই নয়, ভূমিকা লিখিবার ভারও পাইলাম। বইখানা আবার পড়িলাম, এবার জাগ্রত মনোযোগে পড়িলাম; আজকার জাগ্রত বুদ্ধি বাল্যকালের স্মৃতির সমর্থন করিল এবং ধীরে ধীরে সেদিনকার নীহারিকা ঘনীভূত হইয়া পুণ্য প্রভায় দীপ্যমান যুগ্ম নক্ষত্র জাগিয়া উঠিল; প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী; দুয়ে এক, একে দুই; যুগ্মনাম অঘোর-প্রকাশ।

আমাদের দেশে স্বামীস্ত্রীকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হইয়া থাকে, দম্পতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষরবিন্যাস মাত্র, তদধিক কিছু নয়। আধুনিক জগতে স্বামী স্ত্রী একে একে যুক্ত হইয়া একটি সংখ্যায় পরিণত হয়, কিন্তু একটুখানি আঘাত পাইবামাত্র তাহারা ছিটকাইয়া আলাদা হইয়া আবার একে একে পরিণত হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন সমাজশাস্ত্রবিদ্গণ স্ত্রী পুরুষকে অসম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ মনে করিতেন, বিবাহ সংস্কারের দ্বারা তাহারা আধে আধে মিলিয়া অবিভাজ্য একে পরিণত হইত। এই যোগ রাসায়নিক, সংসারের আঘাতে ইহাতে ফাটল ধরিত না। ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বরতত্ত্ব। এইরূপ বিবাহই যথার্থ সবর্ণ বিবাহ।

এখন এইরূপ রাসায়নিক যোগ ঘটাইতে তাপের আবশ্যক। এখনকার সমাজ আইনের হাপরে এই তাপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। হাপর থামিলে তাপও শীতল হয়; মানুষের সৃষ্ট তাপ নিতান্ত

আকস্মিক ও সাময়িক। সংসারে একটি মাত্র তাপ আছে যাহা মনুষ্যসৃষ্ট নয়; এই তাপ ভগবদ্‌ভক্তি, এই তাপ যাহাদের যুক্ত করে তাহারা কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না; এই তাপে দুই ভগ্নাংশ মিলিত হইয়া অবিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত হয়; সার্থক অর্থে তখন তাহারা দম্পতি। অঘোরপ্রকাশ আদর্শ দম্পতি। প্রকাশচন্দ্র ও অঘোর কামিনীর এই যুক্ত জীবনী সেই আদর্শ দাম্পত্য জীবন গড়িয়া তুলিবার আধ্যাত্মিক ইতিহাস। এই বিশেষ অর্থে বইখানা বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ। ইহার জুড়ি নাই। প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীর জুড়ি মেলাও দুষ্কর।

২

অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহস্থের উপরে অর্থাভাবের চাপ আসে। সেকালের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রকাশচন্দ্রের অর্থাভাব হইবার কথা নয়। কিন্তু তাঁহার গৃহ তো তাঁহার একার নয়। আত্মীয় স্বজন, দূর নিকট বন্ধু বান্ধব, পরিচিত অপরিচিত ধর্ম্মবন্ধু প্রভৃতি সকলের জন্যই তাঁহার দ্বার অবারিত। এ রকম ক্ষেত্রে অর্থাভাব না ঘটিয়া পারে না। কিন্তু তার উপরে আবার অঘোরপ্রকাশের প্রতিজ্ঞা কখনো ঋণ করিবেন না, এবেলা-ওবেলার জন্যও ঋণ করিবেন না; সকাল বেলা দ্রব্য কিনিয়া বিকাল বেলা মূল্য দেওয়া হইবে এতটুকুও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না। এরকম ক্ষেত্রে সংসার চলাই দায়। তবু তাঁহাদের যে সংসার চলিয়াছিল, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, তার কারণ অঘোরপ্রকাশের ব্রহ্মপরায়ণতা। ভগবানের উপরে সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই সত্যরক্ষক ভগবান তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াও সংসার চালাইয়া দিয়াছিলেন। ব্রহ্মপরায়ণতার নিদর্শন গ্রন্থখানির পাতায় পাতায়। অর্থাভাব দম্পতির সম্বন্ধে এতটুকু ফাটল ধরাইতে পারে নাই। এই আধিভৌতিক পরীক্ষায় দেবতা তাঁহাদের উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা তো আর

এক রকম নয়। আধ্যাত্মিক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁহাদের জয়। কিন্তু সে জয় এত সহজে ঘটে নাই—কারণ সে পরীক্ষা কঠিনতর।

ইন্দ্রিয় সংযম চাই। দম্পতির কঠোর প্রতিজ্ঞা তাঁহারা কায়িক সম্বন্ধের উপরে উঠিবেন। পদে পদে দিনে রাত্রে সে কী কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম। সমস্ত অভিজ্ঞতাটি 'আধ্যাত্মিক বিবাহ' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনা যেমন করুণ তেমনি আত্মজয়ের আভায় সমুজ্জ্বল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কাহার শক্তি অধিক নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন—দুইজন দুইজনের সহায়ক। এমন বলিয়াই তো যথার্থ অর্থে দম্পতি।

এ যেমন ভিতরের দিকের কথা তেমনি বাহিরের দিকের বিবরণও সমান শিক্ষাপ্রদ। অঘোর কামিনী স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই, নিজেকেই নিজে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিজে একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন তিনি। সেই বিদ্যালয়ে অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পরিণত বয়সে অঘোরকামিনী লক্ষ্ণৌ সহরে গেলেন, মিস্ থোবর্ণের বিদ্যালয়ে ছাত্রীরূপে। আদর্শ গৃহিণী সেখানে আদর্শ ছাত্রী।

গৃহিণীরূপে, শিক্ষয়িত্রীরূপে, আত্মীয় অনাত্মীয়ের অভিভাবিকারূপে, পত্নীরূপে সর্বত্র তাঁহার সমান প্রভাব, সমান সাফল্য। এমন হইবার কারণ তাঁহার, তাঁহাদের স্বামীস্ত্রীতে মিলিয়া অঘোরপ্রকাশ একটি সত্তা, জীবনের কেন্দ্র অচল অটল ব্রহ্মপরায়ণতা। ব্রহ্মনিষ্ঠা অঘোর-প্রকাশের জীবনের মূল মন্ত্র।

৩

ঊনবিংশ শতকে বাংলা দেশে একটি প্রবল ধর্ম্ম ভাবের তরঙ্গ আসে, সে তরঙ্গে বাঙালীর সামগ্রিক জীবন প্লাবিত হইয়া যায়। মূল প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন রামমোহন। কিন্তু তারপরে অতি দ্রুত বেগে ইহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—অপ্রত্যাশিত ইহার

প্রতিক্রিয়া। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ায় রামমোহন প্রচারিত "বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মান্দোলন" পুষ্ট হইয়া ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপ গ্রহণ করে। আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুধর্ম্ম নূতন প্রেরণা লাভ করে। ইহাকেই অপ্রত্যাশিত বলিয়াছি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে ধর্ম্মের এই তিনটি রূপই বাঙালীর প্রাণে রসের সঞ্চার করে—এই তিনের অন্তর্গত খ্রীষ্টধর্ম্মও বটে। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিলেও ধর্ম্মপ্রাণতা ত্যাগ করেন নাই, তিনি ভক্তিমান্ খ্রীষ্টান ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরণা যাঁহাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম উল্লেখ-যোগ্য। হিন্দু ধর্ম্মে অনুরূপ দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাশাস্ত্রী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক যিনি যে পর্য্যায়ভুক্ত হোন না কেন সকলেই মূলতঃ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। ইহাতে প্রমাণ করে যে গত শতকে সামগ্রিক ভাবে আমাদের জীবনের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল ধর্ম্ম। ধর্ম্মকেন্দ্রে সুদৃঢ়ভাবে বিধৃত ছিল বলিয়া তৎকালীন বাঙালীর জীবন-চক্র এমন আশ্চর্য্য নিপুণতায় ঘূর্ণিত হইয়াছিল।

কেন্দ্রবিধৃত জীবন সার্থক জীবন। তাই সেকালের বাঙালী এমন আশ্চর্য্য সার্থকতা লাভ করিয়াছিল সর্ব্বক্ষেত্রে। সে সার্থকতা আজ ইতিহাসের ব্যাপার।

কেন্দ্র বিধৃত জীবনের আশীর্ব্বাদে সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর জীবন পুষ্ট হইয়াছিল। ইহারই একটি সার্থকতম দৃষ্টান্ত প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীর দাম্পত্য জীবন।

বাঙালীর জীবন এখন কেন্দ্রচ্যুত। কখনো সাহিত্য, কখনো রাজনীতি, কখনো ব্যবসায় বা চাকুরী অবলম্বন করিয়া টলমল করিতেছে, সর্ব্বদা সন্তঃপাতী। এহেন সময়ে এমন একটি কেন্দ্র বিধৃত জীবন কাহিনী পাঠ তাহার পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ হইবে বলিয়া মনে করি।

৪

এবারে অঘোরপ্রকাশ বইখানার রচনারীতি সম্বন্ধে তু' একটি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। বইখানা অঘোরকামিনী ও প্রকাশচন্দ্রের জোড়-কলমে লিখিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আধ্যাত্মিক মিলনের ফলে তাঁহারা তু'জনে একটি ব্যক্তিত্বে, একটি সত্তায় পরিণত হইয়াছিলেন। বইখানার অনেকটা অংশ অঘোর কামিনীর ডায়ারী ও চিঠিপত্রে পূর্ণ। কোথাও এতটুকু বেখাপ হয় নাই, এতটুকু ফাঁক পড়ে নাই। এমন যে সম্ভব হইয়াছে তাহার কারণ—স্বামীস্ত্রীর চিন্তা চেষ্টা মনন অভিন্ন—কলমও অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই প্রকাশ্যতঃ গ্রন্থকর্ত্তা প্রকাশচন্দ্র হইলেও অঘোর কামিনীর কলমও মিলিত হইয়া গিয়াছে রচনা স্রোতে। সেই জন্যই বইখানাকে আগে অনন্যসাধারণ বলিয়াছি। এমন তু'জনের জোড়-কলমের রচনা বাংলা-সাহিত্যে আর নাই। তু'জনের ব্যক্তিত্ব এক হইয়া গিয়াছে, কলম অভিন্ন থাকে কিরূপে?

মাঘ, ১৩৬৪।

প্রকাশচন্দ্র রায়

জন্ম : শ্রীপুর, ১০ই জুলাই ১৮৩৭। মৃত্যু : বাঁকিপুর, পাটনা, ৭ই ডিসেম্বর ১৯১১।

অঘোর কামিনী দেবী

জন্ম : শ্রীপুর, জুন ১৮৫৬। মৃত্যু : বাঁকিপুর, পাটনা, ১৫ই জুন ১৮৯৬।

বিবাহ : শ্রীপুর, ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬।

অঘোর-প্রকাশ

সূচনা

প্রথম খণ্ড ঃ বধূ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহ

তোমার পিত্রালয়ের কেহই তোমার জন্মের তারিখ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। ১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে অথবা ইংরাজী ১৮৫৬ সালের মে-জুন মাসে জেলা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত মাইহাটী পরগণাভুক্ত শ্রীপুর গ্রামে তোমার জন্ম হইয়াছিল। একেতো কন্যাসন্তান, তাহাতে আবার পল্লীগ্রামে জন্ম, কেমন করিয়া ঠিক থাকিবে? তোমার পিতামহ হরচন্দ্র বসু মহাশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। পল্লীতে তাঁহার সাহস, দানশীলতার বিষয় অনেক শুনা যায়; দেশীয় পূজা পার্বণ অনেক করিতেন। তোমাদের বাটীতে দুর্গোৎসব বড় ধুমধামে হইত। মনে হয় ১৮৬২ সালে তোমাদের বাটীতে যে পূজা হয় তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আমি তোমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম এবং ধুমধাম দেখিয়া একটু স্তম্ভিত হইয়া আসিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে তোমার সহিত আমার পরিণয় হইবে। তোমার পিতা বিপিনচন্দ্র বসু মহাশয় নিজে উপার্জ্জন করিতেন। কণ্ট্রাক্টারের কার্য্য করিয়া অনেকের সাহায্য করিতেন। তিনি স্বয়ং আমাদের বিবাহের কথা স্থির করিয়াছিলেন।

১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে বহরমপুরে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা স্বর্গীয় প্রাণকালী রায় সেখানে কালেক্টরের আফিসে কার্য্য করিতেন। পরোপকার ও শুদ্ধাচারের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আমি তাঁহার অষ্টম সন্তান। আমার সেজদাদা পূর্ণচন্দ্র রায়ও
বহরমপুরে কর্ম্ম করিতেন। আমাদেরও পৈতৃক নিবাস শ্রীপুর গ্রামে।
আমাদের তখন কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল।

আমার ১৬ বৎসর বয়সে পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন।
বালককালে আমার লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত হয় নাই। পড়া অপেক্ষা
খেলাই অধিক ভালবাসিতাম। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া মন্দ ছেলেদের
সঙ্গে মিশিয়া অনেক কুঅভ্যাস শিখিয়াছিলাম। শৈশবে আমাদের
বহরমপুরের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী রঘুনাথ বিগ্রহের প্রতি আমার প্রগাঢ়
বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। একবার স্কুলে পরীক্ষার সময় রঘুনাথের নিকট
অনেক প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে যেন আমি প্রথমস্থান অধিকার করি।
দৈবাৎ পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে আমি পীড়িত হইলাম। পরীক্ষাতে
প্রথমস্থান অধিকার করিতে পারিলাম না। ইহাতে রঘুনাথজীর
উপর আমার শ্রদ্ধা কমিয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর সেজদাদা যশোহরে বদলী হইয়া গেলেন।
আমাদেরও বহরমপুর ছাড়িতে হইল। পাঠের জন্য আমি কলিকাতায়
আসিলাম। পরিবার পরিজন স্বদেশে গেলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুল
হইতে ১৮৬৪ সালে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলাম। কোনও
রূপে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হই। চরিত্র যেমন তেমনই রহিল। তারপর
বৎসর এফ্‌ এ পড়িতে আবার বহরমপুর গমন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বেই Tom Payne এর Age of Reason
নামক পুস্তক পাঠ করি। তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ হয়।
সেই সন্দেহ আরোও বর্দ্ধিত হইল যখন দর্শন শাস্ত্র পড়িতে
লাগিলাম। ক্রমে আমি একজন ঘোর ধর্ম্ম-বিদ্বেষী হইয়া উঠিলাম।
সকলের সঙ্গে তর্ক করিতাম ও তর্কে যেন জয়লাভও করিতাম।

কিয়ৎকাল পরে সেজদাদা মহাশয় কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের
কর্ম্মচারী হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। একদিন আমি কলিকাতার
বাসায় বসিয়া আছি এমন সময়ে স্বর্গীয় গোপীনাথ রায় চৌধুরী

খুড়ামহাশয় (তোমার প্রিয় পিসামহাশয়) সেজদাদার নিকট হইতে কি পরামর্শ করিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রকাশ, তোমার বিবাহ করিতে কি কোন আপত্তি আছে?" আমি কেবল বলিলাম "না"। জানিনা কেন আমি "না" বলিলাম। বিবাহ হইবে ঠিক হইল। দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইতে লাগিল।

বিবাহ এক নূতন ব্যাপার। আমার মন খুব উৎসুক হইল। বহরমপুর কলেজ হইতে ছুটি লইয়া শ্রীপুর গমন করিলাম। ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সকলেই অতি যত্ন করিলেন। কেবল একস্থানে অন্যথা মনে হইল, তাহা আমাদের গুরুবাড়ীতে। এ সময়ে আমি নাস্তিক, কিছুই মানিতাম না। মাতার ইচ্ছায় ও আজ্ঞায় গুরুবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গেলাম। আমার পালকী গুরুবাড়ীতে আসিল; কেহ বড় অভ্যর্থনা করিল না। আমি বৈঠকখানায় উঠিলাম। ভিতরে যাইতে আজ্ঞা হইল, অন্তঃপুরে গেলাম। কতকগুলি স্ত্রীলোক গোলমাল করিতে লাগিলেন; তাহার পর কিছু মিষ্টান্ন দেওয়া হইল। সমস্ত দিনই তো আহার করিয়া বেড়াইতেছি, এখানেও একটু খাইলাম। খাইয়াই অব্যাহতি পাইব মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইল বটে, কিন্তু আদেশ হইল, "উচ্ছিষ্ট পাত উঠাইয়া লইয়া যাও।" সে বাটীতে ভৃত্য ছিল, আমার সঙ্গেও ভৃত্য ছিল। কিন্তু আমাকেই উঠাইতে হইবে। কি আশ্চর্য্য! যে বর সকল স্থানে আদর ও সম্মান পাইয়া আসিল, আজ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গুরু বাটীতে তাহার এই দুর্দ্দশা! গুরুগিরিকে ধিক্কার দিলাম। যাহাতে এই গুরুগিরিতে আমার সহায়তা না করিতে হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু কি করি? ভয়ে ভয়ে উচ্ছিষ্ট উঠাইয়া লইলাম।

১২৭২ সালের ফাল্গুন মাসে (ইংরাজী ১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী —মার্চ্চ মাসে) আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের কথা বলিতে ভাল লাগে। কেন না বিবাহের সময় হইতেই আমার জীবনের স্রোত

পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমার বেশ স্মরণ আছে বিবাহের রাত্রে যখন তোমার হাতে আমার হাতে এক করিয়া দেওয়া হইল, তখন আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে নিজের স্বভাব সংশোধন করিব ও এই রমণীর উপযুক্ত হইব। উহার পূর্ব্বে কখনও তোমাকে ভাল করিয়া দেখি নাই। কেবল একদিন গ্রামের পথে চলিতে চলিতে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তুমি পলায়ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, আমি তোমার ছায়ামাত্র দেখিয়াছিলাম; যখন বিবাহের কথা হইল তখন তুমি একদিন তোমার ভাবী বরকে দেখিবার জন্য খোলা ছাতে উঠিয়াছিলে, এবং অন্যমনস্কতা বশতঃ পূর্ব্বদিকের বাগানে পড়িয়া গিয়াছিলে। যদি নীচে গাছ ও স্তূপাকারে কাষ্ঠ না থাকিত, তাহা হইলে বাঁচিতে কি না সন্দেহ। ইহার পর একেবারে সেই বিবাহ রাত্রির শুভদৃষ্টি; ইহাতেই এমন ভালবাসার বীজ বপন হইল যে আর সকলই ভুলিয়া গেলাম। একই ধ্যান, একই জ্ঞান হইল। তখন আমার প্রাণের ঈশ্বরকে চিনিতাম না যে তাঁহাকে ভালবাসিব। ঘোরীকে* চিনিলাম, আর ঘোরীকেই ভালবাসিতে লাগিলাম। আমাদের বিবাহে বেশ ধুম ধাম হইয়াছিল। আমাদের গ্রামের ও পার্শ্বস্থ গ্রামের অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। আহারাদিতে উভয় পক্ষের অনেক খরচ হয়। সে সময় আমাদের বিষয়পত্র থাকাতে প্রজাবর্গও অনেক আসিয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রের মন্ত্র কি পাঠ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু বিবাহ চিরকালের মত হইল ইহা স্থির বুঝিলাম। বিবাহের রাত্রে তোমার সঙ্গে কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বাসরঘর লোকে পরিপূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহা ঘটে নাই। এমন কি তোমার হস্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিলাম, তাহাও বিফল হইল। তুমি বালিকা, তোমার বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসর মাত্র, আমার তখন আঠার বৎসর, তাই মনে হয়, বাল্য বিবাহের বাসর ঘরে লোক থাকা ভাল, তাহাতে বালিকার

* তোমার পিত্রালয়ের ডাক নাম।

প্রাণ বাঁচে। পরদিন গৃহযাত্রা করিলাম। তোমাদের বাড়ী হইতে আমাদের বাড়ী কতই বা দূর, কিন্তু যাত্রার সময় তোমার বড় পিসীমাতা এমন ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, যে দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। তিনি তোমাকে এত ভালবাসিতেন তাহা জানিতাম না। তোমার পিতাঠাকুর মহাশয় প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে আমাকে বিদায় দিলেন। আর তাঁহার সঙ্গে আমার ইহলোকে দেখা হয় নাই।

আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বরণ করিয়া পুত্র ও বধূকে ঘরে লওয়া হইল। পরের দিন ভারে ভারে ফুলশয্যার দ্রব্যাদি আসিল। অনেক বস্ত্রাদি পাইলাম, কিন্তু আমার সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। আমি কেবল চেষ্টা করিতেছিলাম যে কিরূপে তোমাকে কথা বলাইব। কত চেষ্টা করিলাম, কত সাধ্য সাধনা করিলাম, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। পিত্রালয়ের কে যে তোমাকে কি শিখাইয়া দিয়াছিল তাহা জানি না। আমাদের বিবাহের নয় কি দশ দিন পরে আমাদের গ্রামে আর একটী বিবাহ হয়। তোমার হরনাথ জ্যাঠা-মহাশয়ের কন্যার বিবাহ। সেই বিবাহে টাকীর বিপিন বসু বরযাত্র আসিয়াছিলেন। তিনি বরযাত্রদিগের সঙ্গে শয়ন করিতে অসুবিধা জানিয়া আমাদের বাটীতে আসিলেন, ও তাঁহার দিদিকে (আমার মেজদাদার পত্নীকে) বলিলেন, যে সে রাত্রি আমাদের বাটীতে শয়ন করিবেন। বাটীতে আর অধিক ঘর নাই। মধ্যম বধূ আমাকে বিরক্ত করিবার জন্যই হউক, কিংবা তাহার ভ্রাতার অভ্যর্থনার জন্যই হউক, সোজাসুজি বলিয়া দিলেন, "ছোট বাবুর সঙ্গে শয়ন করিও।" এ কথা আমার ভাল লাগিল না। একদিন পরে তুমি পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে, আমিও পাঠস্থানে চলিয়া যাইব, ইহার মধ্যে আবার এ কি বিপত্তি হইল! আমি আমার শয্যা ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু তোমার নৈকট্য ছাড়িতে পারিলাম না। মধ্যম বধূকে বলিলাম "মাঝের বড় ঘরে মাটির উপরে আমার শয্যা প্রস্তুত হউক।" তাহাই হইল;

কিন্তু এত চেষ্টার কোনও পুরস্কার পাইলাম না; তোমাকে একটিও কথা কহাইতে পারিলাম না। পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বরাত্রে কেবল বলিয়াছিলে, "কাল আমি চলিয়া যাইব।" ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। তোমাকে কতই আশীর্ব্বাদ করিলাম। তুমি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলে। আমিও সঙ্কল্প করিলাম, এ স্ত্রীর উপযুক্ত হইব; চরিত্র পবিত্র করিব। তখন ধর্ম্মের ধার ধারি না; ঈশ্বরকে জানিতাম না; তোমার জন্য পবিত্রতা আমার বাঞ্ছনীয় হইল।

তখন সেজদাদা কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেছেন। তিনি আমাকে নিজের কাছে রাখিবার জন্য অনেক বলিলেন। কিন্তু আমার মন তাহাতে প্রস্তুত হইল না। বহরমপুরের বাসায় একটু স্বাধীন ভাবে থাকিতে পাইব বলিয়া সেইখানেই চলিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শ্বশুর পরিবার

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সময়ে দার্শনিক পুস্তক সকল পড়িয়া আমার ধর্ম্মভাব শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। আমি নাস্তিক হইয়াছিলাম। যদি মনের ঐ গতি চিরস্থায়ী হইত, আমার এবং তোমার দশা কি হইত! কিন্তু ভগবান তাহা হইতে দিলেন না। বহরমপুরে তখন শ্রদ্ধাস্পদ এস জে হিল্ সাহেব পাদরী ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাকে আপনার সন্তানের মত দেখিতেন। হিল্ সাহেবের নিকট বাইবেল পড়িতে লাগিলাম ও তাঁহার সাধু চরিত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এবার বুঝিতে পারিলাম সাধু চরিত্র কাহাকে বলে। খ্রীষ্টকে ইনি জীবনে পাইয়াছিলেন; ভারতবাসীকে বড় ভাল বাসিতেন; এমন বাঙ্গালা বলিতেন মনে হইত ঠিক যেন একজন বাঙ্গালী কথা কহিতেছেন।

ইহার পর দুমাসের মধ্যে তোমাদের বাড়ীতে মহাবিপদ হইল।

তোমার পিতার ভীষণ বসন্তরোগ হইল। তিনি পরলোকগত হইলেন। শোকের আবেগে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুমি পিতার মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়াছিলে। তাহাতে তোমারও বসন্ত হইল। ক্রমে তোমার ভগিনী যামিনী ও ভ্রাতা জ্ঞানেরও হইল। আমি সংবাদ পাইয়া দেখিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু সেজদাদার অনুমতি না হওয়াতে যাইতে পারিলাম না। মনে বড়ই কষ্ট হইল। মনের কষ্ট মনেই রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তোমরা দুটী ভগিনী শীঘ্র নীরোগ হইলে কিন্তু ভ্রাতা জ্ঞানকে লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। জ্ঞানের সেবায় তোমাকে ব্যস্ত থাকিতে হইল। বিধবা মাতা অন্য সন্তানদের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। জ্ঞানের সমুদয় ভার তোমারই উপরে পড়িল। তখন তোমার বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। জ্ঞানকে লইয়া ভবানীপুরে তোমার মাতামহের বাটীতে আসিতে হইল। অনেক পরিশ্রম ও সেবার পর জ্ঞান বাঁচিলেন, কিন্তু একটী চক্ষু গেল।

বিবাহের কিছুকাল পরে তোমার চরিত্রের একটী সুলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। তুমি অল্প বয়সেই রন্ধনপটু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলে। কর্ম্মের বাটীতে অনেক কর্ম্ম করিতে পার বলিয়া তোমার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। একদিন কোন কর্ম্মোপলক্ষে পাড়ার কুটুম্বদের বাটীতে আহূত হইয়া গিয়াছিলে। রন্ধন শেষ হইয়া গেলে প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত নারীরা কিরূপে সমাদর পাইতেছেন দেখিতে গেলে। আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিলে; যাঁহারা ভাল বস্ত্র, ভাল অলঙ্কার পরিধান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের যত্ন হইতেছে, আর যাঁহারা সামান্য বস্ত্রে এবং বিনা অলঙ্কারে আসিতেছেন, তাঁহাদের আদর হইতেছে না। আহারের সময়ও এই বিভিন্ন আচরণ দেখা গিয়াছিল। বালিকা তুমি, তোমার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। ধনের প্রতি এত সমাদর? এ কি অন্যায়! সেই দিনই তোমার সংকল্প হইল, তুমি যথাসাধ্য দুঃখীর সহায়তা করিবে।

কয়েক মাস পরে আমিও বহরমপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলাম। তখন হিল্ সাহেবের চরিত্রের ছবি আমার হৃদয়ে পড়িয়াছে। ঈশার ধর্ম্মে যে মানুষ ভাল হইতে পারে তাহা বুঝিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়া খ্রীষ্টীয় ভ্রাতাদের সঙ্গে আলাপ ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতে লাগিলাম। এ সময় আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ছিলাম। যে ধর্ম্মে শাস্ত্র নাই সে ধর্ম্মে কিরূপে মুক্তি হইবে বুঝিতে পারিতাম না। স্বয়ং ঈশ্বরই যে শাস্ত্র এ কথা বুদ্ধির অগম্য ছিল। আর এক কারণ এই যে ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। বহরমপুরের ব্রাহ্মধর্ম্মে আমার মন উঠে নাই। সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ ছিল, কিন্তু তাহাতে গিয়া সুখ পাইতাম না। জীবনশূন্য ধর্ম্মে আমার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না। সুতরাং হিল্ সাহেবের জীবনগত ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হইতে লাগিলাম। অনেক খ্রীষ্টীয় পুস্তক পড়িতে লাগিলাম। খ্রীষ্টান হইবার জন্য মন প্রস্তুত হইতে লাগিল। মানুষের পরিত্রাণ ভিন্ন চলে না, বুঝিলাম। একদিন রাত্রি ১১টার সময় পাঠ-শেষ করিয়া বলিলাম, আগামী কল্য আমি খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত (baptised) হইব। আমার প্রকোষ্ঠে একজন বাল্যসখা শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কতই প্রবোধ দিলেন। তোমার সঙ্গে তখন নূতন বিবাহ হইয়াছে, তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু কিছুতেই মন মানিল না। পরিত্রাণ কিসে হইবে এই চিন্তা তখন আমার মনকে অধিকার করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে কথায় কথায় মনে পড়িল যে আমার প্রিয় শিক্ষা-গুরু শ্রদ্ধেয় ঈশানবাবু বলিতেন, কোন গুরুতর কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টা সময় লইও। আমি ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে স্বীকার করিলাম। এত দিন যদি গিয়াছে তো ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে আর কি হইবে? এক দিনের জন্য নিরস্ত হইলাম। সেই রাত্রে যদি খ্রীষ্টান হইতাম তাহা হইলে কি হইত জানি না। যাহাই হউক, আমার এ ভাব তাহা হইলে দেখিতে পাইতে না। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে

কি না, তাহাই বা কে জানে? সেই যে ২৪ ঘণ্টার সময় লইলাম তাহাতেই রক্ষা। পর দিন বৈকালে শুনিলাম একজন খ্রীষ্টান সমপাঠী প্রশ্নের কাগজ চুরি করিয়াছেন। পরীক্ষার দিনে রেজিষ্ট্রার সট্‌ক্লিফ্ সাহেব তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমাদের পরীক্ষা বন্ধ হইয়া গেল। পুনরায় পরীক্ষা লওয়া হইবে এই হুকুম হইল। যখন খ্রীষ্টান ভাইকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল, আমার মন কেমন করিতে লাগিল। ভাবিলাম খ্রীষ্টান হইলেও চুরি করা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না; খ্রীষ্টান হইলেই তো নবজীবন লাভ হয় না। এই সকল চিন্তা করিয়া আমার খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা লওয়া হইল না।

ইহার পর ১৮৬৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটীর সময় আমাদের গ্রামে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। বিবাহের পর তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। তখনও তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই। তুমি একবারে একদিনে আমার হাতে আত্মসমর্পণ করিতে পার নাই। এমন কি এই সময়ে আমার উপর বিরক্ত হইয়া এক দিন বলিয়াছিলে, "এ সকল শয্যাদি কোথায় পাইলে? আমার বাবা দিয়াছেন তবেই তো পাইলে?"

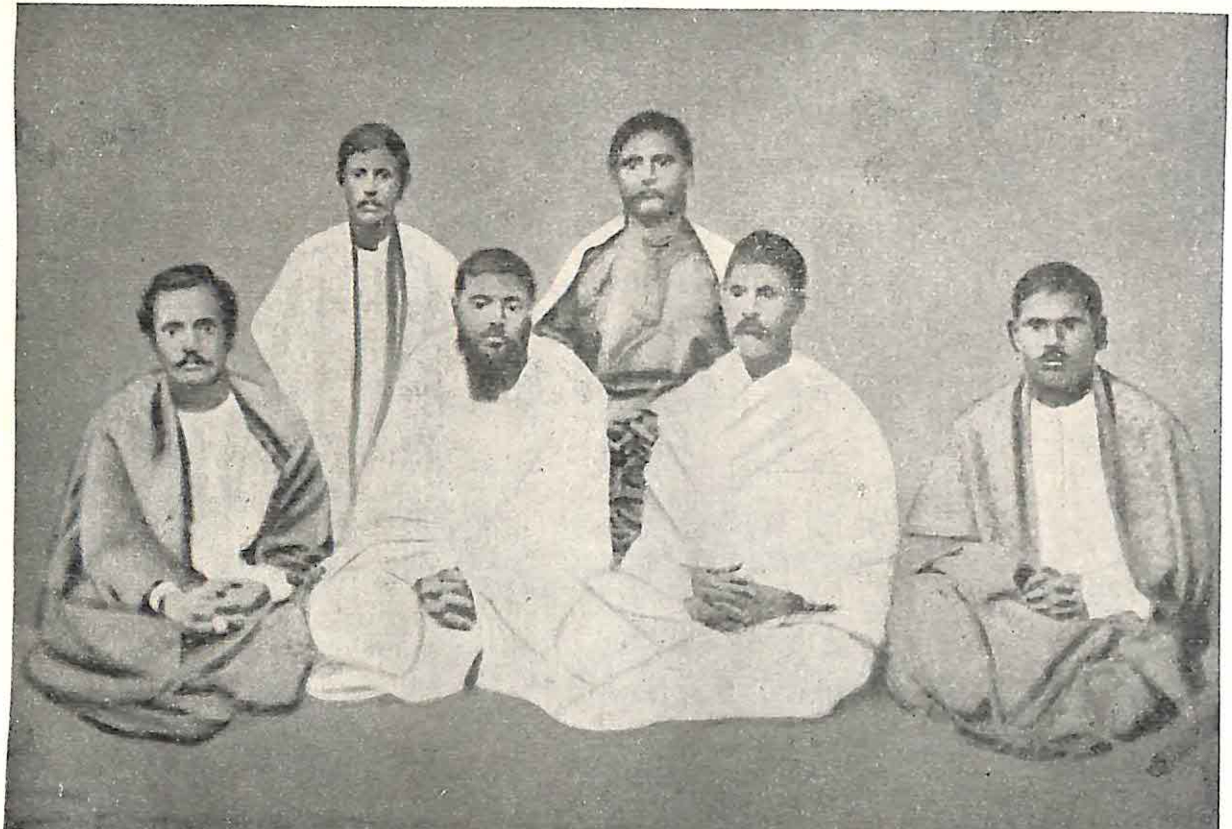
১৮৬৭ সালের মধ্য ভাগে সেজ-দাদা দেশ হইতে সমুদয় পরিবার কলিকাতায় আনিলেন। ভবানীপুরে বাসা স্থির হইল। অন্যান্য সকলের সঙ্গে তুমিও আসিলে। বিবাহের পরে তোমার সঙ্গে এই দ্বিতীয় বার একত্র থাকা হইল। তোমার সঙ্গে একত্র থাকিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু তাহার উপায় ছিল না। এই সময়ে তোমার নামে বাটীর সকলে অনেক নিন্দা করিত। বধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া প্রথম প্রথম যেরূপ নিন্দিত হন, সেইরূপ নিন্দা। আমার কষ্ট হইত, আর ভাবিতাম, তোমার যা যা দোষ আছে মিষ্ট কথায় হয়তো সে সব ভাল করা যায়। এ সময়ে দিনের বেলা তোমার সঙ্গে দেখা হইত না। নিদ্রার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দেখা হইত। এরূপ অবস্থায় ভালবাসা জন্মিতে যে কত দিন লাগে তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। তুমি একজন

আর আমি একজন যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব হইয়া অবস্থিতি করিতাম।

এই সময়ে তুমি কত বুদ্ধি ধরিতে, তাহার একটী গল্প বলি। তৃতীয় বধূর বৃদ্ধা ধাত্রী বাড়ীর খিড়কীর পুকুরে কাপড় কাচিতেছিল। তুমিও সে ঘাটে কাজ করিতে গিয়াছিলে। দৈবাৎ তোমার হাতের জলের ছিটা তাহার গায়ে লাগে। অল্পবয়স্কা নূতন বধূকে কেহই গ্রাহ্য করে না। তোমাকে সে বৃদ্ধা খুব বকিয়া দিল। তুমি কি বলিয়া তার উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিলে "তুমি এত বকিতেছ কেন? তুমি কি আমার সতীন?" তুমি বুঝি "সতীন" অপেক্ষা তীব্র কথা পাইলে না। পাইবেই বা কিরূপে? "সেজুতি" ব্রত, আর আরও কত সব ব্রত করিয়া বাল্যকাল হইতেই সতীনকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলে। যাহা হউক তোমার ঐ কথা লইয়া অনেক কথা শুনিতে হইল। তখন এইরূপ ছিলে, আর সেই তুমি পরে কত বুদ্ধিমতী বলিয়া পরিচিতা হইয়াছিলে।

যাহা হউক, এইবারেই তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল। তুমি বুঝিতে লাগিলে যে আমি তোমার আপনার লোক। কিন্তু আমাদের একত্র থাকা অধিক দিন হইল না। সেজ-দাদার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। পরিবারবর্গকে কলিকাতা হইতে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

খ্রীষ্টান হইবার সঙ্কল্প ঘুচিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্য কোন ধর্ম্মে তখন পর্য্যন্তও মন বসিতেছে না। এই অবস্থায় ১৮৬৭ সালের শীতের ছুটীতে দেশে গেলাম। একদিন বাটীতে বসিয়া আছি, এমন সময় আমাদের গ্রামের কয়েকজন সঙ্গী আসিয়া আমাকে ডাকিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের ভাবী শিক্ষক কেদারনাথ রায়, মিটিওরোলজিক্যাল্ অফিসের ভাবী প্রধান কেরাণী (পরে রাও সাহেব) ফণীন্দ্রমোহন বসু ও পটলডাঙ্গার কবিরাজ পঞ্চানন ঘোষ কবিরত্নও ছিলেন। ইঁহারা বলিলেন, যোগীন্দ্র



প্রকাশচন্দ্র ও তাঁর প্রথম ব্রাহ্ম বন্ধুগণ

সামনের সারিতে ঃ মোহিনীমোহন মজুমদার, প্রকাশচন্দ্র, কেদারনাথ রায় ও ফণীন্দ্রমোহন বসু
পিছনের সারিতে ঃ হৃদয় ও পঞ্চু

চৌধুরীদের বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সভা হইবে, তুমিও চল। নাস্তিক হইলেও এইরূপ সামাজিক বিষয়ে আমার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। সভার কাজ যাহা ছিল করিলাম, তারপর সকলে নদীতীরে বেড়াইতে গেলাম। তাহারই কিছুদিন পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারী ঝড় হইয়া গিয়াছে। হরি দত্ত মহাশয়ের বাটীর আটচালা পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই সেই পড়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমিও দেখাদেখি প্রবেশ করিলাম। খান কতক তক্তপোষ ভিতরে ছিল, অন্ধকার ঘরে তক্তপোষের উপর সকলেই বসিলেন, আমিও বসিলাম। ব্রাহ্ম সমাজের দু একটা গান হইল; আমার তত ভাল লাগিল না। তারপর সকলেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আমি বিদ্যালয়ের সকলের উচ্চ শ্রেণীতে পড়ি। আমার মনে অভিমান হইল, "ইহারা প্রার্থনা করিতে পারে, আমি পারি না?" আমিও প্রার্থনা করিলাম। আমি বলিলাম, "ঈশ্বর, তোমার নিকটে সকলে প্রার্থনা করিল, আমি তোমাকে চিনিও না, জানিও না, যদি তুমি থাক এবং তোমার ইচ্ছা হয় তো তোমাকে দেখিতে চিনিতে দাও।" এইরূপে অনিশ্চিত অজানিত অপরিচিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনার কারণ ছিল অভিমান,— সকলে প্রার্থনা করিবে, আমি করিব না? কিন্তু যেমন করিলাম অমনি ধরা পড়িলাম। সেইদিন হইতে ঐ প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গ আমার মনকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল।

ধর্ম্মবিষয়ে আমার মনে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল। তোমার সঙ্গে তখনও এমন সম্বন্ধ হয় নাই যে তোমাকে আমার এ সকল সংগ্রামের অংশ দি। অপর দিকে তুমি তখনও নূতন বধূ; তোমার সম্বন্ধে তখনও আমার বিশেষ কোন অধিকার ছিল না। একান্নবর্ত্তী পরিবারে যদি প্রেমের রাজত্ব না থাকে তাহা হইলে যে দশা হয়, আমাদের বাড়ীর দশাও তাহাই ছিল। যে যাহার লইয়াই ব্যস্ত; লাভের মধ্যে একত্র থাকাতে পরস্পরের সম্বন্ধে দাবী ও অভিযোগের

ভাব অনেক সময় প্রকাশ পাইত। এরূপ পরিবারে নূতন অসহায়া বালিকা আসিয়া সহজে কাহাকেও আপনার বলিয়া ধরিতে পারে না। তোমার দশাও তাহাই হইল।

এই সময়ে আমাদের পারিবারিক দুরবস্থা আরও বর্দ্ধিত হইল। তোমাকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। বিষয় লইয়া বড়দাদা ও সেজদাদার মধ্যে কলহ আরম্ভ হইল। আমি মাঝে থাকিয়া অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কলহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। আদালতে সাব্যস্ত হইল, বিষয়ে সকল ভ্রাতারই অধিকার আছে। কিন্তু বিচারালয়ে নির্দ্ধারিত হইলে কি হইবে? ইচ্ছা যখন হয়, তখন বিষয় নষ্ট করিতে কতদিন লাগে? দেখিতে দেখিতে অমন সুন্দর তালুক নষ্ট হইতে লাগিল। রক্ষার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম, তাহাতে আমার পাঠের অনেক ক্ষতি হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার চক্ষের সম্মুখে ৬০।৭০ হাজার টাকার বিষয় পাঁচ হাজার টাকায় দেন—ডিক্রিতে বিক্রয় হইয়া গেল। তখন হায় হায় মাত্র বাকি রহিল। যাহা হউক, নশ্বর সম্পত্তি গিয়া আমার মঙ্গল হইল। থাকিলে হয় তো ঈশ্বরের দিকে মন আর অধিক আকৃষ্ট হইত না।

সম্পত্তি গেল; বাড়ীর অবস্থা খারাপ হইল। তোমাদের খাটুনি বাড়িল। আর তুমি তখনও বধূর উপযুক্ত ব্যবহার সব ভাল করিয়া শিক্ষা কর নাই। তাই বাড়ীতে অনেক গঞ্জনাও সহ্য করিতে হইত। মোকদ্দমার গোলমালে আমারও পড়াশুনা প্রায় ঘুচিয়া গেল।

সেজদাদা দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন। ছোট বউটী একলা বিদেশে কেমন করিয়া থাকিবেন, তাই সমুদয় পরিবার কলিকাতায় আনা স্থির হইল। সেজ-দাদার সুবিধায় আমারও সুবিধা হইল। আবার তোমার সহিত একত্র থাকিতে পাইলাম। কিন্তু এ বাড়ীতেও আমার কোন মর্য্যাদা নাই, কারণ পড়াশুনা প্রায় ঘুচিয়াছে, কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করি নাই; কাজেই তোমারও কিছু মর্য্যাদা ছিল না। এখানেও

তোমার সম্বন্ধে আমার কোন ক্ষমতা ছিল না। সারাদিন তোমাকে রন্ধন প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিতে হইত। কি আহার করিলে তাহাও আমি সব সময় জানিতে পাইতাম না। আমার ইচ্ছা হইত তোমাকে লেখাপড়া শিখাই। দিনে তাহার সুযোগ হইত না। সকলে শয়ন করিলে, যখন তুমি শয়ন করিতে আসিতে, তখন তোমার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইত। আমি গুরু হইয়া স্বতন্ত্র বসিতাম, তুমি ছাত্রী হইয়া ভয়ে ভয়ে দূরে বসিতে। অনুরাগের সহিত আপনার পাঠ শিখিতে। এইরূপে তোমার ক, খ, আরম্ভ হইল, ক্রমে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইয়া গেল।

কিছুকাল পরে তুমি দেশে চলিয়া গেলে, আমি কলিকাতায় রহিলাম। তোমার সংবাদটী কিন্তু প্রয়োজন। খামে নিজের ঠিকানা লিখিয়া পত্রের মধ্যে করিয়া পাঠাইয়া দিতাম। এ খরচ কোথা হইতে জুটিত? ছেলে পড়াইতাম। কখনও ১০৲ টাকা কখনও ১৫৲ টাকা পাইতাম। বিদ্যালয়ের বেতনাদি উহাতেই চলিত, বাকি যাহা কিছু থাকিত তাহা হইতে তোমাকে মাসে মাসে ৫টী টাকা পাঠাইয়া আপনাকে বড় সুখী মনে করিতাম। পাঠের সময় বিবাহ হইলে কি দশা হয় তাহা আমি বিচক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তোমার কথা সদাই মনে হইত। পড়িতেছি, পড়িতেছি, হঠাৎ মনে তোমার একটা কথা উদয় হইল, আর পাঠ বন্ধ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তাই করিতে লাগিলাম। বই খোলাই পড়িয়া রহিল। বিশেষতঃ তোমার শ্বশুরালয়ের জীবন এসময় বিশেষ সুখের জীবন ছিল না। তাই আমাকে অনেক সময় তোমার জন্য চিন্তিত হইতে হইত। এইরূপে আমার কত সময়ই নষ্ট হইত, তাহার ঠিক নাই। এই সময় আমি বি, এ, পড়িতেছিলাম। মোকদ্দমার পরেও সেজদাদা আমাকে অন্যান্য অনেক রকম কাজে নিযুক্ত করিতেন। সুতরাং আমি আর বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নবজীবন

ধর্ম্মবিষয়ে আমার মনে যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের গ্রামের সেই বন্ধুদের সঙ্গে আমার প্রীতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যতবার দেশে যাইতাম, ইহাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতাম। এই সময়ে কেদার প্রচারক হইবেন বলিয়া শ্রীপুর গমন করেন। তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম, ব্যাকুলতা, ফণীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পঞ্চাননের সরলতা আমার অত্যন্ত সহায় হইয়াছিল। পঞ্চানন আমার সঙ্গ প্রায় ছাড়িতেন না। দুইজনে প্রায়ই নদীতীরে ভ্রমণ করিতাম। তিনি গান করিতেন, আমার তাহা বড় ভাল লাগিত। আমাকে ফিরাইবার জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কোথা হইতে দেবতা যেন ইহাঁদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একদিন শ্বশুরবাটীতে আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার পর শুনিলাম টাকী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। আমি বলিলাম আমিও যাইব। যাইতে হইলে তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে; সেই শীতে রাত্রি তিনটার সময় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নদী পার হইতে হইবে, নহিলে উৎসব স্থানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে। রাত্রি ১১টার সময় আহার ও তারপর শয়ন করিয়া শীতকালে রাত্রি তিনটার সময় উঠা যে কি কষ্টকর তাহা বুঝিতেই পার। চিরবন্ধু ফণীকে বলিলাম "আমাকে ডাকিও।" ফণী স্বীকার করিলেন। তিনি আমার পরম সহায় ছিলেন। তোমার পিত্রালয়ের উপরের ঘরে নিদ্রিত ছিলাম। ফণী আসিয়া ডাকিলেন। সে দিনকার সেই ডাক যেন শুধু শরীরকে নয়, আত্মাকেও চেতনাযুক্ত করিয়াছিল। উঠিয়া তোমাকে না বলিয়াই আস্তে আস্তে পলায়ন করিলাম। প্রাণে এমন এক আবেগ আসিল, মনে হইল যেন কুহকিনী আসিয়া ডাকিলেন, আমিও ভুলিয়া সঙ্গে চলিলাম। যমুনা

নদী পার হইতে হইতে একজন "বলিহারি তোমারি" এই গানটী ধরিলেন। ও গানটী তাহার পূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই। আমার প্রাণ মুগ্ধ হইল। মনে কত ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছিল তাহা আর বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তারপর যখন সঙ্গীতের এই অংশটুকু গাওয়া হইল, "না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি" তখন আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। টাকী পেঁীছিলাম। শ্রীযুক্ত হরলাল রায় তখন আমাদের অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম। তিনিই উপাসনা করিলেন। উপাসনার পরে দাঁড়াইয়া যে প্রার্থনা করিলেন তাহা অতীব আশ্চর্য্য। হাত দুখানি তুলিয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াই যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাহা বলিতে পারি না। না দেখিলে বোঝা যায় না। সেদিন টাকীতেই আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলাম।

ফণীদের বাড়ী আমাদের মিলনের স্থান ছিল না। একদিন সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মবন্ধুরা সঙ্কীর্ত্তন করিলেন; আমিও এক পাশে বসিয়াছিলাম। তাঁহাদের একখানি ঘর তখন নূতন হইতেছিল, সব জায়গার মাটী তখনও সমান করা হয় নাই, সেই ঘরেই সঙ্কীর্ত্তন হইল। প্রথমে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। গান হইতেছে—"তুমি পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি, বামন জনায় চাঁদ ধরাও নাথ।" একটু পরেই প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া হইল। অন্ধকারে তাঁহাদের সেই প্রমত্ত কীর্ত্তন আমি কখনই ভুলিব না। তাঁহাদের সেই প্রমত্ত অবস্থা দেখিয়া আমি গোপনে বলিতে লাগিলাম, 'ভগবান্ ইহাদিগকে যে সুখ দিয়াছ, আমাকে কি তাহা দিবে না?' এ কথা যতই বলি ততই আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এমন মিষ্ট ক্রন্দন আর কখনও কাঁদি নাই।

এইরূপে আমি ক্রমে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। একদিকে তোমার আকর্ষণ, অপরদিকে ব্রাহ্ম বন্ধুদের আকর্ষণ, দুইই

বাড়িতে লাগিল। কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে উৎসবে যোগ দিলাম। ১৮৬৮ সালের মাঘোৎসব এক স্মরণীয় ব্যাপার। সেইবার প্রথম নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। "তোরা আয়রে ভাই এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম" এই গান হইয়াছিল। আমার মন এই গানে মাতিয়া গেল। সেই সময় হইতে নিয়মিত রূপে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যাইতে আরম্ভ করিলাম। বন্ধু ফণী এই সময়ে আমার অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন।

১৮৬৮ সালের শেষভাগে ছুটীতে দেশে গেলাম। এই সময়ে এক পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ সালের কলিকাতার মাঘোৎসবে আমি যাইব এই স্থির ছিল। সেই সময়ে তুমি একদিন বিষাক্ত কুল খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলে। দুই তিনজন ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসা করা হইল। বিষ উঠিল না, কিন্তু ঔষধের গুণে নষ্ট হইল। তাহার পর তোমার জ্বর হইল। সেইদিন আমার কলিকাতা যাইবার কথা। মনটা বড়ই ব্যাকুল হইল। কলিকাতা যাই, কি এরূপ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত স্ত্রীর শুশ্রূষা করি! সকলে আহার করিয়া শয়ন করিল। তোমাকে যত্নে শয্যায় শায়িত করিয়া দিলাম। মশারি ফেলিয়া চারিদিক ঠিক করিয়া গৃহত্যাগ করিলাম। মাতা কত নিষেধ করিলেন, তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। উত্তরে বলিলাম, "নদীতে জোয়ার আসিয়াছে, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না"। কলিকাতার উৎসব যায়, আমি কি থাকিতে পারি? তোমাকে ফেলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু নৌকায় আসিয়া অন্ধকারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে নিদ্রা হইল। সেবার উৎসব কলিকাতার অতীব আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। সেবার নাকি বিধাতার জন্য প্রথম ত্যাগ স্বীকার করিলাম, তাই প্রভুর করুণা বেশী মাত্রায় ভোগ করিলাম।

যখন নূতন সেজবধূর সহিত তুমি কলিকাতায় আসিলে, তখন



প্রকাশচন্দ্রের ব্রাহ্ম বন্ধুবর্গ

মোহিনীমোহন মজুমদার (পুস্তকবিক্রেতা), রায়সাহেব ফণীন্দ্রমোহন বসু (মেট্রোলজিক্যাল বিভাগ),
প্রকাশচন্দ্র রায় ও কেদারনাথ রায় (শিক্ষক, হেয়ার স্কুল)

[১৮৬৭ সালে গৃহীত ছবি]

হইতে আমার ধর্ম্ম তোমাকেও দিতে যত্ন করিতে লাগিলাম। প্রতিদিন প্রভাতে একটী করিয়া গান করিতাম ও একটু প্রার্থনা করিতাম। "গাও তাঁরে গাও সদা তরুণ ভানু" এই গানটী প্রায় রোজ গান করিতাম। তুমি উঠিয়া বসিতে, তারপর প্রার্থনা হইত। এই সময় এক দিন আমার মাতা তোমাকে ষষ্ঠী করিতে বলেন। ষষ্ঠীতে ভাত খাইতে হয় না, আমার ইহা কুসংস্কার মনে হইল। আমি বলিলাম তোমাকে ভাত খাইতে হইবে। শ্বাশুড়ীর কথা রক্ষা করি, কি স্বামীর কথা রক্ষা করি, এই উভয় সঙ্কটে পড়িলে। আমি কিন্তু তখন একথা জানিতে পারি নাই। পরে শুনিলাম যে তুমি দুই দিক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে। বৈকালে অন্ন গ্রহণ করিয়া রাত্রে পুরী খাইতেছিলে। আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম তখন তুমি বলিলে ভাত খাইয়াছি। মাতার কাছে কি বলিয়াছিলে, জানি না। বালিকা বলিয়া তখন বুঝিতে পার নাই যে দুই দিক রক্ষা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইহার কিছুদিন পরে মাণিকতলা হইতে মির্জ্জাপুরে বাসা পরিবর্ত্তন হয়। মেয়েদের লইয়া আসিবার ভার আমার উপর পড়িল। এরূপ ভার কিছু নূতন নয়। সকলেই আমাকে ভালবাসিতেন আর এরূপ ভার প্রায় আমাকেই দেওয়া হইত। এরূপ সেবায় আমি কখনও পরাঙ্মুখ হইতাম না। পদব্রজে আমি আগে আগে, মাতা ও অন্যান্য বধূরা পশ্চাতে যাইতেছিলেন। একবার ফিরিয়া দেখি যে তোমরা সকলে কাপড়ে কাপড়ে সংযুক্ত করিয়াছ। যেন এক গাছা মানুষের শিকল চলিতেছিল। দেখিয়া বড় হাসি পাইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পথ ভুলিয়া যাইবার ভয়ে এইরূপ করিয়াছ। বাল্যকালে এই অবস্থা, আর শেষ জীবনে একাকী কত সময় রেলপথে চলিয়া গিয়াছ; যেখানে নির্ভীকতার প্রয়োজন হইয়াছে, তুমি কখনও পশ্চাৎপদ হও নাই।

কিছুকাল পরে তোমার সন্তান হইবে বলিয়া তুমি পিত্রালয়ে

গেলে। সেখানে গিয়া তোমার জ্বর হইল। ৮ মাসের সময় অত্যন্ত অধিক জ্বর হইল ও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এদিকে কলিকাতার বাসায় নূতন সেজ বধূ মারা গেলেন। তোমারও অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইল। তোমার জীবনের আশঙ্কা হইল। অবশেষে তোমার মেসোমহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তোমার প্রাণরক্ষা করাই প্রয়োজন বলিয়া গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। সমুদয় আয়োজন ঠিক হইল। কোন্ ঘরে ঐ কাজ হইবে, কোন্ কোন্ ঔষধের আবশ্যকতা, সমুদয় ঠিক হইল। এত বড় কাজ একাকী করা ভাল নয়, এই বলিয়া টাকী হইতে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বড় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয়কে আনিতে পাঠান হইল। টাকী যাইতে হইলে নদী পার হইতে হয়। নদীতে তুফান উঠিল, সেই জন্য সে রাত্রে ডাক্তার আনিতে পারিলেন না। অতি প্রত্যুষে বড় ডাক্তার আসিবেন, ও ঔষধ প্রয়োগ করিয়া গর্ভস্থ শিশু বধ হইবে, এ বিষয়ের সকল আয়োজন ঠিক রহিল। মানুষেরা সন্তান বধ করিবার সমুদয় উপকরণ ঠিক করিলেন, কিন্তু ভগবান তো মানুষের মতে চলেন না। রাত্রেই বেদনা উপস্থিত হইল। প্রসূতি তুমি ডাক্তারদের সমুদয় ষড়যন্ত্র শুনিতে পাইয়াছিলে। কাহাকেও না বলিয়া রাত্রি দুইটার সময় একাকী দৌড়িয়া নীচের ঘরে আসিলে। অক্লেশে তোমার প্রথম সন্তান সুসারবাসিনী জন্মগ্রহণ করিলেন। যে ঘর তাঁহার মৃত্যুর গৃহ স্থির হইয়াছিল সেই ঘরে তাঁহার জন্ম হইল। গোবিন্দ ডাক্তার প্রাতঃকালে আসিয়া দেখেন বাটীতে ধূম নির্গত হইতেছে। সকলেই আনন্দিত হইলেন। আমি সংবাদ পাইয়া ভগবানকে কতই যে ধন্যবাদ দিলাম তাহার আর ঠিক নাই। এইরূপে জানিতে পারিলাম যে তিনি যাহা বিধান করেন তাহার আর অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

এ সকল কথা তোমারই মুখে শুনা; আবার তোমাকেই বলিতেছি। এই ঘটনায় তোমার ইচ্ছা শক্তির প্রথম জন্ম হয়।

তোমার মনে যদি প্রবল বেগ না আসিত, শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য এমন ব্যাকুলতা না আসিত, তাহা হইলে সে রাত্রে কন্যা সুসার কেমনে রক্ষা পাইতেন, বল? এই ইচ্ছা শক্তির বলেই পরবর্ত্তী জীবনে তুমি সংযম শিখিতে পারিয়াছিলে। শরীরের সমুদয় আসক্তি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলে।

১৮৭০ সালের শীতের ছুটীতে দেশে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা পড়িতে ভাল লাগিত। একদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া নিদ্রার পূর্ব্বে উক্ত পুস্তক একমনে পাঠ করিতেছিলাম। ভীষণ শ্মশানের কথা পাঠ করিতেছি, এমন সময় তুমি শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলে, ও আমাকে নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতে দেখিয়া বিদ্রূপচ্ছলে কি বলিতে লাগিলে। তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হইল। ভালভাবে বলিলাম যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কৌতুক করিলে অত্যন্ত ব্যথা পাই। সেই যে তুমি নিবৃত্তি হইলে আর তুমি কখনও আমার বিরোধী হও নাই। ইহার পর হইতে আমি তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্য যাহা কিছু চেষ্টা করিতাম, তুমি সে সকলের পক্ষপাতিনী হইতে। বাল্যকাল হইতে গ্রামে প্রতিপালিতা বলিয়া গ্রামের লোকেদের মত তুমিও ছোট ছোট বিষয়ে সত্যের অপলাপ করিতে। আমার তাহাতে অত্যন্ত ক্লেশ হইত। আমার কথাতে তুমি তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিলে। ক্রমে তুমি আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস সকল গ্রহণ করিতে লাগিলে, আমার মনে আর আনন্দ ধরিত না। এই সময়েও রাত্রিতে গোপনে শয্যাতে বসিয়া তোমাকে পড়াইতাম ও তোমাকে লইয়া প্রার্থনা করিতাম। তখনও তুমি ব্রাহ্মসমাজের মুখ দেখ নাই। ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাদি অতি অল্পই পাঠ করিয়াছিলে। পাঠ করিবার ক্ষমতাও তত ছিল না।

আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় পড়িতে হইল। ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস উপস্থিত হইল। সে সময়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বসন্তর বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। বিবাহাদির

সময় আমাদের দেশে জলসওয়া বলিয়া একটা অনুষ্ঠান করা হয়। পাঁচ বাড়ী হইতে জল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেই জলে কন্যাকে বিবাহের পূর্ব্ব দিন স্নান করান হয় আমাদের দেশে জল ভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকর বাদ্য বাজায় এবং কুলনারীরা কুৎসিত সঙ্গীত করিতে থাকে। এ প্রথা আমার অত্যন্ত দোষাবহ মনে হইত। আমি তোমাকে বলিয়া দিলাম, তুমি একার্য্যে যোগ দিও না। আমার কথা রাখিতে গিয়া তুমি অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলে। এ বিষয়ে কন্যা বসন্ত নিজেই লিখিয়াছেন ঃ—"আমার বিবাহ ১২৭৭ সালে ১৬ই ফাল্গুন সোমবার হয়। আমার বয়স তখন ১১ বৎসর। জলসওয়ার জন্য কাকিমাকে অত্যন্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বদিন রাত্রে জলসওয়া এবং সকালে বড়ি দেওয়া ও ক্ষীর করা হয়। ঐ দিন ঠাকুর মা কহিলেন, 'বসন্তর মা নাই, এবং এখানে অন্য খুড়ী জেঠাই নাই; শাস্ত্রের সমুদয় তোমাকেই করিতে হইবে। যদি না কর, তাহা হইলে বাড়ী হইতে দূর হও। যদি কন্যার কোন অমঙ্গল হয়, জানিতে পারিবে।' এই সময় সেজ জেঠাইমাও আসিলেন, ও বলিলেন, 'ছিঃ তোমার লজ্জা হয় না? আঘাটায় যাইয়া গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মর,' এত নির্য্যাতনেও কাকিমার বিশ্বাস অটল রহিল। সেদিন সমস্ত দিন কাঁদিয়া অনাহারে কাটাইয়াছিলেন। কাকিমা কেন এরূপ সকলের অবাধ্য হইয়াছিলেন, তখন কিছুই বুঝিতাম না। রাত্রে যখন জলসওয়ার সময় হইল, প্রথমে সকলেই তাঁহাকে ডাকিল। তিনি যাইতে অস্বীকার করিলে সকলে বলপূর্ব্বক টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। আমি মাঝের দালানে বসিয়াছিলাম। যখন তাঁহাকে টানাটানি করা হয়, দেখিয়াছিলাম।" তোমাকে তো এইরূপে বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হইল; আমি আমার মনের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিবার অন্য উপায় না পাইয়া আমার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রহিলাম, রাত্রিতে যখন তোমাকে লইয়া সকলে ঘরে ফিরিলেন,

আমি আর তোমাকে ঘরে আসিতে দিই নাই। তোমার দোষ ছিল না; আমি আর সকলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে না পারিয়া তোমাকেই আরও একটু কষ্ট দিলাম। যাহা হউক, এই ঘটনার পর হইতে তোমাকে ও আমাকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকবার দাঁড়াইতে হইয়াছিল। তুমি আমার অনুগত হইয়া প্রত্যেকবারই বিশ্বাস রক্ষা করিতে যত্ন করিয়াছ। এইরূপ সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার সময় ইহার পর হইতে আমি তোমার নিকটে আশ্চর্য্য সাহায্য পাইয়াছি। তুমি পূর্ব্বে কিছুই শিক্ষা পাও নাই, কিন্তু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সময় তোমার যে দৃঢ়তা দেখিতে লাগিলাম, তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। পরবর্ত্তী জীবনে এই সাহসের এমন বিকাশ হইয়াছিল যে, দেখিয়া অন্যেরাও চমৎকৃত হইত।

ঐ অবস্থায় বিরুদ্ধ সমাজের মধ্যে, বিপুল পরিবারের মধ্যে, সকলের লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যে তোমাকে একাকিনী রাখিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। এমন সময় দেশে আর একটি হুলস্থুল উপস্থিত হইল। আমাদের বন্ধু কেদার ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ করিলেন। কলিকাতায় আমরা একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। কয়েকদিন আমাদের সেই আনন্দে ও উৎসাহে কাটিল। পরলোকগত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের কন্যার সহিত কেদারের বিবাহ হয়। আমাদের দেশের আর কোনও লোক এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মবিবাহ করেন নাই। দেশের সকলে, বিশেষতঃ টাকীর বাবুরা, চেষ্টা করিলেন যাহাতে অপরাধীদিগকে একঘরে হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে তাঁহারা জনিলেন যে, প্রায় সকল ঘর হইতেই দুই একজন করিয়া বিবাহে যোগ দিয়াছিলেন, শাস্তি দিতে হইলে অনেক ঘরকে একঘরে করিতে হয়, সুতরাং তাঁহাদের মনের সাধ মিটিল না। তুমি একজন প্রধান অপরাধীর স্ত্রী, নিজেও কয়েকবার দোষী হইয়াছ; তোমার লাঞ্ছনা বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে আমাদের

বন্ধু মোহিনীমোহনের সাধ্বী স্ত্রীও একাকিনী দেশের বাটীতে স্বীয় বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। চারিদিকে বিরুদ্ধ দল, তাহারই মধ্যে তিনি কেমন নিত্য উপাসনা ও প্রার্থনা করিতেন তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। তোমার সঙ্গে তাঁহার যে মিলন হইয়াছিল তাহাও ঈশ্বরের কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে কে তোমাদিগকে মাঝের বাড়ীর পুকুরের ঘাটে একত্র করিয়া ধর্ম্মালাপ করিবার উপায় বলিয়া দিত? এ সকল তাঁহারই কৃপা!

এদিকে আমার জীবনসংগ্রাম ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল বি. এ. পড়া ঘুচিয়াছে। কিছুদিন আইন পড়িয়াছিলাম। তখন ভাবিতাম উকীল হইব, অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিব, পরিবারদিগের ভরণপোষণ করিব, অনেকের সাহায্য করিব। পাগলের মত কতই কি ভাবিতাম; তোমাকে বলিতে কিছু সঙ্কোচ নাই, তাই বলিতেছি, হাইকোর্টের জজ হইবার কথাও ভাবিতাম। ব্রাহ্ম হওয়ার পর আইন ব্যবসায় সম্বন্ধে সন্দেহ আসিল। আমাদের গ্রামের হরি দত্ত মহাশয় উকীল ছিলেন। তিনি বলিলেন, আইন ব্যবসায়ে বিবেক ঠিক রাখা যায় না। কি করি! এদিকে সুসারবাসিনী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমারও বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে, পরিবারের মধ্যে অনুপার্জ্জক ভাইয়ের স্ত্রী বলিয়া ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া তোমার অবস্থাও প্রীতিকর নয়। এই সকল চিন্তা মনকে বড়ই আন্দোলিত করিতে লাগিল। তোমাকে লইয়া একত্র থাকিবারও কোন উপায় নাই। তোমাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে, লেখা-পড়া শিখাইতে, আমার মন ব্যাকুল হইত, তাহার কোনও উপায় দেখিতেছিলাম না। অবশেষে পোষ্ট আফিসের কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করিলাম। দুই মাস শিক্ষানবীশ থাকিয়া ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম ও অস্থায়ীরূপে বর্দ্ধমানের পোষ্টমাষ্টার হইয়া গেলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ প্রথম গৃহস্থালী।

৫ই এপ্রিল ১৮৭২ বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম। সেখানকার মাসিক আয় ছিল ৩৭৷৷৹ টাকা। বর্দ্ধমানে আসিবার জন্য তুমিও ব্যস্ত হইয়াছিলে, আমিও তোমাকে আনিতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম। চলিবে কিরূপে, কিছু ভাবিলাম না; তোমাকে লইয়া আসিলাম। আনিয়া তোমার গুণের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণী রাখিয়াছিলাম, তুমি আসিয়াই তাহাকে ছাড়াইয়া দিলে। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রতিদিন বাজার হইতে আসিত। ডাকঘরের কাজে অনেকক্ষণ আফিসে থাকিতে হয়। রাত্রি ৮ টার সময় আমি বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। তুমি সন্ধ্যার সময় কাজ শেষ করিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিতে। যখন আমি বাড়ী ফিরিতাম তুমি প্রদীপ জ্বালিয়া আহার দিতে। এইরূপে সুব্যবস্থার দ্বারা ঐ সামান্য আয় হইতে তিন জনের খরচ বাদে তিন মাসে ৫০৲ টাকা বাঁচাইয়াছিলে।

আহার করিয়াই নিদ্রা যাইতাম। তখনকার নিদ্রা আশ্চর্য্য ধরণের ছিল, আত্মাও যেন নিদ্রিত ছিল। উপাসনা সপ্তাহে একদিনও হইত না। শয়ন করিবার সময় একবার পিতাকে ডাকিতাম, উঠিবার সময় ভগবানকে ডাকিয়া উঠিতাম। সদালাপ সৎসঙ্গ কিছুই হইত না। মনটা শুকাইয়া যাইতেছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় একটা মাঠের মধ্যে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। মধ্যে একদিন বন্ধু কেদার ও ফণী আমাকে দেখিতে আসিলেন ও আমার অবনতি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন। আমিও আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু কি করিব! কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার আর তখন কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তোমার দ্বিতীয় সন্তান সরোজিনী হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার মা তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমিও দেখিলাম, সেই অনুরোধ রক্ষা করাই

মঙ্গল। তোমার পিত্রালয়ের গোমস্তা বেণী দাদা তোমাকে লইতে আসিলেন। যাইবার দিন সমস্তরাত্রি ক্রন্দন করিলে এবং আমাকেও কাঁদাইলে। কে কাহাকে কাঁদাইল, তাহা বলিতে পারি না। প্রাতঃকালে রেলেও তুমি ক্রন্দন করিলে। তোমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া আমি যে কত ক্রন্দন করিলাম, তাহা এখন বলিতে লজ্জা হয়।

সেই তুমি পরে স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে ছাড়িয়া জ্ঞানশিক্ষার জন্য কতদিন অন্যত্র ছিলে; বিদায়ের সময় একবিন্দু অশ্রুপাত কর নাই; ইহলোকের শেষ বিদায়ের সময়ও বিনা ক্রন্দনে চলিয়া গেলে।

পিত্রালয়ে তোমার দ্বিতীয় সন্তান সরোজিনী হইল; কিন্তু তোমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। দেহ প্রায় রক্তহীন হইল, তবু শোণিত কোনরূপেই বন্ধ হয় না। সকলের ভাবনা হইল। ডাক্তার হার মানিলেন, কোন ঔষধ কাজ করে না। তুমি স্বপ্ন দেখিলে যে গ্রামের রামা ধোপার কাছে ঐ রোগের ঔষধ আছে। রামা ধোপা আসিল, কিন্তু প্রথমে স্বীকার করিল না। পরে তাহার প্রদত্ত শিকড়ে শোণিত পড়া বন্ধ হইল।

সরোজিনীও হইল, বর্দ্ধমানের অস্থায়ী চাকরীও ফুরাইল। তুমি অতি যত্নে গৃহস্থালী করিয়া যে ৫০টী টাকা জমাইয়াছিলে, তাহা লইয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় আসিবামাত্র কেদার বলিলেন, 'আমার ছাপাখানার অংশীদার হও'। তিনি তখন 'রায়' প্রেস বলিয়া একটি প্রেস খুলিয়াছেন। শূন্য বখরা,—টাকা তাঁহার, পরিশ্রম আমার। এই কাজ আমার বড়ই ভাল বোধ হইল। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিব, অর্থও হইবে, ধর্ম্মও হইবে, কলিকাতায় বন্ধুদের নিকটে থাকিতে পাইব, তোমাদের উন্নতি করিব, এইরূপ অনেক আশা হইল। এই সময় শরীরকে শরীর বলিয়া জ্ঞান করিতাম না। কত যে পরিশ্রম করিতে পারিতাম

তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নিত্য দুই তিন ক্রোশ চলা আমার কাছে কিছুই মনে হইত না। কত সাহেবের কাছে গিয়াছি, কত লোকের খোসামোদ করিয়াছি, তাহার ঠিক নাই। কিন্তু একটি পয়সা খরচ করিতাম না, ব্যবসায়ের পয়সা খরচ করিতে যেন আমার মন চাহিত না। ব্যবসা বেশ চলিতে লাগিল। কর্ত্তব্য জ্ঞানের সহিত ব্যবসা করিলে যে মানুষের লাভ হয় তাহাতে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

আমি ছাপাখানার কাজ করিতে গেলাম বটে, কিন্তু তোমার দশা কি হইল? বর্দ্ধমানের গৃহস্থালীর অবসানের পর তোমার অবস্থা পূর্ব্বে যেমন ছিল আবার তেমনি হইল। পরের অধীনে, পিত্রালয়ে কিম্বা আমাদের বাটীতে কন্যা দুইটীকে পালন করা ও আমার জন্য আত্মীয়দের গঞ্জনা সহ্য করা এই তোমার কাজ ছিল। দেশে ঝি চাকর পাওয়া যায় না। কুলবধূর সমুদয় কাজ, চিঁড়ে কোটা, গরুর জাব কাটা, এ সকলই তোমাকে করিতে হইত। সকালে উঠিয়া বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, গোবর দেওয়া, এ সকল নিত্য কর্ম্ম ছিল। এদিকে ছাপাখানাতে যাহা কিছু আয় হইত তাহা মূলধনেই রহিয়া যাইত। তোমাকে কিম্বা বাড়ীতে কোন সাহায্য করিতে পারিতাম না। তোমার যদিও অনেক অভাব হইত, কিন্তু কখনও আমার কাছে টাকা চাহিতে না।

ঐ সকল কারণে আমার মন সব সময় ভাল থাকিত না। তোমারও মন স্থির থাকিত না। একদিন তোমাকে কি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার কোন অংশ পাঠ করিয়া তোমার মনে আশঙ্কা হইল যে, আমি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইব। যেমন পত্র পাঠ, অমনি বেণী দাদাকে ডাকিয়া বলিলে, বাবুজীকে আনিয়া দাও। তিনি বলিলেন, "তাহাও কি হয়? কার্য্য স্থানে কার্য্য করিতেছেন, হঠাৎ কিরূপে কলিকাতা যাইব?" তোমার তখন মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তোমাকে নিরস্ত করা ও পর্ব্বত-নিঃসৃত বেগবতীর বেগকে নিবারণ

করা একই। পয়সা নাই শুনিবামাত্র গলার হার খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলে, “ইহা দ্বারা সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ কর, কিন্তু দুই দিনের মধ্যে বাবুজীকে আনিয়া দাও।” কাজেই বেণীদাদা কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার মুখে সংবাদ শুনিয়া আমি অবাক! তোমার আজ্ঞা পালন করিতে হইল। বাটী গিয়া তোমাকে কত ভয় দেখাইলাম। বলিলাম, যদি বেণী দাদার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি সন্নাসী হইয়া চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? তুমি বলিলে, গৃহ ছাড়িতাম, গেরুয়া পরিতাম, ভস্ম মাখিতাম, আর দেশে দেশে ঘুরিতাম, যতদিন তোমার সাক্ষাৎ না পাইতাম। আমি ভাবিলাম, ধন্য তোমার অনুরাগ!

১৮৭৩ সালের পূজার সময় বাটী গেলাম। বাটীতে গিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। দেখিলাম, আমি যে তখনও বাড়ীর খরচের কিছুই সাহায্য করিতে পারিতেছি না, ইহাতে সকলে অসন্তুষ্ট, কিন্তু কথা শুনিবার বেলা তোমাকেই শুনিতে হয়। আমি চাকরী না করিয়া স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা অর্থবান্ হই, এটা কাহারও ইচ্ছা নয়। সকলেই বলিতে লাগিলেন এক ভাইয়ের উপার্জ্জনে আর কত হইবে? একদিন আমার সম্মুখে এমন কিছু কথা বলা হইল, যাহাতে আমার বড় অপমান বোধ হইল; মনে বড় ব্যথা পাইলাম। রাত্রিতে এইরূপ হইল, পরদিন প্রাতে টাকী চলিয়া গেলাম। পথে যমুনা নদীর বক্ষে একাকী কতই কাঁদিলাম, কেহই দেখিল না। প্রতিজ্ঞা করিলাম ব্যবসা ছাড়িয়া চাকরী করিব। অন্যের গলগ্রহ হইয়া আর থাকিব না; অন্যের অর্থে আমার পরিবার প্রতিপালন হইতে আর দিব না। যদি চাকরী করিতে পারি, বাটী ফিরিব, নইলে আর ফিরিব না। সেই রাত্রে তোমার সঙ্গে বাটীতে শেষ বিদায়। সেই বিদায় হইতে আমার জীবনের গতি ফিরিল। সেই বিদায় ও ক্রন্দন আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পরলোক হইতে তুমিও কি তোমার অতীত জীবনের সেইদিন স্মরণ কর না?



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্রকাশচন্দ্র

সুপা
ন্নতি
।
স্থ

তোমাকে ছাড়িয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম। সেজদাদা মহাশয়কেও বলিলাম না। ছাপাখানার লাভের টাকা হইতে ৪০৲ টাকা লইয়া কেদার, ফণী ও দেবেন্দ্রকে বলিয়া কলিকাতা ছাড়িলাম। এই যে ভা[illegible] আরম্ভ করিলাম, দু তিনমাস কাটিয়া গেল, কত দেশে ঘুরিলাম, [illegible]মার নিরুদ্দেশ ভ্রমণ আর ফুরায় না। অনেক ক্লেশ সহিয়া, অনেক [illegible]য়া, অন্ধকারের চূড়ান্ত দেখিয়া, অবশেষে বগুড়ার পোষ্ট মাষ্টারের [illegible] পাইলাম; সেটাও ভাল মনে হইল না বলিয়া ছাড়িলাম। তারপর হরিনাভিতে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে তথায় গমন করিলাম। বন্ধু শিবনাথ সেখানে তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

এতদিন যে তুমি বাড়ীতে একাকিনী ছিলে, আমার বন্ধু কেদার ও ফণী তোমাকে পত্র দিয়া, ও প্রয়োজন হইলে অর্থ দিয়া কত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সে ভালবাসা তুমি জীবনে কখনও ভুল নাই, আমিও যেন না ভুলি।

হরিনাভির এই কাজে আমি অধিকদিন থাকিব কিনা তাহা স্থির করিতে পারি নাই। অন্যত্র কাজ কর্ম্মের চেষ্টাও করিতেছিলাম। এই তোমাকে সেখানে লইয়া যাইতে বিলম্ব হইল। ১৮৭৪ সালের মার্চ্চ মাসে তোমাকে ও কন্যাদুটিকে সেখানে লইয়া গেলাম। শিবনাথের পরিবারের সঙ্গে তুমি মিশিতে লাগিলে। ব্রাহ্ম পরিবার যে কত উন্নত হয়, ও একত্র উপাসনার যে কত সুফল, তাহা অনুভব করিবার সুযোগ পাইলে। স্বামীর সঙ্গে ও স্বামীর ধর্ম্ম বন্ধুদের সঙ্গে একত্র বাস করিবে, স্বাধীনভাবে নিজের সংসার করিবে, ও সেই সংসারের নিজের প্রাণের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিবে, এই সকল আশা অনেক দিন হইতে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলে। এতদিন আমি বিদেশে ছিলাম, আমার জন্য কত ব্যাকুল হইয়াছিলে। এইবার তোমার এসকল বাসনা পূর্ণ হইতে চলিল। তাই এখানে আসিয়া তুমি অতিশয় সুখী হইলে। শিবনাথের সঙ্গে তোমার

বন্ধুতা হইল। তাঁহার কন্যার আব্‌দার রক্ষার জন্য স্বহস্তে একদিন আপন কন্যা সুসারের বড় চুল কাটিলে। আরও কত কি প্রেমের ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমাকে শীঘ্রই হরিনাভি ছাড়িয়া যাইতে হইল। আমি মতিহারীতে দুর্ভিক্ষের রিলীফ্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাজ পাইলাম। এ কাজে বেতন অধিক, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাও অধিক, তা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের কাজ, এই সকল কারণে সেথায় যাওয়াই স্থির করিলাম। বন্ধু শিবনাথও বলিলেন, এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। আসিবার সময় তুমিও তোমার কন্যাগুলি ও শিবনাথের পত্নী ও কন্যা এত ক্রন্দন করিয়াছিলে যে সে কান্নার রোল আমি ভুলিতে পারিব না। কান্নাকাটির ফল এই হইল যে তাড়াতাড়িতে ধোপার কাপড়গুলি আনা হইল না। সন্ধ্যার সময় শিবনাথ সেই বস্ত্রগুলি নিজে বহন করিয়া আমাদের বাদুড় বাগানের বাটিতে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তোমাকে সেখানে রাখিয়া আমি মতিহারী যাত্রা করিলাম। এইরূপে তোমার হরিনাভির গৃহস্থালীও অল্পদিনের মধ্যেই ফুরাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ একাকিনী

বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া একাকিনী আসিয়া কত কষ্ট ও লাঞ্ছনার মধ্যে দেশের বাটীতে পড়িয়া ছিলে। তারপর এত কষ্টের পুরস্কার স্বরূপ একটু সুখের দিন দেখিয়াছিলে। হরিনাভিতে আমার সঙ্গে ও ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। আমি মতিহারী চলিলাম তোমাকে আবার আমার সঙ্গ ছাড়া হইতে হইল। এবারকার পরীক্ষা আরও সুদীর্ঘ; এক বৎসর কাল একাকিত্বে কাটিয়া গেল। দেবি, এ একবৎসর তুমি যে কষ্টে কাটাইয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া এখনও চক্ষে জল আসে। অথবা এই সময় হইতে তোমার

ও আমার আত্মা পরীক্ষার অনলে শুদ্ধ হইতে চলিল। তুমি এ সময়ে নিজেও তোমার পত্রে তাহা স্বীকার করিয়াছ। প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম যে কয়েক দিন পরই আমি তোমাকে মতিহারী লইয়া যাইতে পারিব। কিন্তু সেখানকার কাজটী দুর্ভিক্ষের কাজ; স্থায়ী হয় কি না কিছু স্থির ছিল না; তাই তোমাকে লইয়া যাওয়া হইল না। তোমাকে দেশের বাটীতে পাঠাইয়া দিবার কথা হইল। সেজ দাদাই তখন বাড়ীর কর্ত্তা। তাঁহার কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তুমি কলিকাতার বাসায় দুদিন রহিলে; কারণ পল্লীগ্রামে চলিয়া গেলে আর শীঘ্র আসা হইবে না; আমার কাছে যাইবার যে ক্ষীণ আশাটুকু, তাহা তখনও নির্ব্বাণ হয় নাই। কিন্তু সে দুদিন ফুরাইয়া গেল, তারপর ভবানীপুরে তোমার পিসা-মহাশয়ের বাটীতে গিয়া কিছুদিন থাকিবার অনুমতি ভিক্ষা করিলে। বিরক্তি মিশ্রিত সম্মতি পাইলে। পিসামহাশয়ের বাটীতে গিয়াও কিছুকাল ছিলে, কিন্তু অবশেষে সেই দেশের বাটীতেই যাইতে হইল।

দেবি, এ সময়ে তুমি যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলে তাহা পড়িয়া মন এখনও কাতর হইয়া উঠে। ৫ই এপ্রিল ১৮৭৪ লিখিয়াছিলে— "তোমার পত্র পাইলাম। তুমি কোথায়! আমাকে ফেলে তুমি কোথায় গেলে? আমি যে অন্ধকার দেখছি। আমার যে আর কেহ নাই। তুমি কই?"—এইরূপ কাতরোক্তিতেই পত্রখানি পরিপূর্ণ। তোমার মন তখন এমন একাকী হইয়া পড়িয়াছে যে পত্রে প্রবোধ মানিত না। আমার পত্রগুলি পাঠ করিয়া দর্শনের পিপাসা আরও বাড়িয়া যাইত। আগুনে ঘৃত ঢালিলে কি তাহা নির্ব্বাণ হয়? তখন তো তুমি কেবল শরীরই জানিতে। আত্মাকে তখনও চিনিতে শেখ নাই। তোমার দোষ ছিল না। এ সেবকই তখন শরীরের জন্য ব্যস্ত ছিল। তুমি তো কিছু উচ্চ শিক্ষা পাও নাই। আমার নিজেরও তখন ধর্ম্মবল কিছু ছিল না। বিদেশে ধর্ম্মবন্ধুহীন হইয়া আমিও

অন্ধকারে বেড়াইতেছিলাম। ঐ পত্রে তুমি লিখিয়াছিলে, "সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ডাকিও, যেন একটুও ভুলিও না।" আমার সেই অবস্থায় তোমার এরূপ এক একটী কথা আমার কত যে উপকার করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। তুমি আবার জিজ্ঞাসা করিলে, "মতিহারী জায়গা কেমন, বন্ধু কেমন? সমাজ আছে কিনা? ধর্ম্মবন্ধু আছেন কিনা? তোমাকে শিবনাথ বাবুর মত কেহ স্নেহ করিবার লোক আছেন কিনা, শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়। তোমার যে কষ্ট হইবে সমুদায় আমাকে দিও; আমি তাহা হইলে বড়ই সুখী হইব।" এমন করিয়া আমার মনের সকল ভাবের আশ না লইলে, আমার আত্মার কল্যাণের সংবাদ না লইলে সে সময় আমি কোথায় থাকিতাম? দেবি, তখন তুমিও অনেক নিম্নভূমিতে ছিলে, আমিও নীচে ছিলাম। শরীরের বিচ্ছেদে উভয়েই কাতর হইতেছিলাম। কিন্তু ভগবান দেখাইলেন যে পরস্পরের ভালবাসা ও সহানুভূতির গুণে দুটী নিম্নস্তরবাসী আত্মাও পরস্পরের কত সাহায্য করিতে পারে।

শ্রীপুরের বাটী গিয়া তোমার সেই পুরাতন জীবন আবার আরম্ভ হইল। প্রতিদিন সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, দুটি কন্যা পালন, তাহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে অবসর পাইলে নিজেও একটু পড়া, ও আমাকে পত্র লেখা এই তোমার দৈনিক জীবন ছিল। এ সময় ধানভানার দিন পড়িল, তাহাতে অত্যন্ত অধিক সময় যাইত, ও পরিশ্রম হইত। কতদিন এমন হইয়াছে যে আমার পত্র আসিয়াছে, তখন ধান ভানিবার ঘরে কাজে ব্যস্ত রহিয়াছ, পত্র পাঠের ঔৎসুক্যে বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছে, কিন্তু পত্র পড়িতে পাও নাই; সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়া তবে পত্রের দিকে মন দিয়াছ। কত কষ্ট ও অসুবিধা ছিল, তবুও পত্র লিখিতে ছাড়িতে না। প্রায়ই তিন চারি পৃষ্ঠার পত্র আসিত।

তোমার মনের কষ্টের আর একটি কারণ হইয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তোমাকে শ্বশুরালয়ে আনা হইত, আবার প্রয়োজন ফুরাইয়া

গেলেই কিংবা শ্বশুরালয়ে থাকিবার অসুবিধা হইলেই, বাপের বাড়ী পাঠান হইত। একবার এইরূপে পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলে; হঠাৎ শ্বশুরালয়ে আসিবার আদেশ হইল। তখন তোমার পিত্রালয়ে কেবল তোমার মাতা ও দাদা ছিলেন। সেদিন একাদশী, মাতাকে একা ফেলিয়া আসিতে তোমার কষ্ট হইতে লাগিল। আর তখনও তোমার দাদার আহার হয় নাই; তুমি একবেলা পরে যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলে। শ্বশুরালয় হইতে উত্তর আসিল, "না, এখনই আসিতে হইবে।" ইহাতে তোমার মাতা ও তুমি বড় ক্লেশ পাইয়াছিলে। তোমার মাতা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার কন্যা কিম্বা বধূ কাহারও দ্বারা আমার উপকার হয় না।" তোমার মাতার এই কথাটুকুর জন্যও তোমাকে শ্বশুরালয়ে অনেক অপ্রিয় বচন শুনিতে হইয়াছিল।

পরিবারের এইরূপ ব্যবহারে যখন কষ্ট পাইতে, সেই সময়ই আবার আমার ধর্ম্মবন্ধুদের পত্র ও সময়োচিত অর্থসাহায্য পাইয়া তোমার মন বিস্ময়াপন্ন ও কৃতজ্ঞ হইত। বাস্তবিক, তুমি ও আমি সে সময়ে অমন বন্ধু না পাইলে আমাদের জীবন কত দুঃখের হইত। তুমি এই হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলে যে দুঃখীর কাছে সহানুভূতির মূল্য কত; সেইজন্য নিজেও সেই সহানুভূতি চিরদিন অন্যকে দিয়া আসিয়াছ।

এই সময়ে সেজদাদা মহাশয় আসামের একজন বড় জমিদারের দেওয়ান হইয়া গৌহাটী গেলেন। আমাকেও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া কাজ লইতে বলিলেন। আমার ভাল লাগিল না। হাজার কেন টাকা হউক না, যেখানে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কাজ করিবার সম্ভাবনা নাই সেখানে আমার প্রাণ থাকিতে চাহিল না। দাদাকে লিখিলাম, আমার আসাম যাওয়া হইবে না। ইহাতে বাটীর সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। ভগবানের ইচ্ছায় এই সময় আমার মতিহারীর কাজটী পাকা হইল। তোমাদের মতিহারী আসিতে পত্র

লিখিলাম। কে সঙ্গে করিয়া আনিবে? একজন বন্ধু আমার সঙ্গে একত্র কার্য্য করিতেন, তিনি পরিবার আনিতে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। তাঁহাকেই বলিয়া দিলাম আমারও পরিবার কেদারের বাসা হইতে লইয়া আসিও। দেশের বাটী হইতে ভ্রাতৃ-জামাতা শ্রীমান রামলাল দত্ত তোমাদের কলিকাতায় কেদারের বাসায় পৌঁছাইয়া দিলেন। কেদার ও কেদারের স্ত্রী তোমার প্রতি যে ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা কখনও ভুলিব না। তুমি একে অশিক্ষিতা বঙ্গনারী, বিদেশে কখনও যাওয়া অভ্যাস নাই, তাহাতে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আসিবে, বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর বই নয়; মা ভাই বোন ও যত পরিচিত বন্ধু সকলকেই ছাড়িয়া আসিতে হইতেছে; সুতরাং কেদারের দয়া ও আদর তোমার অত্যন্ত মিষ্ট লাগিয়াছিল, আমিও কৃতার্থ হইয়াছিলাম। সেই সময়েই কেদার তোমার মহত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "প্রকাশ তুমি জান না অঘোর কি রত্ন।"

এইরূপে ১৮৭৫ সালে তুমি তোমার দুই কন্যা, আমার ভাইজি বসন্ত ও ভাই-জামাই রামলাল দত্তকে লইয়া মতিহারী পৌঁছিলে। আবার তুমি একটী সংসারের সমুদয় ভার গ্রহণ করিলে।

দ্বিতীয় খণ্ড : গৃহিণী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মতিহারীতে প্রথম বার

মতীহারীতে আমার মাসিক আয় ছিল ৮০৲ টাকা; তাহা হইতে মাসে ৩০৲ টাকা দেশে মার নিকটে পাঠাইতে হইত। বাকী ৫০৲ টাকায় বিদেশে অত সংসার চালান কঠিন; কিন্তু দেখিলাম, তুমি বেশ গুছাইয়া চলিতে লাগিলে। টানাটানি বলিয়া কখনও ক্ষুণ্ণ হও নাই। শেষ মাসে প্রায়ই টাকা হাতে থাকিত না, কিন্তু তুমি একবারও মুখ মলিন করিতে না।

এইবার আমরা ব্রাহ্ম পরিবারের মত জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। ১৮৭৬ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে নিত্য পারিবারিক উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলাম। নিজ বাটীতেই সমাজ স্থাপন করা হইল। নারীদের সহিত জুটিয়া তুমি সামাজিক উপাসনায় যোগদান করিতে। সমাজ কাহাকে বলে তাহা বুঝিলে। পরের জন্য চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে। এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গে বড় ঝড় হইয়া অনেক লোক মারা যায় ও লোকের অন্নকষ্ট হয়। সে বিষয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র কলিকাতার মন্দিরে হৃদয়ভেদী আবেদন করেন। আমি ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে সেই আবেদন মতিহারীর সমাজে ১৮৭৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর সামাজিক উপাসনার পরে পাঠ করি। তুমি আবেদন শুনিবামাত্র তোমার হাতের বাজু দিতে প্রস্তুত হইলে। রাত্রে আমি গৃহে আসিলে তুমি যে কি স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হইয়া আমার সঙ্গে কথা বলিলে, তাহা ভুলিবার নয়। তোমার বাপের বাটীর বাজু, আমি দি নাই, তাহা দান করিবার জন্য আমার নিকট বিনয় করিবার প্রয়োজন কি ছিল? এ সময় তুমি বুঝিয়াছিলে তোমার ও আমার ধনে প্রভেদ নাই। পাছে কোন অন্যায় দান করিয়া ফেল, এই আশঙ্কা। বাজুর দাম সাহায্য-ফণ্ডে পাঠাইয়া

দেওয়া গেল। আমি দেখিতে লাগিলাম, ও দেখিয়া দেখিয়া দেবতার কাছে কৃতজ্ঞ হইতে লাগিলাম, যে আমার প্রিয় ধর্ম্ম তোমারও জীবনকে অধিকার করিতেছে।

কত ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমি এ সময়ে তোমার চরিত্রের বিকাশ, কার্য্য-দক্ষতার বিকাশ, হৃদয়ের বিকাশ লক্ষ্য করিতাম! এমন করিয়া তুমি ও আমি আর তো কখনও সংসার করি নাই; তাই প্রতিদিন আমাদের দুজনারই কত শিক্ষা লাভ হইতে লাগিল। পিত্রালয়ে থাকিতে তুমি কাপড় সম্বন্ধে খুব পরিপাটী ছিলে। দেশী ধুতি না হইলে তোমার মন উঠিত না। কলিকাতায় আসিবার পর প্রথমে ছোপান সাড়ী, তারপরে বিলাতী ধুতি আনিয়া দিতাম। মতিহারীতে আসিয়া বিলাতী ধুতিও জুটিত না। থান ক্রয় করিয়া তাহাতে নীলের ছোপ দিয়া সাড়ী করিয়া লইতে, এবং সেই অপূর্ব্ব পাড়-যুক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে তোমাকে বড়ই ভাল দেখাইত। এইরূপে বস্ত্রের তারতম্য অগ্রাহ্য করিতে লাগিলে। ইহার পরিণাম এই হইল, যে অবশেষে বেহারের "মুটিয়া," যাহা সে দেশীয় দুঃখীরা ব্যতীত আর কেহই পারে না, তাহাই আদরের সহিত পরিধান করিতে। ঐ কাপড় পরিয়া বড় বড় স্থানে যাইতেও কুণ্ঠিত হইতে না। মতিহারীতে তোমার নিজের হাতে টাকা হইল, কিন্তু অলঙ্কার প্রস্তুত করিলে না। অলঙ্কারের জন্য একদিনও আমাকে বিরক্ত কর নাই। প্রথম প্রথম শাঁখা পরিধান করিতে, শেষে চুড়ি পরিতে, কিন্তু জীবনের শেষে কয় বৎসর শূন্য হস্তেই থাকিতে। হাতে "নোয়া" না থাকিলে স্বামীর অকল্যাণ হয়, এ কুসংস্কার তোমার ছিল না। কোন শ্রদ্ধেয়া ব্রাহ্মিকার হাতের নোয়া তুমি খোলাইয়াছিলে, এবং ব্রাহ্মিকাদের মধ্যে যিনি "নোয়া" পরিতেন তুমি তাঁহাকে কতই তিরস্কার করিতে!

এই সময়ে একদিন একটী ফুলকপি পাইয়াছিলে! তখন মতিহারী পর্য্যন্ত রেল হয় নাই; সে দেশে কপি জন্মিত না, অন্যস্থান

হইতেও সহজে আসিত না। পাটনা হইতে একজন বন্ধু ঐ ফুলকপি উপহার দিয়াছিলেন। আমি তোমাকে বলিলাম এ কপি সকলকে ভাগ করিয়া দাও। প্রেম যে অল্প বস্তু উপহার দিতে সঙ্কুচিত হয় না, তখনও তুমি তাহা জানিতে না। তাই তুমি প্রথম বলিয়াছিলে, "ছোট কপি, পাঁচ জনার বাড়ীতে দিলে তারাই বা কি খাইবে আমরাই বা কি খাইব?" অবশেষে সেই কপিটুকু টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া সকলকে বিলাইলে। বুঝিলে যে যেখানে আত্মীয়তা আছে সেখানে অল্প সামগ্রী উপহার দিলেও সেই আত্মীয়তা বৃদ্ধি হয়। ইহার পর হইতে দেখিতাম, তুমি গৃহের সামান্য সামান্য ভাল বস্তুও সকলকে একটু একটু করিয়া না দিয়া গ্রহণ করিতে না। ক্রমে ক্রমে তোমার দিবার প্রবৃত্তি তোমার ক্ষুদ্র দান শক্তিকে অনেক অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

মতীহারীতে ৫ই মে ১৮৭৬ তোমার প্রথম পুত্র সুবোধচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। পুত্র সন্তান হইল বলিয়া আমার মাতার কতই আনন্দ। লক্ষণ সব ভালই বোধ হইতেছিল, তবুও ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছিলাম। মা বলিলেন, আমি সূতিকা গৃহের নিকটে থাকিলে প্রসূতির যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইবে, এ দিকে বাড়ীতে ঘরও বেশী নাই, তাই আমি নিমবৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়াছিলাম। তখন সন্ধ্যাকাল। পুত্র সন্তান হইয়াছে শুনিয়া আমার মস্তক কৃতজ্ঞতায় অবনত হইল। কোথায় আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব, তাহা না করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম আমার দায়িত্ব কত বাড়িয়া গেল! পুত্র সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া, ধর্ম্মে জ্ঞানে, প্রেমে বর্দ্ধিত করা, এক দুরূহ ব্যাপার মনে হইতে লাগিল। তোমার অগোচরে একাকী ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রথম দুই সন্তানের জন্মের সময়ে যেরূপ বিঘটন ঘটিয়াছিল, এবার সেরূপ কিছুই ঘটিল না।

আমরা মতিহারী থাকিতেই বন্ধু—বাবুর জীবনে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু অনেক দিনের

আভাস পরিত্যাগ করিয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, লিভার ফুলিল। অবশেষে ছুটী লইয়া তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইল। তাঁহার নিরাশ্রয়া পত্নী তোমার নিকটে আশ্রয় লাভ করিলেন। তাহাকে তুমি আপনার সহোদরার মত আদরে গ্রহণ করিলে। তোমার বাটীতে তিনটী মাত্র ঘর; তাহার একটি রাম ও বসন্তের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলে। স্থানের টানাটানি সত্ত্বেও আর একটি ঘর ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে। আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র ঘর রহিল না। এ অসুবিধাকে তুমি অসুবিধা জ্ঞান করিলে না। শুধু তাহাই নহে; টানাটানির সংসারে অম্লানবদনে ইঁহাদিগের ভরণ পোষণের সমুদয় ভার নিজ মস্তকে লইলে। যথাসাধ্য 'তন্ মন্ ধন্' দিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলে।

ইহার তিন মাস পরে যখন সেই বন্ধু ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার নবজীবন লাভ হইয়াছে। পূর্ব্বের মত তাঁহাকে দেখিয়া আর ভয় করিত না। একত্রে উপাসনা, একত্রে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। মতিহারীতে যেন একটা নূতন যুগ উপস্থিত হইল। ক্রমে তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করিলেন। নগরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমরা এখন ৪।৫ জন ব্রাহ্ম হইলাম। ইহার কিছুকাল পরে শ্রদ্ধেয় সাধু অঘোরনাথ এখানে আসিলেন। কত উপদেশ, কত নাম সঙ্কীর্ত্তন হইল। তিনি পদ্মবনে গিয়া যোগে মগ্ন হইতেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। আমরা সাধন ভজন কি করি, কি না করি, তিনি সমুদয় জিজ্ঞাসা করিতেন। আমাদের পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া এমন করিয়া আর বোধ হয় কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না। পুত্র সুবোধের নামকরণ অনুষ্ঠান তিনিই করিলেন। এই নামকরণ, এবং —বাবুর, তাঁহার স্ত্রীর, তোমার, ও বসন্তের দীক্ষা এবং মতিহারী সমাজের উৎসব একবারে হওয়াতে একটা ভারী তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল।

এই সময় সাধু অঘোরনাথ প্রত্যহ দুইবার স্নান করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্নানান্তে যোগে বসিতেন। তারপর নামগান করিতেন। অতিশয় মিষ্ট লাগিত। আহার করিয়া কত ভাল ভাল কথা কহিতেন। একদিন তাঁহার এক জন বন্ধুর বিষয়ে বলিলেন, যে তাহার দুর্দ্দশা যে পত্নীর নিকটে ভিন্ন তাহার নিদ্রাই হয় না। আরও বলিলেন যে অনাসক্ত না হইলে পরিত্রাণ নাই। যে রাত্রে সাধুর মুখে এই সংবাদ শুনিলাম, সেই রাত্রেই নিজকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ভাবিলাম। আপনার শয্যা সাধুর নিকটে করিতে আদেশ দিলাম। তোমার তাহাতে আপত্তি হইল না। এমনি অভ্যাসের গুণ, দেখিলাম সাধু অকাতরে নিদ্রা গেলেন, কিন্তু আমার নিদ্রা হইল না। সেখান হইতে পলায়ন করিয়া তোমার ঘরে গেলাম, তবে নিদ্রা হইল। আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিলাম। তোমার সঙ্গে কত পরামর্শই করিলাম। কিসে এ আসক্তি চলিয়া যায় তাহার জন্য কত চেষ্টাই আরম্ভ হইল। এই যে সাধন আরম্ভ হইল, ক্রমে এ পথে গিয়া কত সঙ্কল্প করিতে হইয়াছে ও আবার কত বার পতন হইয়াছে সকলই তুমি অবগত আছ। তোমার সহায়তা ভিন্ন আমি এ দুর্গম পথে একাকী কখনই চলিতে পারিতাম না।

কয়েক মাস পরে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বসন্ত প্রসূতি হইলেন। তাঁহার ঘরে একটি ঘটীর প্রয়োজন হইল। বাটীতে একটি মাত্র ঘটী ছিল, সেই ঘটীর জন্য বসন্ত তোমাকে কিছু শক্ত কথা বলিলেন। তুমিও প্রত্যুত্তর দিলে। আমি শুনিবামাত্র তোমাকে বলিলাম, তুমি বসন্তের পায়ে ধরিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমি বয়সে ও সম্পর্কে বড়, এবং তোমার দোষও ছিল না, তাই তুমি প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলে, কিন্তু ভালবাসার খাতিরে তুমি আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলে। সেইদিন আপনাকে জয় করিতে তোমার অনেক কষ্ট হইয়াছিল। ভবিষ্যতে আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলে—"সেই দিন যে কি কষ্টে ক্ষমা চাহিয়াছিলাম তাহা

অন্তর্য্যামী জানেন, আর তুমি জান।” আমি তোমার আত্মজয় দেখিয়া, ধন্যবাদ দিলাম। এই যে ক্রটি-স্থলে অবনত হইতে শিখিলে পরবর্ত্তী জীবনে এই শিক্ষা কখনও বিস্মৃত হও নাই।

মতিহারীর যে বাড়ীটিতে আমরা ছিলাম, অনেকদিন তাহার সংস্কার হয় নাই বলিয়া অন্য বাড়ীতে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। তোমার চরিত্রের আকর্ষণ এই সময় হইতে অনুভূত হইতেছিল। তাই, যখন নূতন বাড়ীতে যাইব ঠিক হইল, অমনি বন্ধু—বাবুও বলিলেন, আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। এ বাড়ীর ভিতরে তিনটী ঘর, বাহিরে একটী ঘর। সকলের অপেক্ষা অধম ঘরটীই তোমার ভাগ্যে পড়িল। সকলে আপনার ঘর পছন্দ করিয়া লইলেন; শেষ যাহা থাকিল তাহাই তোমার রহিল। সে ঘরে বায়ুর গতিবিধি নাই, পাইখানার নিকটবর্ত্তী, তবুও তুমি একদিনও অসুখী হও নাই। এই সময় আবার আমার সেজদাদা মহাশয় নিরাশ্রয় হইয়া আমাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাহিরের ঘরটীতে তিনি রহিলেন। বাড়ীটী যেন টলমল করিতে লাগিল। সুখের বিষয় যে তখন প্রতিদিন সকলে একত্র উপাসনা করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইতাম। কিছুদিন পরে আমি পাটনার আবগারী ইন্‌স্পেক্টার পদে বদলী হইলাম। তোমাকে মতিহারীতেই রাখিয়া আমি বাঁকিপুরে চলিয়া গেলাম।

আমার চলিয়া যাইবার পর মতিহারীর উৎসব উপস্থিত হইল। কিন্তু বাড়ীতে আমার দাদা রহিয়াছেন। তাঁহার মত ছিল না যে তুমি উৎসবে যাও। এদিকে উৎসবও অন্যবাড়ীতে (উমাচরণ বাবুর বাড়ীতে) হইবে। তুমি ধর্ম্মের আহ্বানে আর স্থির থাকিতে পারিলে না। কয়েকদিন উৎসবের পর যখন বাড়ী ফিরিয়া গেলে, তখন নিজের বাটীতে নিজেই একঘরে হইলে। তোমার সঙ্গিনী বসন্তও তোমার সঙ্গে একঘরে হইলেন। সকলের আহারাদি হইলে তোমরা দুজনে নিজের অন্ন নিজে প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে। কেবল আমার উৎসাহ, আমার প্রার্থনা এবং সান্ত্বনা তোমাকে উচ্চ

করিয়া দিত। তুমিও প্রতিদানে অবহেলা করিতে না। এ মিলনের পূর্ব্বাভাস মাত্র।

ইহার কয়েক দিন পরে মতিহারীর বাসা তুলিয়া দিতে হইল। তোমাকে আবার দেশে যাইতে হইল। দেশে গিয়া সকলেই পীড়িত হইলে। বিশেষতঃ সুবোধ রক্তামাশয়ে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তাই অনন্যোপায় হইয়া তোমাদিগকে বাঁকিপুরে আনিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ বাঁকিপুরে প্রথম বার

আমার বাঁকিপুরে আগমনের প্রায় একবৎসর পরে আবার মতিহারীর উৎসব উপস্থিত হইল। সুবোধচন্দ্র তখনও ভুগিতেছেন। উৎসবেও থাকা হইবে, ও বায়ু পরিবর্ত্তনও হইবে, এইজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে উঁহাকে লইয়া মতিহারী চলিলাম। সেখানে গিয়া প্রথম প্রথম উঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইল। একমাত্র পুত্রসন্তান, অতি আদরের ধন ; মনে হইল তাঁহাকে বুঝি বাঁচাইতে পারা যাইবে না। একদিন নাড়ী আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। আমি তোমাকে ডাকিয়া আনিয়া তোমার সঙ্গে তাঁহার জীবনের আশঙ্কা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তোমার ধৈর্য্য ও নির্ভর আমা অপেক্ষা অধিক। এমন স্থিরচিত্তে তত্ত্বজ্ঞানীর মত কথা কহিলে যে শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। বুঝিলাম, আমরা দুজনে ভগবানের সকল বিধিকেই চিরদিন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারিব।

চিকিৎসা করিতে করিতে ক্রমে সুবোধ ভাল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তুমি শয্যাগত হইলে। চিকিৎসক বলিলেন, উদরে গুল্ম রোগ হইয়াছে। অতি কষ্টে তোমাকে মতিহারী হইতে বাঁকিপুরে ফিরাইয়া আনিলাম। বাঁকিপুরের ডাক্তারেরা কলিকাতায় লইয়া যাইতে

পরামর্শ দিলেন। কলিকাতায় কয়েকজন ডাক্তারের চিকিৎসার পর কবিরাজ দেখান হইল। দুইজন কবিরাজ দেখিয়া বলিলেন, রক্তজ গুল্ম হইয়াছে, বিশেষ চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইবে। বুঝিলাম, রোগ সহজ নয়। তখন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চিকিৎসা হইতে লাগিল। তিনি সপ্তাহে সপ্তাহে ভবানীপুরে আসিতেন ও চিকিৎসা করিতেন। কিন্তু কিছুই উপকার হইল না। পূজার ছুটীতে আমি তোমাকে দেখিতে গেলাম। এমন রোগা তোমাকে কখনও দেখি নাই। এ অবস্থায়ও তুমি আমার সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে, দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিত। ভবানীপুর থাকিয়া চিকিৎসা ভাল হইত না বলিয়া বন্ধু ফণী কলিকাতায় তোমার জন্য বাসা ভাড়া লইলেন। বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার সময় আমি নিজে একদিন গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন, রোগ "অষ্ঠিলা," আরোগ্য হইবার নহে। চেষ্টা করিয়া খাড়া করিয়া দিব, কিন্তু আরোগ্য হইবে না। তখনকার আমার মনের অবস্থা তুমিই বুঝিতে পারিবে। এদিকে আমার ছুটী ফুরাইল। আমাকে বাঁকিপুর চলিয়া আসিতে হইবে। ভারাক্রান্ত মনে সাধু অঘোরনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও তোমাকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বলিলেন, অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে, আরও কিছু ব্যয় করিয়া সাহেব ডাক্তার দেখান; নইলে ক্ষোভ থাকিবে। আমার আর ছুটী ছিল না; বন্ধু ফণীকে বলিলাম, ডাক্তার চার্‌লস্ সাহেবকে দেখাইও। আমি যে দিন বাঁকিপুরে ফিরিয়া যাইব তাহার পূর্ব্বরাত্রে তুমি আমি দুজনেই ক্রন্দন করিলাম। এ জীবনে এমন ক্রন্দন করিয়াছি কি না মনে নাই।

চিকিৎসার কিছু ফলও হইতেছে না, চিকিৎসকগণও একমত হইতেছেন না। ডাক্তার-মহাশয় বলিলেন, তোমার 'টিউমার' হইয়াছে। অবশেষে সুবিজ্ঞ ডাক্তার চার্‌লস্ সাহেব আসিয়া পরীক্ষা

করিয়া বলিলেন, কোনও রোগ নয়, উদরে ছয় মাসের সন্তান আছে। শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। এত ডাক্তার, এত কবিরাজ কেহই ত সন্তানের কথা উল্লেখও করেন নাই!—মহাশয় তবুও বলিতে লাগিলেন, সন্তানও আছে, টিউমারও হইয়াছে। ডাক্তার চার্লস্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে তোমাকে বাঁকিপুরে লইয়া যাইতে পারা যায় কি না। তিনি বলিলেন, কোনও রোগ নাই কাজেই লইয়া যাইতে কোন দোষ নাই; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় তখন বাঁকিপুরে মুনসেফ ছিলেন। তাঁহার পত্নী স্বর্গীয়া সৌদামিনী দেবী তোমাকে তাঁহার বাটীতে আসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ১৮৭৯ সালের শেষে বাঁকিপুরে প্রত্যাগমন করিলে ও সৌদামিনী দেবীর সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলে। দুই বৎসর কাল তোমরা একত্রে ছিলে। কোনও দুই বঙ্গনারীর মধ্যে এমন সদ্ভাব আমি দেখি নাই। তিনি বিদ্যাবতী, তুমি নিরক্ষরা বলিলেই হয়; তিনি ভাবী জজপত্নী, তুমি দুঃখিনী আবগারী ইন্‌স্পেক্টারের স্ত্রী মাত্র, কিন্তু আত্মা দুজনেরই আশ্চর্য্যভাবে উন্নত। দুজনেরই সন্তানাদি ছিল, কিন্তু সন্তান লইয়া কিম্বা অন্য কোন বিষয় লইয়া দুজনার মনোমালিন্য কখনও দেখি নাই। দুই জনারই ভগবানে মতি, ভাবান্তর হইবে কেন? একটিমাত্র ঘরে তোমার ভাঁড়ার, শয়ন, উপাসনা সকলই হইত। কিন্তু তুমি বড়ই সুখে থাকিতে। একদিন আমি কার্য্যোপলক্ষে সীতামাঢ়ি গিয়াছি, এমন সময়ে তোমার দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। মিষ্টার রায় ও তাঁহার স্ত্রী এই সময় তোমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে না থাকিলে তোমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইত। সন্তান হইল, টিলমার, অষ্ঠীলা, রক্তজ গুল্ম, কিছুরই চিহ্ন দেখা গেল না। প্রথমে কিছুই বোঝা যায় না, শেষে এইরূপই হয়। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে আমরা সকলেই তৃপ্ত হইলাম। সমুদয় আশঙ্কা চলিয়া গেল।

অঘোর-প্রকাশ

বিকাশ

তৃতীয় খণ্ড ঃ গৃহস্থবৈরাগিণী

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ মনের প্রসার

মতিহারী থাকিতেই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করিতে শিখিতেছিলাম। এবার সেই জীবন নানাদিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে জীবনকে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব রহিল না। বুঝিলাম বাহিরের জনসমাজের সেবা না করিলে ঘরের ধর্ম্মও ঠিক থাকে না; আর বাহিরের জগৎ দেখিয়া মনটা বড় না হইলে, ভাল লোকের সঙ্গে মিশিয়া আত্মা উন্নত না হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করা যায় না। তুমিও বুঝিতে লাগিলে তাই এ সময় হইতে আমাদের চেষ্টা হইল যে কিসে আমাদের জীবন, বিশেষতঃ তোমার জীবন, সংসারের সীমা ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

তোমার ধর্ম্মজীবন কিরূপ দাঁড়াইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতাম না। দীক্ষাগুরু ভাল পাইয়াছিলে সত্য; মতিহারীতে উপাসনা করিতে শিখিয়াছিলে তাহাও সত্য; কিন্তু এ শিক্ষা পাকা কি না তাহা জানিতাম না। নিত্য উপাসনা করিতে শিখিয়াছিলে, কিন্তু সমবেত মণ্ডলী কাহাকে বলে তাহা তখনও জানিতে না। বন্ধু উমাচরণ ঘটক, তোমার ভাইঝি-জামাই রামলাল, এবং শিবনাথ, এই কয়েক জনের সঙ্গে তোমার আলাপ হইয়াছিল। বাহিরের জগৎ দেখিয়া মনের যে প্রসার হয়, তাহা তোমার তখনও হয় নাই। ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকারা কিরূপ তাহা বিশেষ জানিতে না। ভাল ভাল আত্মার সংস্পর্শে আত্মার যে উন্নতি হয় তাহাও তোমার হয় নাই দ্বিতীয় পুত্র

সাধনচন্দ্রের জন্ম হয়, তখন মিঃ কে এন রায়, ভিন্নদেশের লোক হইয়াও কিরূপে ভাইয়ের মত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা দেখাইলেন। তাঁহার স্ত্রী স্বর্গীয়া দেবী সৌদামিনী দেখাইলেন, কিরূপে নিরাশ্রয়জনকে আশ্রয় দিতে হয়, আপনার কোলে টানিয়া লইতে হয়। তোমার মন ইহাতে খুলিয়া গেল। তুমি বুঝিতে যে আমাদের অজানিত কত শ্রেষ্ঠ মনুষ্যরত্ন আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ হওয়া আবশ্যক। তাই এখন হইতে আপন সংসারের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে কি আছে দেখিবার ইচ্ছা হইল; আমিও সেই ইচ্ছা পোষণ করিতে লাগিলাম। এতদিন তুমি পল্লীগ্রামের পুরনারীর মতই বাস করিতে; বিদ্যা শিক্ষাও এমন কিছু হয় নাই যে তাহাতে তোমার অজ্ঞান অন্ধকার শীঘ্রই দূর হইবে। জ্ঞানের অভাব দূর করা প্রয়োজন, কিন্তু কি উপায়ে হয়? ধর্ম্মে ও জ্ঞানে উন্নত ভাল ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ হইলে, তাঁহাদের প্রসঙ্গ শুনিলে, তাঁহাদের উপাসনায় যোগ দিলে সে আঁধার অল্পে অল্পে চলিয়া যাইতে পারে। তাহাই হইতে লাগিল। যেমন যেমন ভাল ভাল লোকের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিতে লাগিলাম, তোমার অজ্ঞান আঁধার দূর হইতে লাগিল। তোমার উৎসাহ দেখিয়া আনন্দ আর ধরিত না; আমারও উৎসাহ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। নারীসুলভ লজ্জা ও ভয় অতিক্রম করিতে লাগিলে। তোমার সাহস বাড়িতেছে, আর অন্য লোকের সঙ্গে মিশিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী তুমি শিখিতেছ, দেখিয়া আমারও সাহস বাড়িল। তোমার গুণে আমারও বন্ধুসংখ্যা বাড়িয়া চলিল। এই বাহিরের প্রসার, আমাদের পারিবারিক দৈনিক উপাসনার ভাবকে গভীর করিতে লাগিল। ভাবগুলি উন্নত হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের ভাল উপাসনার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইল।

তুমি এইরূপ বাহিরে মিশিতে লাগিলে। আমার জীবনে বাহিরে মিশিবার একটী উপায় ছিল, তাহা তোমার সব সময় হইয়া উঠিত না।

মফঃস্বলে গিয়া আমি কত ভাল ভাল লোকের সঙ্গ পাইতাম, কত স্থানে কত শিক্ষা সংগ্রহ করিলাম। যখন তুমি আমার সঙ্গে যাইতে পারিতে না, তখন সে সকলের অংশ তোমাকে দিবার জন্য ব্যাকুল হইতাম। এই সময়ের একবারকার কয়েক খানি পত্র তাহা প্রকাশ করিবে।

"৫।১।৮০। আজ এখন জাহানাবাদে। রাত্রি ৯টা বাজিয়াছে। এই আহার করিয়া আসিলাম। এখানে একটি সুন্দর বাঙ্গালা আছে, ইহাতে প্যারী বাবু থাকেন। তাঁহার পরিবার এখানে; তিনি আজ বাসায় নাই। ভবুয়ায় গিয়াছে। এখানে আসিয়া আমি যে আহার করিব সে কথা বলিতেও হয় নাই। প্যারি বাবুর স্ত্রী আপনা হইতেই পুরী, তরকারী, বেগুন ভাজা ও দুধ প্রস্তুত করিয়াছেন। প্যারী বাবুর সঙ্গে যে আমার আলাপ আছে তাহা বোধ হয় তিনি জানেনও না। এমন অবস্থায় যত্ন করা সহজ নয়। তুমি কি পার? স্বামীর অপরিচিত বন্ধুকে যত্ন করা সকলের দ্বারা হইয়া উঠে না। দুই একজন নারী (ব্রাহ্মিকা) জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে অভ্যাগত ব্যক্তির সঙ্গে বাটীর কর্ত্তার আলাপ আছে কি না? ইনি তাহাও করেন নাই। তাই এত প্রশংসা করিতেছি।"

এই পত্রের মধ্যে "তুমি কি পার" ইহা কেন বলিয়াছিলাম, তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছিলে। হয় তো এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আরও ভাল করিয়া অতিথি সৎকার করিতে শিখিয়াছিলে।

"১২ জানুয়ারী ১৮৮০। আজ প্রাতে উঠিয়া শোণে স্নান করিতে গিয়াছিলাম। বড় নদী দেখিলে মন বড়ই প্রশস্ত হয়; তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বালির তটে বসিয়া স্নানান্তে উপাসনা করিলাম। এক নূতন ভাব হইল। ধু ধু করিতেছে বালির চড়া; তাহারই মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরের পূজা করা কিছু সামান্য ব্যাপার নহে। ফিরিয়া আসিবার সময় অনেক উপলখণ্ড কুড়াইয়া আনিলাম। এক টুকরা পাথর পাইয়াছি, তাহার দ্বারা এই স্থানের স্মরণার্থ একটি আংটী করিয়া লইব।



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

জন্ম ঃ ১৯শে নভেম্বর ১৮২৮ মৃত্যু ঃ ৮ই জুন ১৮৮৫

বালির তটে অনন্তের পূজার কথা বলিয়া তোমাকে লোভ বাড়াইয়া দিলাম। আংটীর কথা আমি বলিয়াছিলাম মাত্র; তুমিই তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে, এবং পাথরের উপর "অ প্র" লিখাইয়া রাখিলে এ দুটী অক্ষরের অর্থ কি এখন আর তাহা বলিতে হইবে না। এ জীবনীই তাহার পরিচয়।

একদিকে আমি যেমন তোমার মনের প্রসার কিসে হইবে তাহার জন্য ব্যস্ত হইতাম, আবার তুমিও সদাই ভাবিতে, কিসে আমার কর্ম্মজীবন সরস থাকিবে, কর্ম্মশ্রান্ত আত্মা বল লাভ করিবে। তাই ২০শে জানুয়ারী ১৮৮০ আমাকে পত্রে লিখিয়াছ, "ভাই, আজ সন্ধ্যার সময় তোমার ভবুয়ার পত্রখানি পাইলাম। আজ বৈকালে হরিসুন্দর বাবু আসিয়াছেন। তিনি কালকার সকালের গাড়িতে কলিকাতায় যাইবেন। তুমি কি যাইবে না? যদি ২৩শে তুমি বাঁকিপুর এস, তবে কেমন করিয়াই বা ছুটি লইবে, আর কেমন করিয়াই বা যাইবে? শনিবারে উৎসব। তবে কি তুমি যাইবে না? তোমার যদি না যাওয়া হয়, তবে আমার বড় মন-কষ্ট হইবে। তাই এত করিয়া বলিতেছি। যদি ২১।২২শে এখানে এস, তবে গতি বাবুকে বলিয়া সাহেবের কাছে ছুটী লইয়া ২৩শের ডাক গাড়িতে যাইতে পার। যাহা ভাল হয় করিও; হরির (ঈশ্বর লিখিতে হরি লিখিয়াছি,) ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আজ তোমাকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছে। গত কল্য বড় ভাল উপাসনা হইয়াছিল। তোমার শরীর মন কেমন? শীঘ্র লিখিও। যত শীঘ্র পার আসিতে চেষ্টা করিও। ২১।২২শে আসিও। কেমন, তাই তো?"

এই সময়ে দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাশয়দিগের সঙ্গে তোমার পরিচয় হইল। তাঁহাদের এবং অন্যান্য ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে উপাসনা করিয়া আমরা এসময় অনেক উপকৃত হইয়াছিলাম। শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু মহাশয় উপদেশে শিশু চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। শিশু সুখী, কারণ সে

নিরাশ্রয়, সে নির্ভর করিতে জানে। রোগী দুর্ব্বল, অথচ সুখী নয়। গৃহহীন পথের ভিখারী নিরাশ্রয় বটে, কিন্তু সুখী নয়। ক্রীতদাস নির্ভরশীল, তবু সুখী নয়, ইহারা সুখী নয়, কারণ ইহারা সকলেই আপন আপন অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে চায়। আমরা যদি জগজ্জননীর উপরে শিশুর মত নির্ভর করিতে পারি তবে সুখী হইব। তাঁহার উপদেশ খুব ভাল লাগিয়াছিল। তখন বাঁকিপুরে অন্য ব্রাহ্ম কেহ ছিলেন না। কয়েকটী হিন্দু বন্ধু এ উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। বাজনা হয় নাই বলিয়া শ্রদ্ধেয় মহাশয় অনুযোগ করিলেন। বলিলেন, সকল জাতকর্ম্মেই ধুমধাম করা উচিত, কেন না কেহ তো জানে না সন্তান ভবিষ্যতে কোন্ মহৎকার্য্যে নিযুক্ত হইবে!

দেবী সৌদামিনীর সঙ্গে তুমি কখনও কখনও গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতে এবং তাহাতে তোমার শরীর ও মনের বিশেষ উপকার হইত। জ্ঞান লাভের দ্বিতীয় উপায় ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখা। একদিন তোমার নিকট ডুমরাওনের জঙ্গলের বর্ণনা করিলাম এবং তথায় যাইবার প্রস্তাব করিলাম। তুমি আনন্দে সম্মতি দিলে। দিন কয়েক পূর্ব্বে ট্রেনে মধ্যম শ্রেণীর স্ত্রীলোক যাত্রীদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র কামরা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া প্রস্তাব করিলাম সুবোধচন্দ্রকে লইয়া তুমি সেই স্বতন্ত্র কামরায় যাও। প্রথম প্রথম এ প্রস্তাবে ভয় পাইয়াছিলে। বঙ্গনারীর পক্ষে একাকী স্বতন্ত্র কামরায় যাওয়া কি সহজ? কিন্তু আমার কথা রাখিবার জন্য একাকী যাইতে সম্মত হইলে। আমিও প্রতি ষ্টেশনে নামিয়া তোমাকে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে তোমার সাহস বাড়িল ও প্রকৃতিস্থ হইলে। এইরূপে একাকী পথ চলিতে প্রথম শিক্ষা পাইলে। ইহার পর একাকী ভ্রমণ করিতে আর কখনও ভয় পাও নাই। সন্ধ্যার পর ডুমরাওন পৌঁছিলাম। সেখানে গাড়ী পাওয়া যায় না। পালকিও পাওয়া যায় না। এক্কা পাওয়া যায়। তুমি তাহাতেই যাইতে স্বীকার করিলে। আমি নিজেই হাঁকাইলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য

কেশবচন্দ্র সদলে ডুমারাওনের বনটীতে উপাসনা করিয়াছিলেন। আমরাও ঐ বনে উপাসনা করিলাম। জঙ্গল দেখিয়া তোমার মন উন্নত হইল, আমিও পরম সুখী হইলাম। প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতিনাথকে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম।

বাহিরে আসিয়া তোমার মনের স্বাধীনভাব বাড়িতে লাগিল, সাহস বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির অধিকার বিষয়ে, নারীজীবনের আদর্শ বিষয়ে, চিন্তার স্রোত খুলিয়া যাইতে লাগিল। যতই তুমি বাহিরের জগৎ দেখিতে লাগিলে, ততই বুঝিতে পারিলে, এদেশে নারীর অবস্থা কত হীন, এবং তাঁহার উন্নতির পথে পদে পদে কত বাধা—ততই তোমার মনে ক্লেশও হইতে লাগিল। ১৮৮১ সালে তুমি যখন গয়াতে গিয়াছিলে, সেখানকার উৎসবে যোগ দিয়া, সকলের উৎসাহ ও প্রমত্ত ভাব দেখিয়া, নারীদিগের জন্য তোমার এই বেদনা আরও জাগিয়া উঠিল। উৎসবান্তে সকলে শ্যামাচরণ বাবুর বাটীর প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তুমি আর থাকিতে পারিলে না। তুমি দেখিলে, কেবল পুরুষেরাই এইরূপে সমবেতভাবে হরিগুণ কীর্ত্তন করেন। নারীদের ভাগ্যে তাহা হয় না। তুমি তখন উপরের বারান্দা হইতে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলে, "ভগবান্, তোমার পুত্র সন্তানদের জন্য এত করিলে, ভালই হইল; তোমার কন্যাদের জন্য কি করিলে? তাহাদের মুখপানে কে চাহিবে? তাহাদের উন্নতি কিরূপে হইবে?" উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন আলোচনা প্রভৃতি যাহা কিছু পুরুষেরা করিতেন, তোমার মনে হইত যে নারীদেরও তাহা করা আবশ্যক, ও তাহা করিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। আর যথার্থ কথাও তো তাই। বিধাতা একই ধাতুতে নারীর ও পুরুষের আত্মাকে গড়িয়াছেন, ভিন্ন নিয়ম কিরূপে হইতে পারে? অধিকারে বড় ছোট কিরূপে হইতে পারে? যখন সামাজিক উপাসনায় আচার্য্য বলিতেন, "আমরা দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করি," তখন কোন নারীই উঠিতেন না; কিন্তু তুমি আপনাকে সমাজের একজন লোক মনে করিতে, এবং

প্রত্যেক সামাজিক উপাসনায় সাধারণ প্রার্থনার সময় পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে। এজন্য তোমাকে অনেক নিন্দা ও ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতে না।

তোমার ঐ দিনের করুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সকলেরই মন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইল। শ্রদ্ধেয় প্রচারক কেদারবাবু মহাশয় তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সাধু অঘোরনাথ তখন গয়ার সেই দলে ছিলেন। তিনি তোমাকে পূর্ব্বেই ভাল বাসিতেন, এখন সে আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গয়ায় থাকিতেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার মাতা স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, বাঁকিপুরে তোমার বাটীতে গিয়া নিজের মাতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার এই আত্মীয়তা প্রকাশে আমরা কতই কৃতার্থ অনুভব করিলাম। বাঁকিপুরে আসিয়া তিনি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন সেই ভাবে সুশৃঙ্খলরূপে তুমি শ্রাদ্ধের সব কাজকর্ম সম্পন্ন করিলে।

শ্রদ্ধেয় সাধু অঘোরনাথের প্রভাব আমাদের জীবনে ক্রমশঃ অধিক কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ সাধুপুরুষ ছিলেন। যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম যেন তাঁহাতে সমানভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। আমাদের বড় সাধ হইতেছিল যে তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের জীবন গড়িব। মনের এই সাধ তখনও কোনও সঙ্কল্পের আকারে প্রকাশ করি নাই। কিন্তু মনের ভিতর ইহার ক্রিয়া গূঢ়ভাবে হইতে লাগিল।

এই বৎসর ১লা জুন হইতে বাড়ীতে একটী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন হইল। তুমি প্রতিমাসে স্বামীর বেতনের টাকা অগ্রে গৃহদেবালয়ে ঈশ্বরচরণে নিবেদন করিয়া তাহার পরে ব্যয় করিতে লাগিলে। বালকবালিকা সকলেই বুঝিতে লাগিল, যে ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত একটি পয়সাও ব্যয় করিতে নাই। এই ব্রত রক্ষার জন্য পরে তোমাকে বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে আমার কনিষ্ঠ প্রবোধ তাঁহার পরিবার লইয়া বাঁকিপুরে উপস্থিত হইলেন। এতগুলি পরিবার লইয়া দেবী সৌদামিনীদের সঙ্গে একত্রে থাকিলে তাঁহাদের অস্থুবিধার সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহাদের ভালবাসা অতিক্রম করা কঠিন বলিয়া আরো কিছুদিন থাকিতে হইল। অবশেষে ১৮৮১ সালের শেষভাগে অন্য বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম।

আবার তোমার গৃহিণীর কার্য্য আরম্ভ হইল। এইবার দেখিলাম, তুমি কেমন সুশৃঙ্খলার সহিত গৃহকর্ম্ম করিতে পার, আবার কত যত্নের সহিত দৈনিক ধর্ম্ম সাধনটুকুকেও ধরিয়া থাক। এ বাড়ীতে আসিয়াই পৃথক্ উপাসনার ঘর নির্দ্দিষ্ট করা হইল। প্রতিদিন দেবালয়ে বসিয়া ভক্তিভরে আমার সঙ্গে মিলিয়া প্রাণেশ্বরের চরণ পূজা করিতে। তোমার নিষ্ঠা আমার কত সাহায্য করিত। একদিনকার কথা বেশ মনে আছে, চিরকাল মনে থাকিবে। সেদিন সকালে আমার উপাসনা ভাল হয় নাই। মন অশান্ত হইয়াছিল। তাই সন্ধ্যার সময় তুমি অনুরোধ করিলে, আবার উপাসনা হউক। তোমার সেই অনুরোধের ফল কি হইয়াছিল, তাহা আমার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। "উপাসনা সরস হইল না। সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর অনুরোধে উপাসনা ঘরে বসিলাম, ও মহা উপকার পাইলাম। প্রাণ ভিজিয়া গেল।" এরূপ না হইলে কি সংসারে চলিতে পারিতাম? এইরূপে তুমি যে আমাকে কত দিন আধ্যাত্মিক কত বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছ, তাহা বলিতে পারি না। আমার মন শুষ্ক হইলে তুমি আমার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতে, ও কিসে সে শুষ্কতা যায় তাহার চেষ্টা করিতে।

একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু পীড়িত হইয়া এই সময়ে কয়েকদিন আমাদের বাটীতে ছিলেন। তোমার সেবা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। উপাসনার সময় তোমাকে মা ভগবতী বলিলেন, কন্যা দুটিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বলিলেন, পুত্র দুটিকে কার্ত্তিক

ও গণেশ আখ্যা দিলেন। এত প্রশংসা আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু তুমি তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য ভাব জাগাইয়া দিয়াছিলে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি চলিয়া গেলে তোমার অপূর্ণতার বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করিলাম; কারণ কেবল প্রশংসা লাভ করিলে মানুষের ক্ষতি হয়।

নবম পরিচ্ছেদ : তপস্যার আরম্ভ

১লা জুলাই ১৮৮২ তোমার তৃতীয় পুত্র বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়। তখন তোমার বয়স ২৬ বৎসর। এই আমাদের শেষ সন্তান। অনেকগুলি সন্তান হইলে যে নারীর ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত হয় তাহা তুমি বুঝিয়াছিলে। সমাজে যাইতে হইলে সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া দাসীর নিকট রাখিয়া যাইতে; কিন্তু অতি শিশু সন্তানকে তো রাখিয়া যাওয়া যায় না। তা ছাড়া ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে গর্ভস্থ সন্তান সাধনের আরও ব্যাঘাত করে, এ কথা সদাই বলিতে। এইবার তাই আমরা দুজনে সন্তান ক্রোড়ে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর সন্তান হইবে না। কিছুকাল পরে যখন এই সন্তানের নামকরণ উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় আসিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে আমরা দুজনে ছয় মাসের জন্য আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ করিলাম; প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এই ছ মাস শরীরের সম্পর্ক থাকিবে না। সন্তানের মাথায় হাত দিয়া এ প্রতিজ্ঞা শক্ত করা হইল। কত ভয়ে ভয়ে তখন এই ব্রত গ্রহণ করিতেছিলাম! কত কম্পিত হৃদয়ে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়ের কাছে এ সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম! কিন্তু ভগবান সহায় হইয়া দেখাইয়া দিলেন তিনি দুর্ব্বল মানুষের দ্বারা কি আশ্চর্য্য কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন।

নবসংহিতায় আছে, এক সপ্তাহের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিবে। এক সপ্তাহ ব্রত পালন আমাদের বিশেষ শক্ত বোধ হইল না। আমরা প্রকৃতিকে একেবারে শাসনাধীনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। সাধু অঘোরনাথের সহিত আলাপের পর অনেকবার ইহার অনুরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, কিন্তু হারিয়া গিয়াছি। এক মাস দুই মাস তিন মাস বেশ ভাল গেল, আমার প্রতিজ্ঞার বল চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ কতবার হইয়াছে। তোমার ও আমার দুর্ব্বলতা আমরা দুজনেই অবগত ছিলাম। তাই ভয়ে ভয়ে এবারও ছয় মাসের জন্যই ব্রত গ্রহণ করিলাম। সাক্ষী রহিলেন কেবল ভগবান ও ত্রৈলোক্য বাবু মহাশয়।

* *
*

দেবি, তুমি কি এখন তোমার দেহের জীবনের এ সকল সংগ্রাম স্মরণ কর? তুমি এখানকার তরঙ্গের পরপারে গিয়াছ, আমি এখনও রহিয়াছি। এখানকার সুদীর্ঘ জীবনে যে কষ্ট বহন করিয়াছিলে, তাহা কি মনে পড়ে? তোমার জীবন-কাহিনী বলিতে বলিতে এ জীবনের সে সব কথা বলিতে হইবে; যত উত্থান পতন হইয়াছে, যত আশা ও যত ব্রহ্মকৃপা লাভ করিয়াছি, সকলেরই সাক্ষ্য দিয়া যাইব। তোমাকে সম্বোধন করিয়া যখন বলি, তখন যেমন মুক্তপ্রাণে বলিতে পারি, এমন আর কখনও পারি না। দেবি, তোমার উচ্চ স্থান হইতে, শুদ্ধ অবস্থা হইতে, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, বলিতে বলিতে যেন আমি আরও উচ্চে উঠিয়া যাইতে পারি।

* *
*

ঐ ছয় মাসের পাঁচ মাস অতীত হইলে মাঘ মাস উপস্থিত হইল। আমরা কলিকাতার উৎসবে যাইব, স্থির হইল। আমি বলিলাম, তুমি আমার পূর্ব্বে যাত্রা করিয়া, একবার পিত্রালয়

হইয়া, তারপর কলিকাতায় এস। তোমার একাকী দেশে যাইতে ইচ্ছা ছিল না। আমার অনুরোধে অবশেষে স্বীকৃত হইলে। পিত্রালয়ে অধিক দিন থাকিবার সময়ও ছিল না। তিন দিন পরেই মাতাকে বলিলে, "কলিকাতায় যাইব।" উদ্দেশ্য এই, যে কলিকাতায় গিয়া বাসস্থান ঠিক করিবে ও আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। মাতা বলিলেন, "অনেক দিন পরে আসিয়াছ, আর কিছুদিন থাকিয়া তবে যাইও।" বেণী দাদা ভয় দেখাইলেন, "যাইবে কিরূপে? আমি নৌকার বন্দোবস্ত না করিয়া দিলে তো যাইতে পারিবে না।" তুমি কিছু না বলিয়া কন্যা সুসারকে ডাকিয়া বলিলে, "কাপড় গুছাও।" জিজ্ঞাসা করাতে বলিলে, "নৌকা কোথায় পাওয়া যায় তাহা তো আমি জানি; আমি নিজেই করিয়া লইব।" তোমার মাতা তোমাকে চিনিতেন। তিনি বলিলেন, "বেণী, আপত্তি করিও না, নৌকা আনিয়া দাও।" তখন নৌকা আসিল। তুমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলে; বাসা লইলে। কয়েকদিন পরে আমিও সেখানে আসিয়া জুটিলাম।

তুমি দেশ হইতে ভাল নারিকেল আনিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দিয়াছিলে, তাহা পাইয়া তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। যাহাতে উৎসবের সব অনুষ্ঠানগুলিতে তুমি উপস্থিত থাকিতে পার, তাহার জন্য তুমি অনেক যত্ন করিতে। স্বীয় শৃঙ্খলাগুণে তুমি সন্তানাদির আহার সমাপন করিয়া প্রতিদিন সকালে ৮টার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে দৈনিক উপাসনাস্থানে চলিয়া যাইতে। অনেকদিন তোমাকে চেষ্টা করিয়া প্রবেশ দ্বার খোলাইয়া লইতে হইত; অনেক দিন ভাল স্থান পাইতে না, তবু তোমার উপাসনার অনুরাগ কমে নাই। তোমার অনুরাগ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইতেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "নূতন যে মেয়েটী আসিয়াছে, তাহার কাছে তোমরা উপাসনায় অনুরাগ শিক্ষা কর।" তুমি উপাসনার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত

থাকিতে। কেহ কেহ উপাসনা প্রায় শেষ হইবার সময় (নাম পাঠের সময়) আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ইহা দেখিয়া তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিয়া আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। উৎসবের পূর্ব্বে নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছিলে। নাটক অভিনয় দেখা তোমার এই প্রথম এবং এই শেষ।

ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব শান্তিকুটীরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে হইয়াছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র উপাসনা করিলেন। এমন সমবেত নারীমণ্ডলী তো আর জীবনে দেখ নাই। যাহা কল্পনা স্বপ্ন ছিল তাই স্বচক্ষে দেখিলে। সকলে যখন প্রার্থনা করিলেন, তুমিও প্রার্থনা করিলে, কিন্তু তাহাতে তোমার মনের আশ মিটিল না। তুমি আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলে না। তুমি আর একবার প্রার্থনা করিলে। মনে প্রার্থনার বেগ আসিলে প্রার্থনা করিতে দেশকাল তোমায় কোন বাধা দিতে পারিত না। এক উপাসনায় একজনের দুইবার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অনেকে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উৎসবান্তে বিদায়ের সময় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে। প্রণাম করিয়া তুমি বলিলে, "ভুলিবেন না!" আচার্য্য বলিলেন, "আর কি ভোলা যায়?" নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে ভোলেন নাই; কেন না তাঁহার ভাবে, তাঁহার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কাজ করিয়াছিলে। তাঁহার মত তোমারও কাজ করিতে করিতেই মহাপ্রয়াণ হইয়াছিল।

* *
*

আত্মিক মিলন ব্রতের ছয় মাস উৎসবের মধ্যেই শেষ হইল। এই দিনের জন্য তুমিও প্রতীক্ষা করিতেছিলে, আমিও প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। দেবপ্রেরণায় এই দিন সকালের উপাসনার পরে আমরা দুজনে সঙ্কল্প করিলাম, এই ব্রতই আজীবন পালন করিব। অনন্ত আত্মিক মিলনের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলাম। উৎসবের প্রবাহে

থাকিয়া তখন আমরা এই ব্রত গ্রহণের জন্য কিছুই ক্লেশ অনুভব করিলাম না।

* *
*

দেবি ! উৎসবের পরে এবার যখন বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিলাম, তখন কত বড় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে ! অনন্তকালের জন্য আত্মিক মিলন ব্রত লইয়াছি ; যেন নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছি ! উৎসবের প্রবাহ তো প্রতিদিন থাকে না, কিন্তু জীবনের সংগ্রামভার প্রতিদিনই বহন করিতে হয়। এবারকার দৈনিক জীবন কত নূতন বোধ হইতে লাগিল !

মধ্যে মধ্যে তুমি ম্লান হইতে। মলিন মুখ দেখিলেই আমার মনে হইত, বোধ হয় তোমার মনের উপর অধিক চাপ দেওয়া হইতেছে। বন্ধুরাও সেই কথা বলিতে লাগিলেন। সুতরাং তোমার জন্য আধ্যাত্মিক আহার সংগ্রহ করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যেখানে যাহা ভাল পাইতাম, একান্ত হৃদয়ে তোমাকে উপহার দিতে লাগিলাম। মনের ক্ষোভ ক্রমশঃ দূর হইতে লাগিল। ভক্তচরিত পাঠ, সাধুসঙ্গ সম্ভোগ সকাল সন্ধ্যায় নাম গান করা, খুব ভোরে উঠিয়া আলোচনা করা, এ সকলই আরম্ভ হইল। আর শেষ জীবন পর্য্যন্ত ইহাতেই তোমাকে সন্তুষ্ট রাখিত।

নিশা অবসানে তুমি মনের ভার ও দুঃখ সকলই আমাকে বলিতে। কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, আমার সাধ্যমত তাহা বলিয়া দিতাম। যখন বুঝিতে পারিতাম না, দুজনে মিলিয়া প্রার্থনা করিতাম। উভয়েই সমান দুর্ব্বল ; উভয়েরই জন্য সংগ্রাম সমান কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু পরস্পরের সাহায্যে ধীরে ধীরে শরীরের অধিকার অতিক্রম করিতে লাগিলাম।

এইরূপে তুমি সমুদয় শারীরিক অভাব ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিলে, এবং সেবার ধর্ম্মে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে লাগিলে।

সন্তানদিগকে ভালবাসিতে, কিন্তু আমার মনে হয়, আমার প্রতি ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। তুমিও জানিতে, আমার শরীরের অভাব হইলে কেবল স্বর্গীয় খাদ্যে তোমার সে অভাব দূর হইতে পারিবে। কতবার সংসার পথে চলিয়া মন ক্লান্ত হইলে তুমি বলিয়াছ, "চল, একবার গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া আসি।" অল্পেতেই তুমি সফলযত্ন হইতে। প্রসন্ন চিত্তে আবার দৈনিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইতে। যখন আমার শারীরিক ভাব অধিক জাগরিত হইয়া উঠিত, নিজগুণে তুমি মহাব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে; এবং মায়ের মত আমাকে রক্ষা করিতে।

এ সময়ে আমাদের মনের আগুন কিরূপে জ্বলিত, কে নির্ব্বাণ করিত, কোথা হইতে শান্তিসলিলে অভিষিক্ত হইতাম, ও নূতন উৎসাহের সহিত আবার দুজনাই চলিতাম, তাহা কেহই জানিতে পারিত না। না জানিবার কারণও ছিল। কাহাকেও এ ব্রতের কথা জানাই নাই। যদি ব্রত ভঙ্গ হয়, সমুদয় নষ্ট হইবে, হাস্যাস্পদ হইব, এ ভয় ছিল। তখনকার চোখের জলের কথা কেবল তুমি আমি জানিতাম, আর ভগবান জানিতেন।

এই এক সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে তোমার আত্মার শক্তি যেন নানা দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে তুমি কখনও নিজে উপাসনার কাজ কর নাই। এখন হইতে অনেক সময় তুমিই উপাসনা করিতে, আমি যোগ দিতাম। প্রাণে সংগ্রাম ছিল, আকুলতা ছিল, তাই তোমার সজীব উপাসনা দুজনকেই অতি সরস রাখিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঁকিপুরে আসিয়া আমাদের চেষ্টা হইল, যে কিসে আমাদের জীবন ঘরের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এখন তোমার আত্মা এত জাগিয়া উঠিল, যে তাহার সকল আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি কিসে হইবে সেজন্য আমাকেও ব্যস্ত হইতে হইল। পরসেবার জন্য তুমি অধিক ব্যাকুল হইতে লাগিলে। দেখিলাম, যতই অন্যকে ভালবাসিতে পারা যায়,

শুদ্ধতার পথও ততই সহজ হয়। তুমিও তাহা বুঝিলে। তাই ক্রমে অন্যের বাটীতে গিয়া পারিবারিক উপাসনায় সাহায্য করিতে লাগিলে। এই সময় হইতে রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে। প্রতিদিন রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া ভাই পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপাসনা করিতে যাইতে।

এইরূপে জীবনের সংগ্রাম চলিল, সেবাও চলিল। ব্রহ্মকৃপায় আমরা দুজনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কে আগে কে পশ্চাতে তাহা সব সময় স্থির করিতে পারিতাম না। এই সময়ে ব্রহ্মকৃপাতেই আর একটী নূতন পরীক্ষা আসিল, এবং প্রমাণ করিয়া দিয়া গেল যে তুমি বিশ্বাসে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৮৮৩ সালের আগষ্ট মাসে তোমার দ্বিতীয়া কন্যা সরোজিনীর জ্বর হয়। তাহার বয়ঃক্রম তখন এগার বৎসর মাত্র। ভাই পরেশনাথ চিকিৎসা করিতেছিলেন। প্রথম প্রথম রোগের উপশম না হইয়া বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। একদিন খুব বাড়িল, অবস্থা খারাপ হইল। প্রাতঃকালে ভাই পরেশ বলিলেন, "বিপদের আশঙ্কা আছে, আজ আফিসে যাইবেন না।" আমি আফিসে গেলাম না, বাড়ীতেই রহিলাম। বিকালবেলা অবস্থা আরও খারাপ হইল। ইউরীমিয়া হইয়া উদর স্ফীত হইল। আরও দুইজন ডাক্তার আসিলেন। ঔষধ প্রয়োগে স্ফীত উদর কমিয়া গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নাড়ীও বসিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় হইতে ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। রাত্রি ১১টার সময় আর জীবনের আশা রহিল না। সরোজিনীর কোন শেষ ইচ্ছা আছে কিনা, আমার মাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সরোজিনীর জন্য নূতন সোণার হার গড়ান হইয়াছিল, সরোজিনী তাহাই চাহিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পরে হার ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "রাখিয়া দাও, ছোট ভাইরা পরিবে।" এই কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। তুমি কোথায় ছিলে, আমার সেই চক্ষের জল দেখিবামাত্র আসিয়া আমাকে সঙ্কেত করিলে; প্রাঙ্গণে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলে,

"তুমি গৃহকর্ত্তা, তুমি যদি এ সময়ে একটু দুর্ব্বলতা দেখাও, সকলে হাল ছাড়িয়া দিবে, কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য আর করা হইবে না।" তারপর আমাকে ডাকিয়া উপাসনার ঘরে লইয়া গেলে। তাই দেখিয়া ভাই পরেশও সেখানে গিয়া বসিলেন। আমরা সকলেই ছোট ছোট প্রার্থনা করিলাম। আমার মন খুব ভাল হইল। আবার কন্যার পার্শ্বে গিয়া সেবা করিতে লাগিলাম। দেবি, এই দিনের তোমার ঐ ইঙ্গিতের কথা আমার চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সেদিন আমরা কতবার উপাসনাগৃহে গিয়াছিলাম, কতবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা গণনা করিয়া রাখিলে ভাল হইত।

লোকে চিকিৎসক পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছিল। তুমি স্থিরভাবে সকলের কথাই শুনিয়া যাইতেছিলে, কিন্তু চঞ্চল হইতেছিলে না। অবশেষে কয়েকদিন পরে সরোজিনী আরোগ্য লাভ করিলেন। তোমার বিশ্বাসের জয় হইল। তোমার বিশ্বাস দেখিয়া আমাদের সকলেরই বিশ্বাস বাড়িল।

ইহার কয়েক দিন পরে ভাই পরেশের দ্বিতীয় সন্তান কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন। যে গৃহে তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন সেখানে থাকিলে বাঁচিবার সম্ভাবনা কম, তাই তুমি তাঁহাকে নিজ বাটীতে বাহিরের ঘরে আনিলে ও সেবা করিতে লাগিলে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বড় কন্যাটীরও কলেরা হইল। তখন তুমি বড় কন্যাটীকে বাটীর ভিতরে লইয়া গেলে ; নিজের শিশু সন্তানটীকে অন্য বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলে। সমুদয় সেবার ভার আপনার স্কন্ধে লইলে। অনেক পরিশ্রম ও যত্নের পরে দুটি সন্তানই ভাল হইয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম, তুমি কিরূপ স্থিরভাবে এরূপ বিপদের সময় সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পার। এই সকল কার্য্য করিবার সময় আমাকে কিছু বলিয়া দিতে হইত না। তুমি নিজেই সমুদয় মীমাংসা করিতে ও যাহা যাহা প্রয়োজন, করিয়া যাইতে। ভাই পরেশ এবং ভগিনী মহালক্ষ্মী এই সূত্রে চিরদিনের জন্য আমাদের আপনার হইয়া গেলেন।

এইরূপে তুমি সকলকে আপনার করিয়া লইয়া চলিলে। তোমার দ্রুতগতি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। এইতো সবে তপস্যার আরম্ভ হইল। এই ব্রতপালন, এই পরসেবার কাজ, ক্রমশঃ জীবনকে অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সংগ্রাম ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই আবার পরসেবার জন্য নিত্য নব নব আহ্বান আসিতে লাগিল; বিশ্বাসের পরীক্ষাও কঠিন হইতে কঠিন হইতে লাগিল। ক্রমে তোমার সকল সুখ ছাড়িতে হইল, বেশ ভূষা চলিয়া গেল, মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত উৎসর্গীকৃত হইল; অর্থ, গৃহ কিছুই আপনার রহিল না। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ দৈনিক জীবন, ও কন্যা সুসারের বিবাহ

১৮৮৪ সালটা যেন আমাদের জন্য কত বিশেষ ব্যাপার লইয়া আসিতেছিল। এই বৎসর ৮ই জানুয়ারী আচার্য কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। তুমি শ্রাদ্ধের সময় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলে, এবং সেখানকার শোক মিশ্রিত ভক্তির অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলে।

কিছুকাল পরে ভাগলপুর সমাজের উৎসব উপস্থিত হইল। তখন আমার যাওয়া সম্ভব ছিল না। তুমিই আমার প্রতিনিধি হইয়া তথায় গমন করিলে। বিধানচন্দ্র তখন দেড় বৎসরের। তাহাকে লইয়া গেলে। সে সময় তুমি কিরূপ ব্যাকুল হইয়া আধ্যাত্মিক আহার অন্বেষণ করিতে, ও আমার সহিত কিরূপ যোগ অনুভব করিতে, নিম্নের পত্রাংশগুলিতে তাহা দেখিতে পাই। "(২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪)··· আজকার উপাসনার সার,—ধ্যানে ঈশ্বরকে ভাল ক'রে দেখা যায়; আর নির্জন সাধন। তোমরা কেমন? তোমার উপাসনা কেমন হয় জানিতে বাসনা করি। তোমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। মন ভাল।" "(২১শে)······তোমার কার্ড পাইলাম। উপাসনা ভাল।······ আজকার উপাসনার সার,—শিশু হইয়া মার নিকটে যাওয়া। তোমার

উপাসনা ভাল শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার বেশ উপকার হইতেছে। এপাড়ার সব ভাব দেখিয়া বড় ভাল মনে হয়। আমাদের বাঁকিপুরেও তাই হবে।" বাস্তবিক, এ উৎসবে গিয়া তোমার অনেক উপকার হইয়াছিল। কলিকাতার বা বড় বড় স্থানের বড় বড় উৎসবের উপকার একরূপ; আবার ছোট ছোট মণ্ডলী মিলিয়া যে উৎসব করেন, ও যাহাতে সেই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর প্রত্যেকে অনুভব করেন যে এই উৎসবে আমারও কিছু দিবার আছে, সে উৎসবের উপকার অন্যরূপ। তুমি এ উৎসবে গিয়া বিশেষ ভাবে নিজের জন্য কিছু পাইয়াছিলে। তাই এ আকাঙ্ক্ষা মনে আসিল, যে ভাগলপুরের পাড়ার মতন বাঁকিপুরেও সুন্দর পাড়া রচনা করিবে। উৎসবের প্রধান দিনে লিখিতেছ,—"(২৪শে) পত্নী-প্রাণ! তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, ভাবিয়া পাই না। কেন না, মা তোমা দ্বারা আমাকে যে কত সুখী করিলেন তাহা বলিতে পারি না। একদিকে তোমার শরীরের রক্ত জল করিয়া অর্থ উপার্জ্জন, আর একদিকে আমার আজকার সুখ! তোমাকে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া আমার যেমন কষ্ট হয়, আজ উৎসবে আমার তার সমান সুখ হইল। সমস্ত উপাসনার সময় তোমাকে পাশে অনুভব করিতেছিলাম। তোমার সঙ্গে যোগ বাড়িতেছে বড় সুখের কথা। আজ বিশ্বাস হইতেছে যে তোমারও উপাসনা ভাল হইয়াছে।"

এইরূপে নানা বিধির মধ্য দিয়া দেবতা তোমাকে গড়িতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুসারবাসিনীর বিবাহ অনুষ্ঠান উপস্থিত হইল। এ ব্যাপারে তোমাকে ও আমাকে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে ব্রহ্মবাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

সুসারবাসিনীকে বিদ্যাভ্যাসের জন্য কিছুকাল কলিকাতায় রাখিয়াছিলে। বেথুন কলেজে দিতে পারিলে হয় তো সুসারের ভাল বিদ্যাশিক্ষা হইত। কিন্তু সেখানকার ব্যয় অনেক, আর বন্ধুরাও কেহ পরামর্শ দিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে বাঁকিপুর ফিরাইয়া আনিতে

হইল। এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের তখনকার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল ; ভাল পড়া হইত না। তাই কন্যাকে বাটীতেই শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র সূর তাঁহার শিক্ষকের কাজ করিতেন। ইনি সচ্চরিত্র, অতিশয় নম্রপ্রকৃতি, আমারই হাতের গড়া ছেলে। আমার চক্ষের উপর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীর প্রাতঃকালের উপাসনায় প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন ; সপ্তাহে সপ্তাহে যে "চরিত্র গঠনী" সভা হইত, ইনি তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন। ইঁহাকে তুমিও খুব ভাল করিয়া চিনিতে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণের বড় বারান্দায় বসিয়া সকলের সম্মুখে বৃন্দাবনচন্দ্র পড়াইতেন, সুসারও শান্তভাবে পাঠ শিক্ষা করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে যে সদ্ভাব থাকিবার সম্ভাবনা, উঁহাদের উভয়ের মধ্যে তাহা জন্মিয়াছিল।

এইরূপে সুসার বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে তিনি যৌবন প্রাপ্তা হইলে তাঁহার বিবাহের বিষয়ে মনে চিন্তা আসিতে লাগিল। কিন্তু পাত্রের জন্য অন্বেষণ করিতে হইল না। সুসারকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি তোমার কাছে বৃন্দাবনচন্দ্রের নাম লিখিয়া দিলেন।

কন্যার মনের ভাব অবগত হইয়া বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া আমরাও এ বিবাহ অনুমোদন করিলাম। কন্যা আপনা হইতে বর মনোনীত করিলেন, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি আর কি হইতে পারে ?

কিন্তু ইহাতে আত্মীয়গণের, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজস্থ পরিবারবর্গের খড়গহস্ত হইবার কথা। তুমি কুলীন কায়স্থ পরিবারের কন্যা, প্রতাপাদিত্যের বংশীয় স্বামীর গৃহিণী। প্রস্তাবিত বর মৌলিক সদ্গোপ বংশজাত। কিরূপে এমন বরে কন্যা পাত্রস্থ করিবে ? এমন নয় যে বর ধনী বা বিলাত-ফেরত। কিন্তু তুমি ধন, জ্ঞান, বংশ কিছুই দেখিলে না। কন্যার মত বুঝিয়া ও বিধাতার ইচ্ছা বুঝিয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলে, তাই সকলের নিন্দা ও প্রতিকূলতা বুক পাতিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইলে। এরূপ স্থলে নারীদের মধ্যেই অধিক

আন্দোলন ও তোলপাড় হয়; সে সকল তোমাকেই অধিক স্পর্শ করিবার কথা। তুমি সে সকল সহিবার জন্য প্রস্তুত হইলে। প্রথম ব্রাহ্মসমাজে আসিবার কালে দেশে থাকিতে তুমি আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সকল সামাজিক বিরোধ সহ্য করিয়াছিলে। এখন ব্রাহ্মসমাজের জীবনের প্রথম গুরুতর অনুষ্ঠান উপস্থিত হইল। এবারও তেমনি প্রতিকূলতা, এবারও তুমি তেমনিই দাঁড়াইলে।

ভবিষ্যৎ ফল দেখিয়া ব্রাহ্মবন্ধুরাও অনেকে বলেন যে এ বিবাহে বিধাতার ইচ্ছা ঠিক বুঝা হয় নাই; এবং তুমি ও আমি উভয়েই বুঝিতে ভুল করিয়াছিলাম। দেবি, তুমিও আমাকে চেন, আমিও তোমাকে চিনি; এ বিষয়ে তুমিও ঈশ্বরের ইচ্ছা না বুঝিয়া এক পদ অগ্রসর হও নাই, আমিও হই নাই। ফলাফল তাঁহারই হাতে ছিল, এখনও বলি, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

২৭শে মে ১৮৮৪ সালে সুসারের বিবাহ হয়। এই বিবাহের পূর্ব্বে যখন সব আয়োজন হইতেছিল, তখন দেখিতাম, সমস্ত দিন তুমি দাসীর মত পরিশ্রম করিতে; আবার রাত্রে কিংবা প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে উপাসনার স্থানে আসিতে। মেরী-প্রকৃতি ও মার্থা-প্রকৃতি যেন তোমাতে মিশ্রিত হইয়াছিল। বিবাহের লুচি তুমি নিজে ভাজিতেছিলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় শরীরের শ্রান্তিবশতঃ তোমার নিদ্রা আকর্ষণ হইল। তুমি একজন মহিলাকে বলিলে, "দিদি, ৫ মিনিট নিদ্রা যাই।" এই বলিয়া অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া উনুনের পার্শ্বেই শয়ন করিলে। অল্পক্ষণ পরেই জাগরিত হইলে, এবং বলিলে, "আঃ বাঁচিলাম।" আবার পূর্ব্বের মত কাজ করিতে লাগিলে।

বিবাহের পর স্ত্রী-আচারের দিনে তুমি কি করিলে? অন্য কোনও বস্ত্র কিংবা দানসামগ্রী না দিয়া তুমি বর কন্যাকে গেরুয়া ও একতন্ত্রী দিয়া সাজাইলে। কারণ, গেরুয়াই তোমার চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য বস্ত্র, ও একতন্ত্রী তোমার বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। তাহার

পর আশীর্ব্বাদ করিবার সময় পুরস্ত্রীরা একত্রিত হইলে সকলের সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া তুমি বর, কন্যার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলে। বৈরাগ্য এবং প্রার্থনা ভিন্ন তোমার কোনও কাজ হইত না, এ বিবাহও হইল না। এরূপ প্রার্থনায় কাহারও কাহারও আপত্তি হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে তখন প্রার্থনা করিবার সময় নহে। কিন্তু যখন কর্ত্তব্য মনে হইত, তুমি কাহারও কথায় হটিয়া যাইতে না।

এতদিন পর্য্যন্ত বাঁকিপুরে আমরা একঘরে হই নাই। সামাজিক অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে আমাদেরও নিমন্ত্রণ হইত। এখন হইতে তাহা উঠিয়া গেল। শেষ নিমন্ত্রণের দিনটা এখনও মনে আছে। একজন বন্ধু আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। ভালবাসার খাতিরে আমাকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু আহারের সময় স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে আমার আসন পড়িল। তাই দেখিয়া স্বর্গগত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সেখানেই প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। একজন ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান করা হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। আমি অনেক মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিলাম।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকিপুরে বাহিরের লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে সহানুভূতি ছিল তাহা চলিয়া যাইতে লাগিল। এখানে একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজে চাঁদা দিতেন। তিনি চাঁদা প্রদান ও সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন, ও বলিলেন, "ইচ্ছা করে, প্রকাশ বাবুকে horse-whip করি।" আমাদের আফিসের বাবুরা বলিতে লাগিলেন, "এ ব্যক্তি ভয়ানক মূর্খ! অকরণীয় হইলেও ঘরে কন্যার বিবাহ কেন দিল? যদি রাজার ঘর হইত, তাহা না হয় বুঝিতাম!"

বাহিরে তো এই প্রকার, এ দিকে মাতাঠাকুরাণী ক্রুদ্ধ হইয়া কনিষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। দেশেও মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইল। তাই প্রবোধচন্দ্র মাতার কথায়

চলিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের সময় আবার উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইল। ক্রমশঃ আন্দোলন নিরস্ত হইল। আমরা আবার দৈনিক ব্রত ও সাধনগুলি লইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে নয়াটোলাতে আমাদের নিজের বাটী হইল। ১৫ই নবেম্বর তুমি গৃহ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান করিলে। দোতালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটীকে ঠাকুর ঘর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলে। যতদিন পৃথক দেবালয় প্রস্তুত না হইল, ততদিন ঐ উপরের ঘরেই উপাসনা হইত। শয়নের কষ্ট হইত, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য করিতে না। এখানে আসার পর হইতে পল্লীস্থ সমুদয় ব্রাহ্ম পরিবারগুলির বিশেষ ভার তোমার উপর পড়িল। সকলের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অভাবের খোঁজ লইতে। প্রচার আশ্রমের সংবাদও তুমি লইতে। তাঁহারা বলিতেন না, সুতরাং নিজেই তাঁহাদের ভাণ্ডারে গিয়া দেখিতে, কিসের অভাব আছে। যাহা জানিতে পারিতে, আমার কাছে বলিতে, ও আপনার ভাণ্ডার হইতে অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেরণ করিতে। প্রয়োজন মত প্রতিবেশীদিগকেও আপনার ভাণ্ডার হইতে বস্তু যোগাইতে। তাঁহারা প্রত্যর্পণ করিলেও আনন্দে গ্রহণ করিতে, কিন্তু নিজে চাহিতে না, অথবা নিজের অভাব হইলে কাহাকেও জানিতে দিতে না।

দেবি, এই সময়ে আমাদের দৈনিক জীবন কিরূপ তপস্যাময় ছিল, তাহা কি তুমি স্মরণ কর না? প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে তুমি আমার সহিত সমস্বরে মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতে। তারপর তুমি স্বহস্তে উপাসনার ঘর প্রস্তুত করিতে। এ কাজ অন্যের উপর ফেলিয়া রাখিতে না। নিষ্ঠার সহিত আসন পাতিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে। উপাসনার পর প্রতিদিন একটী ছোট প্রার্থনা করিতে। তার পরেই রন্ধনশালার কাজে যাইতে। ছেলেদের আহার করাইতে ও পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। নিজেকেই রন্ধন করিতে হইত;

পাচক ব্রাহ্মণের জন্য সকল সময় অর্থে কুলাইয়া উঠিতে পারিতে না। ইহারই মধ্যে কোনও সময়ে প্রতিবেশী দুই তিনটি গৃহস্থের সংবাদ লইতে এবং সাধ্যমতে তাহাদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে। বৈকালে কিছু পাঠ করিতে, ও কোথাও যাইবার হইলে যাইতে। সন্তানদের আহার পরিচ্ছদ তুমি সর্ব্বদা নিজেই দেখিতে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাত্রির আহারের আয়োজন হইত এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছোটদের আহার করাইয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। তারপর আমরা দুজনে নাম গান করিতাম। নূতন যে কোন সাধন করিবার থাকিত, করিতাম। আহারাদির পর আবার প্রসঙ্গ হইত। ইহা ভিন্ন স্নানের বিশেষ নিয়ম ছিল। ১৮৮৫ সালের ২০শে এপ্রিলের দৈনিকে তাহা লেখা আছে। "কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সমাহিত চিত্তে স্নানাহার করিতে শিখিতেছিলাম। অদ্য স্নান-গৃহে নূতন প্রবেশ। প্রাতঃকাল হইতে প্রস্তুত হইয়া বেলা ১২টার সময় সস্ত্রীক স্নান-গৃহে প্রবেশ করিলাম; ঈশার অভিষেকের বিষয় পাঠ করিলাম। নবসংহিতার স্নানপদ্ধতি পাঠ করিলাম। জলের ধারে পুষ্প ও নূতন বস্ত্র ছিল। বিধানাঙ্কিত পাত্রের সাহায্যে আপনি ও স্ত্রী স্নান করিলাম। প্রার্থনার পর নব বস্ত্র পরিধান করিলাম। তাহার পর স্বপাকে আহার করিবার জন্য গৃহান্তরে গমন করিলাম। পাক-গৃহে গিয়া দেখি, গৃহিণী আমার মনের মত সামগ্রীগুলি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন। স্বপাক এত মিষ্ট কখনই লাগে নাই। স্নান করিবার পূর্ব্ব হইতে আহার করার শেষ পর্য্যন্ত এক উপাসনার নানা অঙ্গ সম্ভোগ করিলাম। আহারান্তে তাহার শান্তি-বাচন পাঠ করিলাম।" প্রত্যহ কিছু একত্রে স্নান ও একত্রে পাককার্য্য ও আহার হইত না। কিন্তু আমরা দুই জনে কিরূপে মিলিত ধর্ম্মসাধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম এই দৈনিকে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

এইরূপে চলিতে লাগিলাম। শরীরের সঙ্গে সংগ্রামও চলিতে লাগিল। এক দিনকার দৈনিকে লেখা আছে, "আড়াই বৎসরের পর



কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রকাশচন্দ্র

[শান্তিনিকেতন—১৯১০

শরীরের পশুত্ব দেখিয়া মনে হয়, বুঝি পশুত্ব কখনই যাইবে না। তাই ভাগবতী তনুর জন্য প্রার্থনা করিলাম। এক দিন তোমাতে ও আমাতে এই প্রসঙ্গ হইতেছিল,যে পরলোকে ভালবাসা কি আকারে থাকিবে ? আমি বলিলাম, আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি তাহাই পরলোকের ভালবাসা স্থায়ী করিবার উপায়। শরীরের সম্বন্ধ ত্যাগ না করিলে ভালবাসা স্থায়ী কি না তাহা কিরূপে বুঝিবে? এখন আমাদের সম্মুখের অবস্থায় চক্ষের ভালবাসা থাকিবে। তারপর দৃষ্টি যখন থাকিবে না তখন কেবল আত্মার ভালবাসা থাকিবে।

কন্যা সুসারের বিবাহের পর আত্মীয়গণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন আবার তাঁহারা অনুকূল হইতে লাগিলেন। বড়দাদা মহাশয় চিকিৎসা করিবার অভিপ্রায়ে বাঁকিপুরে আসিলেন। মাতাঠাকুরাণীও ফিরিয়া আসিলেন, চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ভাই পরেশ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন ; তুমি সেবায় নিযুক্ত রহিলে।

এই সময়ে একদিন আমি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া সংসারের মাসিক আয় ব্যয়ের এষ্টিমেট প্রস্তুত করিতেছিলাম। আমার শ্রম দেখিয়া তুমি বলিলে, "আমাকে এ কাজ দিয়া কি বিশ্বাস করিতে পার না ?" আমি বলিলাম, "পারি, কিন্তু পাছে গোলমাল হয় তাই তোমাকে এতদিন দিই নাই।" অতঃপর সমুদয় অর্থব্যয়ের ভার তোমারই হইল। প্রথমে তুমিও লইতে ভীত হইয়াছিলে। আমি আশ্বাস দিলাম। তুমি সেই যে অর্থব্যয়ের ভার লইলে শেষ পীড়া পর্য্যন্ত অম্লান বদনে সে ভার বহন করিয়াছিলে। একদিনের তরেও আমাকে ভাবিতে দাও নাই। আয় ব্যয়ের কোন বিশৃঙ্খলাও ঘটে নাই। অনাটন পড়িলে আমাকে কোনও দিন বিরক্ত করিতে না, কিম্বা প্রাণান্তেও বাজার হইতে ধারে দ্রব্যাদি আনিতে না। ইহাতে এই শিখিলাম, নারীকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়া বিশ্বাস করিলে তিনি সে বিশ্বাসের উপযুক্ত হইতে পারেন। সংসারের কঠিন দুর্ভাবনা হইতে আমাকে মুক্তি দিবার জন্য তুমি এই ভার আপনি লইলে।

যখনই আমাকে রাজকীয় কার্য্যভারে অধিক প্রপীড়িত দেখিতে, প্রায়ই বলিতে, কবে আমার সেই ক্ষমতা হইবে, যে এ সকল বিষয়েও তোমাকে আমি সাহায্য করিতে পারিব।

২৯শে জুলাই সংবাদ আসিল আমি ডিপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছে, এবং মতিহারী জেলায় আমার প্রথম কর্ম্মস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সংবাদ তখন অভাবনীয় মনে হইয়াছিল। তুমিও জানিতে না, আমিও জানিতাম না, যে আমাদের আবার মতিহারী যাইতে হইবে। বড়দাদা মহাশয় শুনিয়া সুখী হইলেন, এবং যাইতে অনুমতি দিলেন।

৪ঠা আগষ্ট প্রচারাশ্রমে আমাদের বিদায় দিবার উপাসনা হইল। সন্ধ্যার সময় নয়াটোলার বাটীতে শেষ উপাসনা করা গেল। শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় অযাচিতরূপে আসিয়া উপাসনায় যোগ দিলেন। আমি তোমাকে বলিলাম, "তুমি কয়েক দিন পরে আসিও, আমি আগে গিয়া সেখানকার সব ঠিক করি।" কিন্তু তুমি সঙ্গেই যাইতে চাহিলে। ৫ই আগষ্ট আমরা বাঁকিপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ মতিহারীতে দ্বিতীয় বার ও বিশ্বাসের পরীক্ষা

মতিহারীতে আসিয়াই এক পরীক্ষা দিতে হইল। নূতন বাসা করিতে হইল। বাঁকিপুরে ও দেশে টাকা পাঠাইতে হইল। মাসের শেষে টাকা কম হইয়া আসিল। কিন্তু বাজারে ঋণ করা অনুচিত। সুতরাং আহারের বরাদ্দ কমাইয়া আনিতে হইল। এ হিসাবে চলিয়া আগষ্ট মাস তো শেষ হইতই, সেপ্টেম্বরের ১লা পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যাইত। কিন্তু দৈবাৎ ১লা সেপ্টেম্বর ছুটির দিন পড়িল, তাই সে দিন বেতন পাওয়া গেল না। ২রা সেপ্টেম্বর এক বেলার আহার

কোনওরূপে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় টাকা আসিল, কিন্তু তাহা তো তখনও দেবালয়ে উৎসর্গ করা হয় নাই; তাহা স্পর্শ করা যাইতে পারে না। ৪টী সন্তান, আপনারা দুজন; আহারের সামগ্রীর মধ্যে ⁄২ সের দুধ, ২টী ভুট্টা, ও কয়েকটী পদ্মচাকা। ছোট ছেলে বিধান যখন ক্রন্দন করিতে লাগিল, তখন তাহাকে পদ্মচাকা আহার করিতে দিলে। দেবি, তুমি অনশনে কাটাইলে; স্বামীকে আধখানি ভুট্টা খাইতে দিলে; অন্য ছেলে মেয়েদের একটু একটু দুধ দিয়া কোনওরূপে রাত্রি অতিবাহিত করাইলে। তোমার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সকালে ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া পদ্ম ফুলে ঘর সাজাইয়া উপাসনা করা গেল; তারপর বাজার হইতে দ্রব্যাদি আনা হইল। ঈশ্বরের জয়কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার উপরে যে প্রাণ মন দিয়া নির্ভর করে তাহার সকল দুঃখ দূরে যায়, তিনি তাহাকে সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ করেন।

প্রথমে মতিহারী গিয়া বাসার জন্য কিছু কষ্ট হইতেছিল। তোমার নিজের যে বাড়ী সেখানে ছিল তাহাতে—বাবু বাস করিতেছিলেন। তিনি সে বাটী আর ত্যাগ করিতে চাহিলেন না; সামান্য দাম দিতে চাহিলেন। আমি এভাবে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। তুমি বলিলে, যাহা দেন, তাহাই লও। তোমারি জয় হইল। বাটী বিক্রয় করা হইল; শ্রদ্ধেয় প্রচারক অমৃতলাল বসু মহাশয় সপরিবারে এই সময় মতিহারী আইসেন এবং দীর্ঘকাল সেখানে বাস করেন। তোমার সেবায় তাঁহারা দুজনেই মোহিত হইয়া যান। একদিন একখানা প্লেট এক জনার হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। প্লেটখানি অতি সুন্দর ছিল; তোমার বস্তু গেল, কিন্তু তুমি টুঁ হাঁ কোন শব্দই করিলে না। যাঁহারা দেখিলেন, অবাক হইয়া গেলেন।

বাঁকিপুরে থাকিতেই তোমার পরসেবার জীবন আরম্ভ হইয়াছিল। এখন মতিহারীতে তাহা আরও বিকশিত হইতে লাগিল। অপরের

দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, অপরের দুঃখ দূর করিতে, তোমার মন ব্যস্ত হইতে লাগিল। ১৮৮৬ সালে হরিগুরু রুদ্র নামক একটি যুবক স্ত্রীবিয়োগে অতিশয় কাতর ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতেছিলেন। আশ্রয় ও শান্তি পাইবার আশায় তিনি অবশেষে মতিহারী আগমন করেন। তাঁহার চিত্ত অতিশয় বিকল হইয়াছিল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। একদিন হঠাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন; ব্যাগ হাতে করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তুমি সান্ত্বনা দিতে লাগিলে। তোমার সান্ত্বনার মধ্যে এক প্রকার শক্তি ছিল, তিনি তাহা অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তুমি অধিক বাহিরে আসিতে না, কিন্তু এমন একটা ভালবাসার ভাবে ব্যবহার করিতে, যাহা সকলের হয় না। তোমার স্নেহের গুণে হরিগুরু তোমাকে মা বলিতে লাগিলেন, এবং আমাদের পরিবারে ৩।৪ বৎসর বাস করিয়া গেলেন। তিনি এখনও তোমাকে ভোলেন নাই।

এই সময়ে একটি বন্ধু বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার মিঃ—র সহিত তোমার দ্বিতীয় কন্যা সরোজিনীর বিবাহের প্রস্তাব করেন। সরোজিনী তখনও বয়ঃপ্রাপ্তা হন নাই; কিন্তু তিনি বিলম্ব করিতেও প্রস্তুত, এইভাবে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তুমি অপর একটি কন্যার নাম করিয়া বলিলে, "সরোজিনীর জন্য অপেক্ষা কেন?—র সঙ্গে বিবাহ দাও না কেন? উভয়েই আমার কন্যার তুল্য বরং আগে—, তারপর আমার সরোজিনী।" তোমার উত্তর প্রস্তাবকারী বন্ধুকে লিখিলাম। যথা সময়ে মিঃ—র সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। ঐ কন্যা তোমার সহিত সাংসারিক কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিতা ছিলেন না। কিন্তু তথাপি তুমি তাঁহাকে আপনার কন্যা অপেক্ষা অধিক মনে করিলে। নতুবা এমন বিলাত ফেরত পাত্রটিকে হাতে পাইয়া কি এমন নিঃসঙ্কোচে কেহ ছাড়িয়া দিতে পারে? তোমার এই নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিয়া-

ছিলেন, "আমি দেখিয়াছি, অঘোরকামিনী যথার্থই স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। অন্য নারী তাহা পারেন না; আপনার গণ্ডা রাখিয়া তবে অপরকে ভালবাসেন।"

১৮৮৬ সালের মে মাসে বাঁকিপুরে ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব হইতেছিল। আমাদের নয়াটোলার বাটীই উৎসবের যাত্রীনিবাস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মতিহারী হইতে বাঁকিপুর আসিতে তখন ১২ ঘণ্টা লাগিত। উৎসবের নিমন্ত্রণ আসিল, আমরা চলিলাম। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধচন্দ্র তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহাকে লইয়া আসিলে পাঠের ব্যাঘাত হইবে, তাই তাঁহাকে রাখিয়া আসিতে হইল। বামণ ঠাকরুণ খুব বিশ্বাসভাজন ছিলেন তাঁহার উপরে সুবোধচন্দ্রের ভার দিয়া আসিলাম।

বাঁকিপুরের উৎসবে অনেক লোক হইয়াছিল। বেশ ধুমধাম করিয়া উৎসব সম্পন্ন করা গেল। নয়াটোলার বাড়ী ভরা লোক। ভক্ত সঙ্গে ভগবানের নাম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ অনুভব করিতেছিলাম। উৎসবের শেষ দিনে দ্বিপ্রহরের পর সকলে আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মতিহারী হইতে তারে সংবাদ আসিল, সুবোধের কলেরা হইয়াছে। কি করিবে? যদি সে দিনই বিকালের ট্রেণে রওনা হও, তাহা হইলে তার পর দিন প্রাতঃকালে মতিহারী পেঁাছিতে পার; হয় তো সন্তানকে জীবিত দেখিতে পাও। উৎসব শেষ হইতে রাত্রি ৮টা কি ৯টা হইবে, তাহার পর যাত্রা করিলে সে রাত্রি মোকামায় থাকিতে হইবে; পরের দিন সকালে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় মতিহারী পেঁাছিতে পার। অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়াই তুমি মীমাংসা করিলে উৎসব শেষ করিয়াই যাইবে। তোমার বিশ্বাস দেখিয়া আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। সেই মুহূর্ত্তে এই মীমাংসা করিতে যে বিশ্বাসের পরিচয় দিলে, মা জগজ্জননী মায়ার খেলা খেলিয়া সে বিশ্বাসকে যেন আরও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় উৎসবের শেষ অংশ আরম্ভ হইল, ক্রমে উৎসব শেষ হইল। আমরা রাত্রির ট্রেণে রওনা হইলাম। মোকামায় শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের বাটীতে রাত্রিবাস করিলাম। প্রত্যূষে উঠিয়া সকলে মিলিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিলাম। তারপর সেখান হইতে যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মতিহারী ষ্টেসনে পৌঁছিলাম।

ষ্টেসনে আমাদের বাড়ীর বেহারা আসিয়াছিল, আমার জন্য টম্‌টম্‌ ও তোমার জন্য পাল্‌কী আনিয়াছিল। ট্রেণ হইতে নামিয়াই আমি টম্‌টমে বসিলাম, তুমি পাল্‌কীতে আরোহণ করিলে। একজন "কাহার" আমার কাছে আসিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সুবোধ কেমন আছেন; সে বলিল, ভালই আছেন। তুমি দূরে ছিলে, তাহাদের সে উত্তর শুনিতে পাইলে না, তাহারাও তোমার কাছে গিয়া বলিল না।

এদিকে আমার টম্‌টম্‌ আগেই গিয়া বাড়ীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল। সুবোধচন্দ্র দ্বারের নিকটে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়া বাহিরের ঘরে বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া অসুখ করিল, ও ডাক্তারবাবু কি কি ঔষধ দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে জানিলাম, কলেরা হয় নাই, উদরাময় হইয়াছিল। বন্ধু যদুবাবু আশঙ্কিত হইয়া সুবোধচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও ঐরূপ টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন।

আমি যখন সুবোধচন্দ্রের সঙ্গে বহির্ব্বাটীর নীচের ঘরে কথা কহিতেছি, সেই সময় বেহারারা তোমার পালকী একেবারে ভিতর বাটীতে লইয়া গেল। আমার বা সুবোধের সঙ্গে তোমার দেখা হইল না। মা জগজ্জননীর মায়ার খেলা চলিতে লাগিল। আমাদের অনুপস্থিতির সময় বাড়ীতে নূতন চুণকাম করা হইয়াছিল। বাড়ীটীতে প্রবেশ করিয়াই সব যেন তোমার কাছে একটু নূতন নূতন দেখাইতেছিল। তার উপরে বামণ ঠাকরুণের আচরণে তোমার

আশঙ্কা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি একাকিনী স্নেহভাজন সুবোধচন্দ্রকে লইয়া এ কয়েকদিন বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। এখন তোমাকে দেখিয়া এতদিনের রুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল কাঁদিতেই লাগিলেন। তুমি তখন দৌড়িয়া সুবোধচন্দ্রের শয়নগৃহে গেলে, দেখিলে শয্যা শূন্য। তখন তোমার মতন জননী আর কি করিতে পারেন? শয়নকক্ষের পার্শ্বেই উপাসনার ঘর; ছুটিয়া সেখানে গেলে, ও মা জগজ্জননীর চরণে বেদনার অশ্রু ফেলিলে। কিয়ৎক্ষণ পরেই বাহিরে আসিয়া দেখিলে সুবোধচন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন। বলিতে এতক্ষণ লাগিল, কিন্তু এ সমুদয় অল্পক্ষণের মধ্যে ঘটিল; এই সময়টুকুর মধ্যে তোমার মনের উপর দিয়া কি তুমুল ঝড় বহিয়া গেল, ও তোমার বিশ্বাসের আলোক তাহার মধ্যে কেমন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। সুবোধচন্দ্র বলিলেন যে, তিনিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরের ঘরে আসিতেছিলেন, কিন্তু তুমি উপাসনার ঘরের দিকে চলিয়া গেলে বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই। তুমি মা জগজ্জননীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তোমার বিশ্বাসে আমাদেরও বিশ্বাস বাড়িল।

কয়েক মাস হইতে তোমার শরীর অসুস্থ হইতেছিল। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তোমাকে মোকামায় শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলাম। মতিহারাতে আমি ও সুবোধচন্দ্র রহিলাম। আমাকে এভাবে একা রাখিয়া চলিয়া যাইতে তুমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইতেছিলে। কিন্তু চিকিৎসকের আদেশে অগত্যা যাইতে হইল। সেবার আমার উপর অনেক চাপ পড়িতে লাগিল। নূতন কর্ম্ম, অনেক খাটুনি; আবার তুমিও কাছে ছিলে না, তাই সংসারের সব কাজ কর্ম্মও আমাকেই দেখিতে হইত। ডিপার্টমেণ্ট্যাল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে সময় পাইতেছিলাম না। তোমার অসুস্থতা ও ধর্ম্মজীবনের সাধন ভজনগুলির জন্যও এ বিষয়ে কিছু বাধা হইয়াছিল। তাই প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। তুমি

এ সংবাদ শুনিয়া পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলে,—"দুঃখ করিও না; কারণ আমরা তো ফলবাদী নই। তোমার যে এই বয়সে এই কষ্ট, তা তো মা দেখিতেছেন। আমাদের কাজ তাঁর কথা শোনা। আমি বিশ্বাস করি যে সাধ্যমত তাঁর কথা শুনিয়াছি। আবার পড়িতে হইবে। ভাবিতেছি যে আমি নাই, তোমার বড় কষ্ট হইবে। দুঃখ এই যে, আমি তোমার বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারি না। সংসারের ভারও তোমায় বইতে হয়। তাই বা কি করিব? ইহার মধ্যেও মার ইচ্ছা দেখিতে ইচ্ছা করে। যে কয়দিন এখানে থাকিব, তাঁহার কাজ করিলেই খালাস।"

এই সময়ে আমার ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র বাঁকিপুরেই কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে তুমি তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সান্ত্বনার জন্য একাকিনী মোকামা হইতে বাঁকিপুরে চলিয়া গেলে। পুত্র সাধনচন্দ্র ও বিধানচন্দ্রকে মোকামাতেই রাখিয়া গেলে। বাঁকিপুর যাইতে হইবে এ মীমাংসা কিরূপে করিলে? আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নয়। আমার অপেক্ষাও যাঁহার আদেশ অধিক মাননীয় সেই পরমগুরুর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া মীমাংসা করিলে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমাকে পত্রে লিখিয়াছিলে, "বাঁকিপুর যাইব কি না, এখনও ঠিক করি নাই। উপাসনার পর ঠিক হইবে।" আমিও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতাম। এইরূপে তুমি স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে শিখিতেছিলে। বাঁকিপুর যাইবার সময় তোমার সঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, মোকামায় গাড়িতে চড়া, বাঁকিপুরে গাড়ী হইতে নামা, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা, সব তুমিই করিলে, তাঁহাকে কিছুই করিতে হয় নাই।

তুমি বাঁকিপুরে গিয়া প্রবোধচন্দ্রকে ও পত্নীকে সান্ত্বনা দান করিলে, ও তাঁহাদিগকে মতিহারীতে আসিতে অনুরোধ করিলে। বাঁকিপুরে যেখানে যেখানে উপাসনা করিলে ও আহার করিলে বন্ধুগণ

সুখী হন, তুমি তাই করিলে। তুমি এইরূপে একাকিনী স্বামী ও সন্তানগণকে ছাড়িয়া আসাতে সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, যেন আর সকল হইতে ভিন্ন। আমি কি বলিয়াছিলাম, তাহা তোমার হয়তো মনে আছে। আমি লিখিয়াছিলাম, "এমনি ক'রে শিখিতে হইবে। একবারে আসক্তি মহাশত্রুকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এমন হইবে যে আর কাহারও জন্য মন কেমন করিবে না। এবার কিছু সঞ্চয় করিয়া আসিতে হইবে; এবার যে তুমি বাহিরে, আমি ঘরে। তোমার কাছে বসিয়া আমি নানা কথা শুনিব ও শিখিব। শিখাইবার উপযুক্ত হইয়া আসিবে।"

তুমি সুস্থ হইয়া মতিহারী ফিরিয়া আসিবার কিছু পরেই তোমার ও আমার জন্য আর একটী পরীক্ষা উপস্থিত হইল। জামাতা বৃন্দাবনচন্দ্রের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। হিন্দু সমাজের আত্মীয়গণের প্রভাবে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইতেছিল। তাই কন্যা সুসারবাসিনীর সম্বন্ধেও তিনি ক্রমে উদাসীন হইয়া পড়িতেছিলেন। আমরা ইহার লক্ষণগুলি দেখিতেছিলাম, আর আপনাদের জন্য ও কন্যার জন্য পরম জননীর নিরাপদ চরণ আরও ভাল করিয়া ভিক্ষা করিতেছিলাম। ১৮৮৭ সালের এপ্রিল মাসে বৃন্দাবনচন্দ্র পত্র লিখিলেন, যে তিনি সুসারকে পরিত্যাগ করিবেন। তোমার সেদিনকার বিশ্বাস ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব আমার এখনও মনে আছে। কন্যা সরোজিনীর অসুখের সময় যেমন আমাকে উপাসনা গৃহে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলে, সেদিনও বেলা তিনটার সময় তেমনি ডাকিয়া লইয়া গেলে। দুজনে খুব প্রার্থনা করিলাম।

বৃন্দাবনচন্দ্র আর একবার দেখা দিলেন। মনটা একবার একটু ফিরিয়াছিল, কিন্তু সে ভাব স্থায়ী হইল না। যখন তিনি আসিলেন, তখন কয়েকদিন গৃহে একটু আনন্দ-উৎসব হইল। যাহাতে বৃন্দাবনচন্দ্রের মনটা আরও কোমল হয়, শরীর সুস্থ হয় তাই করিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া দার্জ্জিলিং ভ্রমণে চলিলাম। পথে কর্সিয়ঙে

শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শৈলাশ্রমে মিষ্ট উপাসনা সম্ভোগ করিলাম। পাহাড়ে গিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের কি উপকার হইল জানি না, কিন্তু তুমি অনেক উপকার লাভ করিলে। বনের মধ্যে বনদেবীকে লুক্কায়িত দেখিয়া তোমার মন খুলিয়া গেল। যখন বেড়াইতে যাইতে, ছেলেমানুষের মতন পথে পথে কত কি কুড়াইতে! তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে ছিলেন। একদিন তাঁহাকে দেখিতে যাইবার প্রস্তাব হইল। তোমার ইচ্ছা ছিল, সকলের সঙ্গে হাঁটিয়া যাইবে। যখন গৃহ হইতে যাত্রা করা হয়, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। অন্যান্য গুরুজনগণ মীমাংসা করিলেন, নারীর পক্ষে পদব্রজে যাওয়া অবিধেয়। তাই তোমাকে ডাণ্ডিতে যাইতে হইল। তাঁহাদের এই আদেশ পালন করিতে গিয়া তোমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। তুমি ডাণ্ডিতে চড়িয়া কিছুদূর গিয়া পরে হাঁটিয়া চলিলে। মহর্ষির উজ্জ্বল ভাব, তাঁহার উৎসাহ ও আমাদের প্রতিজনের প্রতি সম্ভাষণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলে। আমাকে তোমাদের রাখিয়া কিছু আগেই মতিহারী চলিয়া আসিতে হইল। তোমরা ২২শে জুন ফিরিয়া আসিলে। ইহার পরও কিছুকাল বৃন্দাবনচন্দ্র অনুকূল ছিলেন। তারপর যে তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, আর আসিলেন না।

অক্টোবর মাসে আমি আবার বাঁকিপুর বদ্‌লী হইলাম। ৬ই অক্টোবর আমরা মতিহারী ত্যাগ করিয়া আসিলাম। মতিহারীর শেষ উপাসনাতেও সকলে যোগ দিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : বাঁকিপুরে দ্বিতীয় বার

বাঁকিপুর আসিয়া তুমি ১২ই অক্টোবর ১৮৮৭ হইতে ব্রাহ্মিকা সমাজের কাজ আজ আরম্ভ করিলে। একদিকে যেমন সেবা চলিতে লাগিল, অপর দিকে সাধন ও উপাসনাও পূর্ণ উৎসাহের সহিত

চলিতে লাগিল। তোমার বাটীর উপাসনার ও উপাসনালয়ের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তোমার নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া তোমাকে "মৈত্রেয়ী" নাম দিয়াছিলেন। যখন তোমার বিষয়ে কিছু বলিতে হইত, তোমাকে ঐ নামে উল্লেখ করিতেন। সংসারের কোনও কার্য্যের জন্য কোন দিন তোমার উপাসনা বন্ধ হইত না। কেবলমাত্র আচার্য্যের প্রার্থনা শ্রবণ করা তোমার ধর্ম্ম ছিল না। জীবনের শেষ দশ বৎসর প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে ভুল নাই। সময় বুঝিয়া ছোট ছোট প্রার্থনা করিতে, কিন্তু স্পষ্টস্বরে কহিতে ; কেহ শুনিতে পাইল না, এমন কখনই হইত না। শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু মহাশয় একদিন বলিলেন, "বিধানমণ্ডলী এখনও ভাঙ্গে নাই, ভিন্ন আকার লইয়াছে মাত্র।" কলিকাতায় ঐ সময়ে বিধানমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কেহ কাহারও সহিত মিলিতে পারিতেছিলেন না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহিতেছিলেন। এমন সময়ে বাঁকিপুরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে একটী ঘননিবিষ্ট দল আছে ; পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি অত্যন্ত অধিক ; সহোদর সহোদরার মত ব্যবহার। ইহা দেখিয়া তিনি বাঁকিপুরের মণ্ডলীকে স্বীকার করিলেন।

১৮৮৮ সালের ২৪শে মে আবার বাঁকিপুরের উৎসব উপস্থিত হইল। অনেক লোক আগমন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় উমানাথ গুপ্ত মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। তোমার সঙ্গে এই তাঁহার প্রথম পরিচয়। তোমার উপাসনার গৃহ দেখিয়া, সেই গৃহ কি সুন্দররূপে সাজান, তাহা দেখিয়া, মেয়েদের উপাসনায় যোগদান দেখিয়া, অনেক প্রশংসা করিলেন, কিন্তু তোমার দোষ ত্রুটি দেখাইতেও ছাড়িলেন না। বলিলেন, অনেক জিনিষ পত্র তাহার যত্ন হয় না। তোমার দোষ দেখিলে আমার কি হইত তাহা তো জানই। সেই দিনও অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। প্রকৃত পক্ষেই তৈজস পত্রে তোমার কোন যত্ন ছিল

না। উমানাথ বাবুর কথা তোমাকে বলিলাম, তুমি চেষ্টা করিতে লাগিলে। কিন্তু যেরূপ যত্ন করিলে সংসারের সব বস্তুর পূর্ণ ব্যবহার হয় ও কিছু অপচয় না হয়, সেরূপ যত্ন করিতে পারিতে না। যখন বর্দ্ধমানে একাকী ঘরকন্না করিতে, ধর্ম্মের কোন ধার ধরিতে না, তখন অল্প ব্যয়ে চালাইতে ও সর্ব্বদা সংসারের দ্রব্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে; এখন আর তাহা হইবার নয়। এখন যদি তোমাকে সংসারী করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে হয়তো তোমার মৈত্রেয়ীর ভাবটুকু পলায়ন করিত। সুতরাং তুমি মৈত্রেয়ীই রহিলে।

কেহ কেহ নিজের উপাসনাগৃহ ভিন্ন অন্যত্র উপাসনা করিয়া সুখী হইতে পারে না। তোমার তেমন ছিল না। নিজের বাটীর ছোট উপাসনাগৃহটী যেমন তোমার নিকট মিষ্ট লাগিত, তেমনি খগোলে ভাই ষষ্ঠীদাসের বাটীর উপাসনালয়ে গিয়াও সুখী হইতে। মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিতে। ২১শে জুনের ডায়েরীতে এইরূপ লেখা আছে—"অদ্য প্রাতে খালের ধারে ষষ্ঠী বাবু, তাঁহার স্ত্রী, অঘোর ও আমি, হাত মুখ না ধুইয়া উপাসনা করিলাম। উপাসনা বড় ভাল। প্রার্থনা—উঁহাদের অনুরাগের মত আমাদের অনুরাগ হউক।" সে দিন সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিয়া পত্র পাইলাম যে departmental পরীক্ষায় পাশ হইয়াছি। সংবাদ পাইয়াই উপাসনার ঘরে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সুখী হইলাম। সে যেন এখনও কালকার কথা মনে হইতেছে। পত্র পাঠ সমাপ্ত হইতে না হইতে উপাসনার গৃহে গমন করিলাম; কেমন করিয়া কোথা হইতে তুমিও আমার চিরসঙ্গিনীরূপে আমার পার্শ্বে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে, এবং তদ্গতচিত্তে তুমিও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলে। এই পরিণত বয়সে শক্ত আইন পুস্তকের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। ধর্ম্মপথে থাকিয়া উত্তীর্ণ হওয়া ততোধিক কঠিন। কেবল তোমার মত দিল-দরদী সাহায্যকারী ছিল বলিয়া অমন ফললাভ হইল। উপাসনার ঘরটীও সার্থক হইল। খালি মেঝের

উপর এমন করিয়া হাত পা ছড়াইয়া আর কোনও স্ত্রী পুরুষ ভগবানকে কৃতজ্ঞতা দিয়াছেন কি না জানি না। ধন্য, উপাসনালয়! তোমাতে ভাল মনে বসিয়া আমরা কখনই বঞ্চিত হই নাই।

এই সময়ে অনুভব করিতে লাগিলে, যে ভগবানের জন্য কিছু সুখ ও স্বার্থ ত্যাগ না করিলে তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রগাঢ় হয় না, শুদ্ধতার পথও সহজ হয় না। আমার ৪ঠা আগষ্টের দৈনিকে লেখা আছে, "অদ্য এক নূতন ব্যাপার হইয়া গেল। গৃহিণী কয়েক দিন হইতে কিছু না কিছু দিয়া আসিতেছিলেন; অদ্য মাথার কেশ দান করিলেন, আপনার কেশ আপনি কর্ত্তন করিলেন।" সেদিন খুব সুন্দর উপাসনা হইয়াছিল। উপাসনার পর একজন ভগিনীকে তোমার কেশ কর্ত্তন করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে। তিনি অস্বীকার করিলেন। তাহার পর কন্যাকে অনুরোধ করিলে, তিনিও অস্বীকার করিলেন। অবশেষে অনুরাগভরে আপনার কেশ আপনি ছেদন করিয়া বৈরাগিণী হইলে।

এইরূপে তুমি একে একে আসক্তির সমুদয় বস্তুগুলিকে বিসর্জ্জন দিতে লাগিলে। অলঙ্কার ও মূল্যবান বসন পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিলে। শেষে রহিল কেবল স্বামী-ধন। এই স্বামী-ধনকেও প্রার্থনা পূর্ব্বক ভগবানের শ্রীকরে অর্পণ করিলে। স্বামীর প্রতি মনের ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলে। তিনি আসক্তির বস্তু থাকিবেন না, কেবল ধর্ম্মপথের সহায় হইবেন, এই আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলে। আসক্তি থাকিলে নারীর পক্ষে স্বামী ধর্ম্মপথের সহায় না হইয়া মাঝখানের অন্তরাল স্বরূপ হন। তোমার পক্ষে ভগবানের ও তোমার মাঝখানে আর স্বামী রহিলেন না।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর হইতে প্রতি বৎসর ৮ই জানুয়ারীতে নিষ্ঠার সহিত উপাসনা ও হবিষ্যান্ন আহার নিজেও করিতে, আমারও সহায়তা করিতে; এবারও ঐ দিনে (১৮৮৯ সালের ৮ই জানুয়ারী) শেষ রাত্রে মাতৃস্তোত্র পাঠ হইল, নাম

গান করা হইল, ও অতি প্রত্যূষে উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সে দিন তোমার অতিথি ছিলেন। তিনি বারান্দায় বসিয়া উপাসনায় যোগদান করিলেন। বাহিরে কেন বসিলেন জানি না; বোধ হয় তোমার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না, তাই। কিন্তু আহারের সময় তিনিও ধরিয়া বসিলেন হবিষ্যান্ন ভিন্ন অন্য অন্ন গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং তোমার নিজের অংশ হইতে তাঁহাকে আহার করাইলে, এবং এইরূপে তাঁহাকে চিরদিনের আত্মীয় করিয়া লইলে।

তুমি যখন নিষ্ঠাপূর্ব্বক হরিগুণ গান করিতে, সকলেই যোগদান করিয়া সুখী হইতেন। তোমার উপাসনার গৃহে সকলেরই স্থান হইত; ব্রাহ্ম কি অব্রাহ্ম, যিনিই হউন, ধর্ম্মপিপাসু হইলেই হইল। তোমার উপাসনার গৃহে অবগুণ্ঠন ছিল না। যাহার অত্যন্ত কুদৃষ্টি, সেও স্থান পাইত। তোমার বিশ্বাস ছিল উপাসনার গৃহ এত উচ্চ স্থান, যে এখানে কেহ কাহারও মন্দ করিতে পারে না। তবে যাহারা চঞ্চল তাহাদের লজ্জা রক্ষার্থে স্বতন্ত্র স্থান করিয়া দিতে।

এই সময়ে একটি বাঙ্গালী খ্রীষ্টান পরিবারের সঙ্গে তোমার আত্মীয়তা হয়। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একজন পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী খ্রীষ্টান দানাপুরে বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের সুন্দরী কন্যা বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। বিন্দুবাসিনী জন্ম হইতে খ্রীষ্টান, কারণ কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় পূর্ব্বেই খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে তোমার আলাপ ও ক্রমশঃ সদ্ভাব হইল। তুমি যাহা করিতে তাহা পূর্ণমাত্রায়ই করিতে। যখন আলাপ হইল, তখন আর কেহ বুঝিতে পারিত না যে তাঁহারা খ্রীষ্টান আর তুমি ব্রাহ্ম। একত্রে আহার, একরূপ বস্ত্র পরিধান, তাঁহাদের মত ভ্রমণ, মেয়েদের সঙ্গে একত্রে শয়ন, উৎসবে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ, গির্জায় গমন, এ সকলই হইতে লাগিল। ইঁহাদের

সহিত আলাপ হওয়াতে তোমার সাহস বাড়িয়া গেল। ইঁহাদের আচার ব্যবহারে কেমন অবরোধ শূন্য ভাব! ইঁহাদের অনুরোধে একজন নবাগত ইংরেজ পাদরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে। পাদরী সাহেবের আয় অল্প, কিন্তু তাঁহার বাড়ীটি এমন পরিচ্ছন্ন, তাঁহার স্ত্রীর গুণে সামান্য বস্তুগুলিও এমন করিয়া সাজান, যে তাহা দেখিয়া তোমার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। পাদরী সাহেবের ও তাঁহার মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলে। ফিরিয়া আসিবার সময়ে তোমাকে একটু বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। বিলাতের নিয়মানুসারে অতি ভদ্র সেই পাদরীসাহেব তোমাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে আসিলেন, ও বিদায় কালে শেক-হ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। তুমি কখনও অন্য পুরুষের হস্ত স্পর্শ কর নাই, কিন্তু কি করিবে? পাদরী সাহেব তো আমাদের দেশের আচার ব্যবহার জানেন না; তিনি সরলভাবে নারীর সম্মান করিতে আসিলেন, তুমিও ভগবানকে স্মরণ করিয়া শেকহ্যাণ্ড করিলে। ইহার পরে তুমি বিলক্ষণ সাবধান হইয়াছিলে; এরূপ স্থলে দূর হইতে প্রথমেই নমস্কার করিতে, হাত বাড়াইবার আর অবকাশ থাকিত না।

এইরূপে চক্রবর্ত্তীদের সহিত এমন আত্মীয়তা হইল যে, অবসর পাইলেই তুমি তাঁহাদের বাটীতে যাইতে, তাঁহারাও তোমার বাটীতে আসিতেন। শেষে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোক গমনের পর সান্ত্বনা দানের জন্য তুমি মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলে ও অযাচিতভাবে তাঁহার পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার্থে মাসে মাসে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলে। একদিন ইঁহাদের সঙ্গে ব্যবহারে তোমার ভালবাসা ও ধৈর্য্য খুব পরীক্ষিত হইয়াছিল। ১৮৮৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমরা দানাপুর গিয়াছিলাম, সঙ্গে অনেকে ছিলেন। সেখানে গঙ্গাস্নান ও উপাসনা হইল। চক্রবর্ত্তীরা আমাদের আসিবার কথা আগে জানিতেন না। আমাদিগকে যত্ন করিয়া খাওয়াইবার জন্য

ব্যস্ত হইলেন। বৈকালের আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তুমি তাহাতে সম্মত হইলে না, কারণ অনেকগুলি ভদ্রকন্যা তোমার সঙ্গে ছিলেন, তাহার মধ্যে এক জনের গায়ে অলঙ্কার ছিল। ফিরিয়া যাইবার পথ তত নিরাপদ ছিল না। তাই শীঘ্র প্রত্যাগমন করাই স্থির করিলে। মিসেস্ চক্রবর্ত্তী তোমার দৃঢ়তা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং তোমাকে আমার সম্মুখে অনেক শক্ত কথা বলিলেন। ভগবানের কৃপায় তুমি শান্তভাবে সমুদয় সহ্য করিলে। তোমার সহিষ্ণুতা দেখিয়া তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া অবশেষে আরও আপনার লোক হইয়া গেলেন।

এই সময় পশ্চিম দেশীয় আর একটি খ্রীষ্টান পরিবারের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল। মাঘোৎসবের সময় একদিন একজন হিন্দুস্থানী খ্রীষ্টান ভদ্রলোক আমাদের উপাসনাস্থানে আসিলেন, ও হিন্দীভাষায় অতি সুন্দর প্রার্থনা করিলেন ও উপদেশ দিলেন। ইঁহার নাম মিঃ ইউনস্। ইনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই ইঁহাকে সকলে পণ্ডিতজী বলিয়া ডাকিতেন। ইনি ও ইঁহার স্ত্রী তোমার বন্ধু হইলেন। মিসেস্ ইউনস্‌কে লইয়া একত্রে আহার করা তোমার পক্ষে আনন্দের কার্য্য হইল। ইউনসের হিন্দী প্রার্থনা তোমার বড় ভাল লাগিত। ইঁহাদের গৃহ তোমার গৃহের অতি নিকটে ছিল; কোনও দ্রব্যাদি আসিলে পণ্ডিতজী ভাগ পাইতেন। ইউনসের সাহায্যার্থ নিজ বাটীর বাহিরের ঘর ছাড়িয়া দিলে, সেখানে ইউনস্ নাইট স্কুল (নৈশ বিদ্যালয়) খুলিলেন। অনেকগুলি শ্রমজীবী বালককে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তুমি আপন আয় হইতে তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিলে। আপনার বাটীতে তাঁহাদের স্থান দিবার প্রস্তাবও করিয়াছিলে। কিন্তু মিসেস্ ইউনস্ রাজি হইলেন না।

একজন ব্রাহ্ম বন্ধু এই সময়ে একটী বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন। তুমি বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলে। কিন্তু

এ বিবাহে আমাকেই আচার্যের কাজ করিতে হইবে এরূপ স্থির হইয়াছিল। তুমি শুনিয়া প্রথমে ভয়ানক প্রতিবাদ করিতে লাগিলে। কিন্তু যখন শুনিলে যে, এ বিবাহে সাহায্য করিবার আর কেহই নাই, তখন অনুমতি দিলে, ও স্বয়ং সমুদয় ভার আপনার মস্তকে লইলে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিবাহ বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে; তাহার পর বর কন্যার জন্য প্রার্থনাও করিলে। বিরুদ্ধ মত থাকিলে যে আর মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকে না, ঈশ্বর কৃপায় তুমি এই মানবীয় ভাবের অতীত স্থানে উপনীত হইয়াছিলে। এই বর কন্যাকে চিরদিন নিজ পুত্রকন্যার মত দেখিয়াছ। ইঁহাদের সন্তানের পীড়া হইলে রাত্রি জাগরণ, অর্থাভাব হইলে তাহা দূর করা, এ সকলই অতি সহজে ও সরল-ভাবে করিয়াছ। কতবার আপনার বাটীতে স্থান দিয়াছ; একত্রে আহার উপাসনার তো কথাই নাই। কেহ জানিতেও পারে নাই যে ইঁহাদেরই বিবাহের তুমি এত বিরোধী ছিলে।

এই সময়ে পরম বন্ধু ফণীন্দ্রের পত্নী জগত্তারিণী পীড়িত হইয়া চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বাঁকিপুরে তোমার বাটীতে আসিলেন। তাঁহাকে তুমি অতি আদর করিয়া সেবা করিতে লাগিলে। কিছুদিন পরে ফণীন্দ্রমোহন স্বয়ং আসিলেন। এই সময়ের একটী রহস্য মনে পড়িল; গোপন করিবার ইচ্ছা নাই তাই লিখিতেছি। জগত্তারিণী আমার আপনার ভগিনী নহেন, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ও বিবাহের পরেও তাঁহার শিক্ষার সাহায্য করিতাম, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ হইয়াছিল। জগত্তারিণীর পীড়াতে আমারও কিছু সেবা করা উচিত, এই ভাবিয়া নিজেও কিছু সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। ইহাতে তুমি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে। তখন এইরূপ, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিয়াছিলে, যে যতই ভালবাসার বস্তু বাড়ে, ততই হৃদয়ের ক্ষমতা বাড়ে। তখন তুমি বাধা দিলে তোমারই পরিশ্রম বাড়িতে লাগিল।

ইহার মধ্যে আবার তাঁহার কন্যা মৃণালিনীর ভয়ানক রোগ উপস্থিত হইল। চিকিৎসক নিরাশ হইলেন। আর একজন চিকিৎসককে তাঁহার সাহায্যার্থ ডাকা হইল। তিনি অনেক আশা দিলেন, তাহাতে প্রথম চিকিৎসক দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, ও কঠোর আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, বাটী পরিবর্ত্তন করিয়া বড় বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইবে। তখনই তুমি প্রস্তুত হইলে। আপনার বাড়ী ঘর ছাড়িলে। নূতন বাটীতে যাইবামাত্র কন্যার রোগ আরাম হইতে লাগিল, কিন্তু তোমার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তবু তোমার সেবার ত্রুটি হয় নাই। কোথায় শোণের জল, কোথায় কলিকাতার মাগুর মাছ, তোমার কাছে কিছুই অসাধ্য রহিল না। নিজ হস্তে রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করিতে। এইরূপে ছয় মাস কাল অসুস্থ শরীরে সেবায় নিযুক্ত ছিলে। "পারি না" এ কথা এক দিনের তরেও বল নাই। কন্যা আরোগ্য লাভ করিলেন, কিন্তু ভগিনী জগত্তারিণীর রোগ নির্ম্মূল হইল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ রাজগৃহে তীর্থযাত্রা

১৮৮৯ সালের ১১ই মাঘের উৎসব আসিল। শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয় উপাসনা করিলেন। তার পর দিন নারীসমাজ হইয়া গেল। উৎসবের অনুষ্ঠান আর কিছু ছিল না, তাই তীর্থযাত্রার পরামর্শ হইল। রাজগৃহে তীর্থযাত্রা করা হইবে স্থির হইল। রাজগৃহ কোথায়, তাহা আর কেহ জানিতেন না; আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, রাজগৃহে ২২টি কুণ্ড আছে; প্রায় সকল গুলিতেই গরম জল থাকে। স্নান করিতে বড় আরাম। ধ্যান ধারণার পক্ষেও অতি মনোহর স্থান। বর্ণনা করিবামাত্র সকলেই এ তীর্থে যাইতে স্বীকার করিলেন। কাজেই আমাকে পথপ্রদর্শক হইতে হইল।

পথপ্রদর্শক বলিয়া আমাকে তুমি আদর করিয়া "পাণ্ডা ঠাকুর" নাম দিয়াছিলে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও "পাণ্ডা ঠাকুর" বলিতেন। তোমার বলাই মিষ্ট লাগিত; কারণ তুমি আমার যাত্রী ছিলে। আর কেহ যাউক আর না-ই যাউক, আমার "ঘোরী" যাত্রী সাজিয়া বসিয়া আছেন; তিনি প্রস্তুত। যাত্রাকালে প্রায়ই নারীরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন, শেষ মুহূর্ত্তে একটা না একটা কিছু পড়িয়া থাকে, তাহা লইতে বিলম্ব হয়, আর পুরুষদের কাছে কথা শুনিতে হয়। তুমি কিন্তু সকলের পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইতে। গাড়ীতে বসিয়া কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, "কেমন, বিলম্ব হয় নাই তো?" "না, হয় নাই," এ কথা শুনিলেই মুখে হাসি ধরিত না।

বখতিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে কতক মেলকার্ট কতক ডুলী, কতক এক্কা আদি যানে বিহার পৌঁছান গেল। সেখানে এক রাত্রি বাস; তৎপর দিবস শকটারোহণে এবং পাল্‌কীতে রাজগৃহ যাত্রা হইল। যাহারা কখনও গরুর গাড়িতে চড়ে নাই, তাহাদের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হইতে লাগিল। উপাসনা আহারাদির পর যাত্রা হইল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজগৃহ গ্রামে উপনীত হওয়া গেল। সেই স্থান হইতে আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান প্রায় এক মাইল দূর; প্রস্তরময় ভূমি, অন্ধকার রজনী। ভক্তেরা নীরবে সাক্ষ্যভাবে পূর্ণ হইয়া চলিলেন। তোমরাও কিছু পরে যোগ দিলে। মকদুমকুণ্ডে বাসস্থান স্থির ছিল; সে কুণ্ডে পদ ধৌত করিয়া সকলের শ্রান্তি একেবারে দূর হইল। তোমার মনে আছে, রাত্রে শয়নের সময় কিরূপ লাগিতেছিল। ভূমি শয্যা, কেবল মাত্র খড়ের উপর শয়ন, কিন্তু সকলেই সুখে নিদ্রা গেলেন। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই পাহাড়ের মধ্যস্থল হইতে সুললিত ব্রহ্ম সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলাম। বাহিরে আসিয়া দখি যে মেয়েরা পাহাড়ে, তুমিও তাহাদের মধ্যে একজনা। এমন সুদৃশ্য আর দেখি নাই। সকলেই প্রফুল্ল, সকলেরই হাস্যমুখ, কেহ যেন আর পাহাড় হইতে নিম্ন ভূমিতে আসিতে চাহে না। বেলা হইল, স্নান

করিতে গিয়া মকতুম কুণ্ড কেহ ছাড়িতে চাহেনা। ইত্যবসরে শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয় মস্তক মুণ্ডন করিলেন, বেশ শ্রী হইল। তৎপরে যেখানে মকতুম সাহেব প্রার্থনা করিতেন, উচ্চ পাহাড়ের বক্ষে, সেই নিভৃত স্থানে বসিয়া উপাসনা হইল। সকলের মন মুগ্ধ হইল। বোধ হয় আট জন প্রার্থনা করিলেন। তোমার প্রার্থনাও অতি সুন্দর হইল। শ্রদ্ধেয় মহাশয় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় প্রবাসগৃহে সামাজিক উপাসনা হইল। চব্বিশ ঘণ্টা যেন সকলেই প্রমত্ত। মেয়েদের কিছুই করিতে হইত না। পানটী পর্য্যন্ত প্রস্তুত করার ভার অন্যের উপর দিয়া রাখিয়াছিলাম। সোমবার ২৮শে জানুয়ারী শ্রদ্ধেয় অপূর্ব্ব বাবু মহাশয় সকলের পদধূলি লইলেন। সেই উচ্চ ভূমিতে দুই ঘণ্টা ধরিয়া উপাসনা হইল। তারপর শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু উপাসকদিগের পদচুম্বন করিতে চাহিলেন, কেহ পদস্পর্শও করিতে দেন নাই। ২৯শে জানুয়ারী শ্রদ্ধেয় অপূর্ব্ব বাবু ও তাঁহার স্ত্রী এবং ভাই ষষ্ঠীদাস মস্তক মুণ্ডন করিলেন। এ দিনেও ভাল উপাসনা হইল। ৩০শে জানুয়ারী ব্রহ্মকুণ্ডে উপাসনা হইল।

রাজগৃহ হইতে ফিরিয়া শ্রদ্ধেয় মহাশয় বলিলেন তিনি গয়া গমন করিয়া শাক্যতীর্থের শেষাংশ পূর্ণ করিবেন। আমার জেলা ছাড়িয়া যাইবার যো নাই, তাই যাইতে পারিলাম না। তুমি একাই গেলে; কিন্তু একা গিয়া তোমার মন খোলে নাই। তখনও আত্মার যোগ বুঝিতে ক্ষমতা হয় নাই। শরীর কিম্বা শরীরী আত্মার সঙ্গে যোগ ভিন্ন আর উপায় ছিল না। সুতরাং ঐ দশা হইয়াছিল।

৬ই আগষ্ট আমরা "পুন্‌পুন্‌" নামক স্থানে গমন করিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম, জীবনে এখনও কাম ক্রোধ অভিমান তিনটি রিপুই প্রবল রহিয়াছে। সেই দিন বুঝিলাম, ব্রত পালন করিলে কি হইবে, যখন প্রলোভন আসে, তখন বলিতেই হয়, "সঙ্গ ছাড়েনি এখনও রিপুগণে।" আমিও বুঝিলাম, তুমিও বুঝিলে।

৮ই আগষ্ট অতি প্রত্যূষে দুজনে স্রোতস্বতী পুন্‌পুন্‌ নদীতে স্নান করিলাম, ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া পুন্‌পুন্‌ নদীকে সাক্ষী করিয়া দুজনা হাতে হাত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম ; যে একত্রে এ তিনটি শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিব। শত্রুরা তো একেবারে তিনটী আসে না, এক এক করিয়া আসে। আমরা দুজনে সমবেতরূপে চেষ্টা করিলে, একে একে সকল কয়টী পরাজয় মানিবে।

ইহার পরে মসৌঢ়ি নামক স্থানে "হাজারী" আম্রবনে কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম। টিকারী রাজের এক সহস্র আম্রবৃক্ষ ঐখানে আছে বলিয়া এ নাম হইয়াছে। এখানকার একদিনের দৈনিকে লেখা আছে, "প্রাতঃকালে স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে মনের শান্তিলাভ ও উদ্বোধন হইল। এখানে সর্ব্বদাই উদ্বোধন হয়। স্ত্রীর মন ভাল হইল, শরীরও ভাল হইবে। ব্রহ্মাগ্নি নির্ব্বাণ যাহাতে হয়, তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। সমস্ত দিন তোমারও অনেক কাজ, আমাকেও ব্যস্ত থাকিতে হইত। শেষ রাত্রিটুকু যেন তোমার কেনা ছিল। রাত্রি তিনটার সময় ঘুম ভাঙ্গিত। তারপর কখনও বা উপাসনা, কখনও নাম গান, কখনও বা সদালাপ, এইরূপে কাটিয়া যাইত। নির্জ্জন কানন পাইলে এগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত। রাত্রির প্রথম ভাগে তুমি নিকটে আসিতে চাহিতে না, পাছে কোন প্রকার চিত্তবিক্ষেপ হয়। শেষ রাত্রিতে তুমিও প্রস্তুত, আমিও প্রস্তুত, ভগবানও সহায় হইতেন। লোকে বলে, আমাদের প্রসঙ্গ কখন হইত? কেহ তা জানিত না। সাধ করে সকল স্বামী স্ত্রী এইরূপে সৎপ্রসঙ্গ করিয়া সুখী হইতে শিক্ষা করেন। আর একদিনকার দৈনিকে লেখা আছে, "স্ত্রীর শরীর ও মন ভাল। প্রথম রিপু বশের পথে আসিয়াছে ; এখন ক্রোধ বশীভূত করা চাই ; নইলে চলিবে না।" আর একদিন লেখা আছে, "পাপের শেষ রাখিতে নাই। ক্রোধের শেষ এখনও আছে, তাহা নষ্ট হওয়া

চাই ; আমার ক্রোধ একেবারে জয় হইলে স্ত্রীর ক্রোধও চলিয়া যাইবে। এবার তাই করিতে দাও।" যাঁহারা তোমাকে ভাল করিয়া জানিতেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও হয়ত মনে আছে, যে তোমার কিরূপ ক্রোধের উদয় হইত। শেষকাল পর্যন্ত ক্রোধ ছিল ; কিন্তু আমার মত তোমার পূর্ব্বজীবন যে জানে, সে বুঝিতে পারিবে যে, যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা তুলনায় অতি সামান্য ; ছিলনা বলিলেই হয়। পূর্ব্বে ক্রোধভরে কথা বন্ধ হইয়া যাইত ; তো তো করিয়া অল্পমাত্র কথা বলিতে পারিতে। শেষ জীবনে কেহ কখনও এ ভাব দেখে নাই। ইদানীং যে অল্পমাত্রায় ক্রোধ হইত তাহা প্রায়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে হইত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : সিমলা শৈল

১৮৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাই পরেশনাথের সঙ্গে তুমি ও আমি সিমলাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে আগ্রার তাজমহল দর্শন করিলাম ও যমুনাতে স্নান করিলাম। অম্বালা হইতে দুখানি এক্কা করিয়া যাত্রা করিলাম। একখানিতে ভাই পরেশ ও আর একখানিতে আমরা দুজন ; আমাদের এক্কা চালক গিয়া পরেশের এক্কাতে উঠিল পথে যাইতে যাইতে তোমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সারথির কার্য্য করিতেন ও অর্জ্জুনের সঙ্গে সদালাপ করিতেন। যখন কালকার কাছে আসিলাম, তখন পরেশের ঘোড়া ক্লান্ত হইয়া কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের এক্কাখানি তখন উচ্চে উঠিতে ছিল। এমন সময়ে একটী বৃহৎ চামড়া-বোঝাই গর্দ্দভ রাস্তার এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যাইতেছিল। গর্দ্দভের আকার দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটা বৃহৎ বাঘ যাইতেছে। যেমন দেখা, অমনি আমাদের এক্কার ঘোড়া ভয় পাইয়া দ্রুতবেগে পশ্চাৎ ফিরিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া

চলিল। দুই দিকে গভীর খাদ, সম্মুখে নিম্নভূমি, অশ্বের অদম্য গতি সামলায় কে? আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাশ টানিয়া রাখিয়াও অশ্বের গতি রোধ করিতে পারিলাম না। রজ্জু হস্তে এক্কার উপর শুইয়া পড়িলাম, তবু অশ্ব অদম্য বেগে চলিতে লাগিল। তুমি তখন ভয় না পাইয়া আমার সাহায্য করিতে লাগিলে, তুমিও রাশ টানিতে লাগিলে; অশ্বের গতি দমন হয় না। এই ভাবে কয়েক মিনিট চলিল। আমরা মুখে "মা! মা!" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। মনে হইতেছিল, মৃত্যু নিকটবর্তী। এমন সময় এক্কাওয়ালা আমাদিগের সাহায্য করিতে আসিল। অশ্বের গতি রোধ হইল, আবার আস্তে আস্তে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম।

তারপর দিন অতি প্রত্যুষে টোঙ্গা গাড়ী আমাদের বাসস্থানে আসিল। পরেশ সম্মুখে, তুমি ও আমি পশ্চাতে বসিলাম। এইরূপে সিমলা শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। গাড়ীতেই উপাসনা হইল। গাড়ী নাচিতে নাচিতে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, মনে হইল যেন স্বয়ং শৈলেশ্বরী আমাদিগকে কোলে করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে নিজ ভবনে চলিয়াছেন। খুব ভাল উপাসনা হইল। বেলা ৫টার সময় শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম।

সিমলা পাহাড়ে যে কয়দিন ছিলাম, অতি আনন্দে কাটিল। স্বভাবের শোভা দেখিয়া মন প্রশস্ত হইতে লাগিল। কিন্তু শরীর কাহারও ভাল ছিল না। সেখানে থাকিয়া শরীরের উপকার পাইতে হইলে অনেক বন্দোবস্ত করিতে হয় ও খরচ করিতে হয়।

বেড়াইতে যাইবার জন্য একদিন রিক্‌শা গাড়ী আনিবার কথা হইল, তুমি তাহাতে সম্মত হইলে না। প্রকৃতি দেবীর এমন সুন্দর শোভাময় প্রকাশের মধ্যে আসিয়াও নিশ্চেষ্টভাবে গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া বেড়াইতে যাইবে, এ তোমার পছন্দ হইল না। তাই আর সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে ও আমাকে স্বতন্ত্র ভাবে বেড়াইতে যাইতে হইত। আমরা দুজনে নূতন এক প্রকার বেশ

প্রস্তুত করিলাম। দীর্ঘকাল গেরুয়া অঙ্গরাখা মস্তকে হিন্দুস্থানী পাগড়ি, হস্তে লম্বা পাহাড়িয়া লাঠি। আমাদিগকে দেখিয়া বঙ্গবাসী কি বঙ্গবাসিনী বলিয়া মনে হইত না। অল্পদূর গমন করিয়া সিমলার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ "জেকোর পাহাড়" সম্মুখে দেখা গেল। ভাল পথে উঠিতে হইলে অনেক ঘুরিতে হয়, আর সোজা পথ বন্ধুর, প্রস্তরময়, কণ্টকময়। কোন্ পথে যাইবে জিজ্ঞাসা করায় বলিলে, "সোজা পথেই চল।" যেমন বলা, অমনি অগ্রসর হওয়া। এই ব্যাপারে বুঝিলাম, পুরুষ হইলেই হয় না, উৎসাহ উদ্যমই সর্ব্বে সর্ব্বা। অল্পক্ষণ পরে জেকোর সর্ব্বোচ্চ প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। অনন্ত হিমানী দেখিয়া দুজন পাহাড়ের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। "কি রূপ দেখালি" এই গানটী দুই জনে গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, মহাযোগ কি! কিন্তু এ আনন্দ অনেকক্ষণ ভোগ হইল না। একজন সন্ন্যাসী আমাদের নিকটে আসিয়া হুকার শব্দ করিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। চক্ষু মুদিত রাখিলে কি হইবে? অবশেষে উঠিয়া পলায়ন করিতে হইল। বাবাজী কিন্তু "দর্শন পর্শন" ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। "বার দীগর হোগা, মহারাজ" (অন্য সময়ে হইবে) এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলাম। অবতরণ সহজেই হইল। সেই দিনকার দৈনিকে লেখা আছে, "অদ্য পাহাড় দর্শন। পার্ব্বতীর দর্শন এই পাহাড় হইতে সহজেই হয়। অনন্ত হিমানী দেখিয়া ঘোরীর খুব আনন্দ, আমারও খুব সুখ।" একাকী দর্শনে এরূপ সুখ হইত না।

একরাত্রি আমরা সিমলা সমাজের নিকটবর্ত্তী কুটীরে বাস করিয়াছিলাম। আমাদের সঙ্গে শীতবস্ত্র কম ছিল, তাই কষ্ট হইবে বলিয়া বন্ধুগণ আপত্তি করিতে লাগিলেন। সত্যই এই কুটীরে শীতের প্রখরতা এত অধিক যে আমাদের "খাটিয়া" ত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয্যা করিতে হইল। চিমনিতে কয়লা যোগাইতে হইল।

কিন্তু রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালের আনন্দ আর ভুলিতে পারিব না। যোগের স্থান বটে। সকল বস্তুই যেন যোগের সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

একবার ফিরিয়া যে গৃহে আসিলে, আর গৃহিণী হইবার জন্য নয়। এবার গৃহের দাসী হইলে। গৃহকে কুটীর করিলে। শ্রদ্ধেয় হরিসুন্দর বসু মহাশয় আমাদের গৃহকে "অঘোর-প্রকাশ আশ্রম" নাম দিলেন। হিমালয় বাসের ফলে বর্ষ শেষের পূর্ব্বে ৪।৫ দিন কিছুক্ষণ ধরিয়া মৌনী হইয়া থাকিতে লাগিলাম। স্নানের পূর্ব্বে উপাসনা পর্য্যন্ত নির্ব্বাক হইতে শিখিলাম। বুঝিলাম, বহুভাষায় প্রেম ঘন হইতে পারে না। সকল দিন যে সজন উপাসনা সরস হয় না কেন, নীরব চিন্তা দ্বারা তাহাও বুঝিতে পারিলাম। উপাসনার সংখ্যা বাড়িয়া গেল। সকলের সঙ্গে যে পারিবারিক উপাসনা হইত, তাহা ছাড়া আবার স্নানের পর ভগবানের নিকট যাইতে আরম্ভ করিলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ রাজগৃহে দ্বিতীয়বার

১৮৯০ সালের মাঘোৎসব উপস্থিত হইল। এবার একটু কষ্টের ব্যাপার হইল। কেহই কাহারও সহিত মিলিত হইতে চাহিতে-ছিলেন না। এ অবস্থায় দুবেলাই আমাকে উপাসনা করিতে হইল। শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়েরা কেহই বাঁকিপুরে ছিলেন না। এরূপ নিরুৎসাহকর অবস্থার মধ্যেও তোমার উৎসাহ খর্ব্ব হইল না। তুমি রাজগৃহ যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলে। তুমি বলিতে, যদি কেহ না যায়, অঘোর-প্রকাশ যাইবেই যাইবে। তোমার প্রতিজ্ঞা বজায় রহিল ; তোমার উৎসাহে আরও কয়েকটি নারী যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এবারকার রাজগৃহ উৎসবের বিবরণ প্রধানতঃ ভাই ষষ্ঠীদাসের দৈনিক হইতে তুলিয়া দিতেছি।

"আমরা স্নান উপাসনা ও আহারাদি করিয়া রাজগৃহাভিমুখে তাড়াতাড়ি যাত্রা করিলাম। গরুর গাড়ীতে যাত্রা। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রকাশ বাবুর সঙ্গে মখতুম সাহেবের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। কিছু পরে সকল যাত্রী পৌঁছিলেন। রোশনচৌকি বাদ্যের বন্দোবস্ত হইল। রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন ও আলোচনা। মিলনের বিষয় কথা হইল। মিলন কেন হইতেছে না? প্রেমের অভাব। আমরা আপনাদিগকে শত দোষ সত্ত্বেও ভালবাসি; আমরা নিজ গুণের পক্ষপাতী, তাই আপনাদিগকে ভালবাসি। কেবল গুণ দেখিলে অবশ্যই অন্যকেও ভালবাসিব। পরস্পর মিলিবার এই একমাত্র উপায়,—পরস্পরের গুণ দর্শন।"

২৬শে জানুয়ারী রাজগৃহে ঘুম ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, মেয়েরা এক একটি উচ্চস্থানে বসিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেছেন। তারপর মখতুম কুণ্ডে ঈশার ভাবে জলাভিষেক হইল। তোমরাও সেই পদ্ধতি করিলে। তারপর যেখানে মখতুম সাহেব নমাজ পড়িতেন, সেইখানে খুব ভাল উপাসনা হইল। একপার্শ্বে দেবকন্যারা, অন্য পার্শ্বে ভাইয়েরা বসিলেন। পশ্চাতে উচ্চ পর্ব্বতরাজি, সম্মুখে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহ উপাসনা খুব মিষ্ট হইল। স্বার্থত্যাগ না করিতে পারিলে ব্রহ্মকৃপা আসে না, কৃপা আসিলেই আপনার প্রতি শ্রদ্ধা হয়, এইভাবে তুমি প্রার্থনা করিলে।

২৮শে জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় তোমরা অগ্নিধারা কুণ্ড দেখিতে গিয়াছিলে। অপূর্ব্ব বাবু নেতা, কুণ্ডটী চারি ক্রোশ দূরে। ঐ কুণ্ড, ঐ কুণ্ড বলিয়া কুলকন্যারা বনকাঁটার মধ্যে চলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ফিরিবার সময় শ্রদ্ধেয় অপূর্ব্ব বাবু বলিলেন, কেহ ক্লান্তির চিহ্ন দেখাইতে পারিবেন না। তুমি বলিলে যদি ব্রহ্মকুণ্ডে পা ধুইতে পাই, তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে আশ্রমে যাইতে পারি। তাহাই হইল। ষোল মাইল কণ্টকপূর্ব্ব পথ চলিয়া

হাসিতে হাসিতে গৃহে ফিরিলে। সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। পথে তোমার উৎসাহপূর্ণ মুখ দেখিয়া সকলেই সুখী হইয়াছিলেন।

২৯শের বিষয় ভাই ষষ্ঠীদাস বলিতেছেন, "শেষ রাত্রিতে ৩টার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া মখদুম কুণ্ডের ধারে একঘণ্টা ধ্যান ধারণা। প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিনের মত নাম গান, নির্জ্জন চিন্তা ; তারপর মেরী মেগ্‌ডেলীনের তৈল মর্দ্দনের বিষয়ে প্রসঙ্গ ; তৎপরে জলাভিষেক। তৎপরে যথা সময়ে পাহাড়ে উপাসনা। জীবন্ত মধুময় উপাসনা। প্রত্যেকে এক একটী স্বরূপের আরাধনা করিলেন। পূজনীয় প্রকাশ বাবু চরিত্রের সমতার জন্য প্রার্থনা করিলেন। মখদুম কুণ্ডের জল যেমন এক প্রকার তাপ রক্ষা করিতেছে তেমনই প্রকৃতি চাহিলেন। একেবারে অনেক হাসিও নয়, আবার হাঁড়ি-মুখও নয়, অর্থাৎ যাহাকে প্রসন্নতা বলে, তাই চাহিলেন। তাঁহার ভার্য্যা প্রার্থনায় বলিলেন, "ঘা ফোড়া লইয়া আসিয়াছেন, তাহা যেন আরাম হইয়া যায়। পাপ লইয়া আসিয়াছেন, যেন শুদ্ধ হইয়া যায়।" মখদুম কুণ্ডের জলে স্নান করিলে শরীরের চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া যায়। তুমি পাপরোগ দূর করিতে চাহিলে। পরের দিন প্রার্থনায় তুমি বলিলে, "মা জননী কষ্টিপাথর লইয়া যেন আমাদের মূল্য কষিয়া লইতেছেন। আবার যখন আসিব তখন বুঝি কষিয়া দেখিবেন, খাঁটি থাকিতে পারি। মূল্য যেন না কমে।"

৩১শে জানুয়ারী বিহারে ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে নামগানের পর উপাসনা হইল। আহারান্তে ঘোড়ার গাড়ীতে বখ্‌তিয়ারপুর যাত্রা করিলাম। সেখান হইতে ট্রেনে বাঁকিপুর আসিলাম। নয়াটোলার বাটী ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল। কিন্তু ধূলা পায়ে ঠাকুর ঘরে যাইতে ভুলিলে না। সকলে মিলিয়া উপাসনার গৃহে গিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ রোগে শোকে সঙ্গিনী

আমার কনিষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র ও তুমি এক বয়ঃক্রমের। ছেলে বেলা হইতে তোমাদের সদ্ভাব ছিল। বয়ঃক্রমের বৃদ্ধিতে ও নিজ নিজ সংসারের ভার গ্রহণেও সে সদ্ভাব হ্রাস হইয়া যায় নাই। যখন প্রবোধ বাঁকিপুরে আসিলেন, তখন তুমি তাঁহার ভার গ্রহণ করিয়াছিলে। তারপর যখন তাঁহার বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ম্ম হইল ও যখন তিনি একটু একটু ডাক্তারী করিতে লাগিলেন, তখন পাছে অমিল হয়, তাই তাঁহাকে ভিন্ন বাসা করিয়া দিলে। আমার মা ছোট ছেলের কাছে থাকিতে ভাল বাসিতেন, সুতরাং তাঁহাকেও খরচপত্র দিয়া প্রবোধচন্দ্রের নিকটেই রাখিলে। হিন্দু সমাজ ইহাতে ভাল বলিলেন না মনে করিলেন, তুমি ভিন্ন করিয়া দিলে। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র তোমার মন জানিতেন, তোমার অভিপ্রায়ও বুঝিতেন। তিনি বুঝিতেন যে বড় গাছের ছায়াতে থাকিলে ছোট গাছ বৃদ্ধি পায় না। বড় ভ্রাতার সঙ্গে একত্র থাকিতে আপাততঃ ছোট ভাইয়ের আরাম হইতে পারে, কিন্তু তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। কালে আবার সন্তানাদি লইয়া মনোমালিন্যও উপস্থিত হইয়া থাকে। দূরে গেলে যে হৃদয় হইতে দূরে যাওয়া হয় না, তাহা ভাই প্রবোধও বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও বিপদ হইলেই তোমার নিকট বলিতেন, তুমিও সাধ্যমত সাহায্য করিতে। এইরূপে ৪।৫ বৎসর চলিয়া গেল। তারপর ১৯শে মার্চ্চ ১৮৮৯ আমি প্রবোধের পরলোক গমনের সংবাদ পাইলাম। তুমি সেদিন অসুস্থ ছিলে। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কার পত্র? আমি উত্তর দিতে পারিলাম না। বাহিরে কাজ করিতে গেলাম। তাহাতেও সাম্‌লাইতে পারিলাম না। তখনই গাড়ী প্রস্তুত করিয়া কালেক্টরের কাছে কিছু কাজ লইয়া গেলাম। উদ্দেশ্য, তাঁহার সঙ্গে কাজের কথা

কহিতে কহিতে মনটাকে সমাহিত করিয়া লইব। অতিক্রম করিতেছি দেখিয়াই তুমি বুঝিলে যে কিছু একটা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় তোমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আস্তে আস্তে প্রবোধের সংবাদ দিলাম। তোমার মনে ভয়ানক আঘাত লাগিল। মূর্চ্ছা হইল। ডাক্তার ডাকিতে হইল। অনেক যত্নে আবার তোমার সংজ্ঞা হইল। ২৭শে মার্চ্চ প্রবোধচন্দ্রের শ্রাদ্ধ হইল। সে দিন তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছিলে তাহা অতি প্রাণভেদী হইয়াছিল।

প্রবোধচন্দ্র অকালে তিরোহিত হইলেন; তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী বলিলেন, "ছোট দিদির যদি ঘর ঝাঁট দিয়া দিনপাত করিতে হয়, তাহাও ভাল; কিন্তু প্রাচীন সমাজে কুটুম্বদিগের নিকট গিয়া আরামেও থাকিতে চাই না।" এই রূপে প্রবোধের স্ত্রী ও কন্যা তোমায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তুমিও সাদরে তাঁহাদের গ্রহণ করিলে। সকলেই তখন বুঝিল প্রবোধ তোমার হৃদয় হইতে দূরে যান নাই। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও কন্যার ভার সম্পূর্ণরূপে তুমি গ্রহণ করিলে। যাহা আপনার কন্যাদের জন্য করিতে পার নাই, তাঁহার কন্যাকে এমন সুশিক্ষা দিতে লাগিলে। অবশ্যই পরলোকে এখন প্রবোধের হাসিমুখ দেখিয়া সুখী হইতেছ।

সংসারের খরচ বাড়িতে লাগিল। তোমারই উপরে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি, তোমাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইল। তুমি উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রস্তাব করিলে, বাড়ীতে মাকে যে টাকা পাঠান হয়, তাহা হইতে কিছু কমাইয়া দেওয়া যাউক। আমি বলিলাম, তাহা করিও না। ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম, ও ভগবানকে বলিলাম।

কয়েকদিন পরে আমাকে উচ্চ Standardএর Departmental পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। বলিলাম, "আমাকে কিছু দিনের জন্য সংসার হইতে একেবারে ছুটি দাও। তুমি একাই সব সাম্‌লাইয়া লও।" তুমি বলিলে, "বেশ।" অর্থাৎ, লোকজন আসিলে তাহাদিগের অভ্যর্থনার ভার, কাহারও

অসুখ করিলে শুশ্রূষা ও চিকিৎসক ডাকার ভার তোমারই উপর পড়িল। আমাকে একাকী বাঁকিপুর হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী "কুম্‌হ্রার" নামক স্থানে পাঠাইয়া দিলে। সেখানে গিয়া এক পক্ষ কাল অবস্থিতি করিলাম। সংসারের সমুদয় ভারই তুমি লইলে। কাহারও পীড়া হইলেও আমাকে সংবাদ দিতে না। কেবল আহারের সময় আহার পাঠাইয়া দিতে। তোমার এই সাহায্যের গুণে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলাম। ১৫ই জুন পরীক্ষার ফল শুনিলে; আনন্দভাবে উপাসনার ঘরে গমন করিলে, আর প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে কৃতজ্ঞতা দান করিলে।

পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে কার্য্যোপলক্ষে পাটনা জেলার অন্তর্গত হিল্‌সা থানায় যাইতে হইয়াছিল। আমার শরীর সুস্থ ছিল না বলিয়া সেবার জন্য তুমিও যাইতে প্রস্তুত হইলে। যান তো টম্‌টম্; খোলা গাড়ী; তবু তুমি সঙ্গে চলিলে, লজ্জা ভয় তোমাকে বাধা দিতে পারিল না। তুমি আমি ও সুবোধ এক গাড়ীতে চলিলাম। তখন সুবোধের বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর। কাছে কাছে রাখাতে তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ মিষ্ট হইতে লাগিল। গাছতলায় উপাসনা, কুঁড়ে ঘরে আহার হইতে লাগিল। ২৫শে ফেব্রুয়ারী পালীগঞ্জ বাঙ্গালায় ছিলাম; সেখানে তোমার সঙ্গে সংসারের সরঞ্জাম কিছু ছিল না; পদে পদে বিব্রত হইতে হইতেছিল। কিন্তু তুমি কিছুতেই দমিতে না। যে যে উপকরণ পাইতে না, সাহস করিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া, অন্য বস্তু দিয়া, তাহার কাজ চালাইয়া লইতে। কত অসুবিধার মধ্যে একা তোমার উপর সব ভার ফেলিয়া রাখিয়া আমি আমার কাজে বাহিরে চলিয়া যাইতাম; আর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিতাম, তুমি হাসিতেছ। তোমার এ হাসি ছেলেবেলা হইতে দেখিতে পাইয়াছি। বিপদে অসুবিধায় ঝঞ্ঝাটে তোমার এই প্রসন্ন ভাবটী কিছুতেই দমিত না। তোমার এইরূপ সব অসুবিধা কাটাইয়া কাজ সমাপন করিবার শক্তিটী ছিল বলিয়া আমার সংসারে আমি

একটী দিনও অন্ধকার বা ভার বোধ করি নাই। কতবার অন্যের সংসারে গিয়া, অসুবিধার স্থলে মুখভার করিবার ব্যাপার দেখিয়া, আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। ভাবিয়াছি, কই আমাকে তো কখনও এমন করিয়া সংসার করিতে হয় নাই! এই স্থান হইতে ফিরিবার সময় কত শ্রান্ত হইয়াছিলে, আমারও শরীর খারাপ ছিল, তবু পথে ধর্ম্মবন্ধু ষষ্ঠীদাসকে পাইয়া তাঁহার সঙ্গে উপাসনা করিয়া তবে বাঁকিপুরে ফিরিলে।

মার্চ্চ মাসে তোমার গাজীপুরের উৎসবে যাওয়া ঠিক হইল। ভাই নৃত্যগোপাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে। আমার তো কোথাও যাওয়া হয় না, জেলা ছাড়িয়া যাইবার যো নাই; তুমি আমার হইয়া গাজীপুর চলিলে, তোমার সঙ্গে শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার গেলেন। লোকে বলে, ভূপেনের সঙ্গে তুমি গেলে, আমি বলি, ভূপেন তোমার সঙ্গে গেলেন। তোমরা দুই জনাই এখন স্বর্গে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কে কার সঙ্গে গেলেন। গাজীপুরে একখানা টেলিগ্রাম দিবার কথা হইল, তুমি বলিলে, তাহাতে প্রয়োজন কি? তোমাকে বিদায় করিয়া দৈনিকে এইরূপ লিখিয়া রাখিয়াছিলাম,—"শ্রীঅঘোর গাজীপুরের উৎসবে গেলেন। আমাকে ছাড়িয়া গেলেন কিন্তু আমারই হইয়া গেলেন। যাহা কিছু করিবেন, আমারই প্রতিনিধি হইয়া করিবেন।" এদিকে ১৭ই তারিখে আমার অসুখ করিল; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, তার পর গলার ভিতরে ফোড়া হইল; গলা বন্ধ হইয়া অনেক কষ্ট পাইলাম। তবু তোমার উৎসাহ পাছে ভঙ্গ হয় তাই দুদিন সংবাদ দি নাই। ২০শে তারে সংবাদ দিতে হইল তখনও সেখানকার উৎসব শেষ হয় নাই, সুতরাং ভূপেনকে রাখিয়া তুমি সেই দিনই উপাসনার পর একাকিনী রেলে চলিয়া আসিলে, ও সন্ধ্যার সময় আমার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইলে। ২১শে ২২শে দুদিন তুমি অনেক সেবা করিলে কিন্তু রোগের যন্ত্রণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। পরীক্ষা ঘোরতম। ২২শে সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণায় আমার নিদ্রা

হইল না। ধৈর্য্য দাও, এই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ২৩শে রবিবার সন্ধ্যার সময় ভয়ানক ছট ফট করিতেছি তোমার মুখপানে তাকাইয়া দেখি, তোমারও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতেছে তুমি বলিলে, "ডাক্তার ডাকিতে পাঠাই।" আমি বলিলাম, "প্রয়োজন হয় তো আপনি আসিবেন"। ভাই পরেশ কোথা হইতে ঠিক ৭টার সময় উপস্থিত হইলেন। সেই রাত্রে গলার ভিতরের ফোড়া ফাটিয়া গেল। ২৮শে তারিখে চিকিৎসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছিলে, এবং চিকিৎসকও তাঁহার প্রতি নির্ভরের জন্য যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। রোগ তখনও আরাম হইল না। ৫ই এপ্রিল মুখে অস্ত্র করিতে হইল, তুমি পাকা nurseএর মত দাঁড়াইয়া সে কার্য্যে সাহায্য করিলে। ১১ই এপ্রিল কঙ্করবাগের বাঙ্গালায় গেলাম, সঙ্গের সঙ্গিনী তুমিও চলিলে। এইখানে অবস্থিতি কালে তোমার জননীর পরলোক গমনের সংবাদ আসিল। এই সংবাদ শ্রবণের পর তুমি বলিলে, "এখন হইতে তুমি আমার মা হও", আমি বলিলাম, "তথাস্তু।" যে দিন তুমি ঐ সংবাদ শ্রবণ করিলে, সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ষষ্ঠী বাবুর ছোট সন্তানের মৃত্যু সংবাদ আসিল। তখনই শোকাতুরা জননীর সান্ত্বনার্থে গাড়ী করিয়া গমন করিলে সঙ্গে একজন চাপরাসী বই কেহ ছিল না। যখন কর্ত্তব্য উপস্থিত হইত, তখন তুমি লজ্জা, ভয়, নিজের শোক, স্বামীর সেবা সকলই ভুলিয়া যাইতে। রাত্রি আটটার সময় যাত্রা করিয়া রাত্রি দুইটার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে। আমি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

যখন আমার সেবা করিতে, তুমি কখনও দাসীর মত মুখ বুজিয়া যাহা বলিতাম তাহাই করিতে; কখনও বা কর্ত্রীর মত ধমক দিতে। যখন আমি কঙ্করবাগে পীড়িত ও দুর্ব্বল ছিলাম, ডাক্তার পূর্ণ মাত্রায় আহার দিতেন না; রাত্রে দুই তিনবার কর্ণ-ফ্লাওয়ার খাওয়াইতে হইত। বালকের মত অসময়ে ক্ষুধা লাগিয়াছে বলিয়া আমি

আবদার করিতাম; তখন শিক্ষিতা মাতার মত বলিতে, "সময় হয় নাই, শোও, সময় হইলেই ডাকিয়া আহার দিব" বলিয়া আশ্বাস দিতে; বালকের মত আবার নিদ্রা যাইতাম। এত যত্ন করিয়াছিলে বলিয়া রোগ আরাম হইল।

শরীরে শক্তি তখনও পাই নাই; সমস্ত দিনই তোমার সেবা দেখিতাম, ও প্রকৃতির শোভা দেখিতাম। এই সময় হইতে তোমার মধ্যে লুকাইয়া যাইতে বড় ইচ্ছা হইল। ভগবানও তো তাই করিয়া থাকেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে লুকাইয়া থাকেন। প্রকৃতি তাঁহাকে প্রকাশ করেন। তেমনি আমার ইচ্ছা হইল, যে আমি লুকাইয়া যাই, তুমি আমার কার্য্য কর। দেখিলাম, অন্যের প্রতি আমার যাহা কিছু করিবার ছিল, আমার অনবসর বশতঃ তুমিই তাহা করিতেছ।

৪ঠা মে কঙ্করবাগ ত্যাগ করিয়া দীঘাঘাটের ষ্টেশনমাষ্টারের বাঙ্গলায় গেলাম। সেখানে থাকিতে থাকিতে ৭ই জুন দুই প্রহর রাত্রে পরেশের কন্যার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তুমি বাঁকিপুর চলিয়া গেলে। আমি পরদিন সকালে গেলাম। তার পর আগষ্ট মাসে তোমার অগ্রজ উপেন্দ্রনাথের পরলোক গমনের সংবাদ পাইলে। আবার তুমি, বলিলে, "আজ হইতে তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকিব।" আমি স্বীকার করিলাম। এইরূপে আমাকে তোমার সব করিয়া লইয়া তোমার সকল সাধ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ দেবী

সাত বৎসর হইল, আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সাত বৎসরে এ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আমার যত ক্লেশ হইয়াছে, তোমার ততোধিক হইয়াছিল। বাহিরে কত কাজে আমার শরীর মন নিযুক্ত থাকিত, তোমার সে সুবিধা ছিল না।

তাই তুমি মাঝে মাঝে ম্লান হইতে। আমিও বুঝিতে লাগিলাম, এখনও চিত্তের শান্তভাব লাভ হয় নাই। আরও দেখিলাম, সকল সাধনে যেমন, এখানেও তেমনি, অল্পত্যাগে সিদ্ধি লাভ হয় না। ত্যাগে পূর্ণতা চাই। এবার বুঝিলাম, আলিঙ্গনও ত্যাগ করিতে হইবে। স্পর্শসুখে আবদ্ধ থাকিলেও তো জড়েতেই আবদ্ধ থাকিলাম; শরীর না থাকিলে দুটি আত্মাতে যে যোগ হইবার কথা, শরীর থাকিতে তাহা তো আর হইল না। এই সকল ভাবিয়া যখন মন অন্ধকার হইতেছে, এমন সময় এইদিন দেখি, কি করিয়া ব্রহ্মকৃপাতে তুমিও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছ; কি করিয়া তুমিও আমার ভাব অন্তরে পাইলে ও বুঝিলে, শরীরকে আরও দূরে না রাখিলে এ সাধনে সিদ্ধি হইবে না। তোমার ভাষায় সে দিন তুমি বলিলে, "অদ্য হইতে আমার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল।" আত্মা ও শরীর দুই লইয়া যে সম্বন্ধ ছিল, এখন হইতে তাহা কেবল আত্মা লইয়াই থাকিবে; অপর অর্দ্ধাঙ্গ থাকিয়াও থাকিবে না। গলা পর্য্যন্ত পরস্পরের শরীর পরস্পরের অস্পৃশ্য হইল। আমিও দৈনিকে লিখিলাম, "এখন অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল। এমন অবশ করা তোমার শক্তি দ্বারাই হয়। তুমি যাহা করিলে তাহার জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা দিই। পূর্ব্বে আমি চাহিয়াছিলাম, যে জোর করিয়া স্ত্রীকে আলাদা করিয়া দিই; অস্পৃশ্য রাখি; কিন্তু তখন তাহা হইল না। জোর করিয়া হয় না, পৃথিবী যেন এই শিক্ষা পায়।"

সেই দিন হইতে, দেবি! তুমি আমার কাছে দেবী হইলে। শরীরের প্রভাব আত্মাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তোমার পক্ষে আর কিছুই অসম্ভব রহিল না। মনে পড়ে, দেবি! সেই দিনের শেষ আলিঙ্গনের উপাসনার কথা? প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বে শয়ন করিয়া ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলিত করিয়া যাই "সত্যম্" বলিলে, অমনি বুঝিলে, সত্যরূপ ভগবানের শক্তি কেমন! এমন ভয়ানক রিপুও সে শক্তির কাছে পরাস্ত হইল। এ উপাসনা আর কেহ

শুনিতে পাইল না, কেবল অঘোর-প্রকাশ শুনিতে পাইলেন। এইরূপ উপাসনা পূর্ব্বে কখনও করি নাই; আর কেহ করিয়াছে কি না তাহা জানি না। সাক্ষ্য দিবার জন্য অঘোর-প্রকাশ বলিয়া যাইতেছেন, যদি মুখচুম্বন করিতে হয়, যদি ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলিত করিতে হয়, এইরূপেই যেন নরনারী করিতে পারেন।

এখন হইতে তুমি আরও মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে লাগিলে; দেখিলাম চিত্তের দুর্ব্বলতার কথা পরস্পরকে বলিলে আরও বল পাই। মনের গতি কোন্ মুহূর্ত্তে কিরূপ হইয়াছিল, পূর্ব্বে সব বলিতে সাহসী হইতাম না। এখন হইতে অবাধে সব বলিতে লাগিলে, আমিও বলিতে লাগিলাম।

এই সময় দৈনিকে লিখিয়াছিলাম, "আলিঙ্গন নিষিদ্ধ হইল। গলা পর্য্যন্ত স্পর্শ বন্ধ হইল। মুখচুম্বনে সুখও হয় না, দুঃখও হয় না, এইরূপ হওয়া চাই। অভ্যাসে ইহাও হইবে।" আর একদিন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, "দৃষ্টিসুখ বৃদ্ধি কর।" কারণ দেখিলাম, অন্য একটি উন্নততর সুখ না পাইলে নিম্নতর সুখ ছাড়িতে পারা যায় না। দর্শনে যে কত সুখ সম্ভব, তাহা সহসা বুঝা যায় না, অভ্যাসে ঐ দর্শনানন্দ বৃদ্ধি পাইলে স্পর্শসুখের লালসা হ্রাস হইতে থাকে। স্পর্শের আনন্দ অপেক্ষা দর্শনের আনন্দ উচ্চ; তাহা অপেক্ষা উচ্চ স্মৃতির আনন্দ। মানুষের কখনও কখনও এই তিন অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে লাভ হয়। পরীক্ষায় তুমিও দেখিয়াছ, আমিও দেখিতেছি, স্মৃতিই স্থায়ী অবস্থা, কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। স্মরণে যদি আনন্দ হয়, তাহা হইলে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না; সেইরূপ দর্শনের আনন্দ না পাইলে স্পর্শের সম্ভোগ ছাড়িতে পারা কঠিন হয়।

ইহার পর আমাদের ইচ্ছা হইল, আমাদের "আধ্যাত্মিক বিবাহ" অনুষ্ঠান হউক। এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে প্রসঙ্গ হইত। ক্রমে এই অনুষ্ঠানটী আমাদের দুজনেরই প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইল। ১৮৯১ সালের ৫ই জানুয়ারী তোমার শরীর একটু

তাই তুমি মাঝে মাঝে ম্লান হইতে। আমিও বুঝিতে লাগিলাম, এখনও চিত্তের শান্তভাব লাভ হয় নাই। আরও দেখিলাম, সকল সাধনে যেমন, এখানেও তেমনি, অল্পত্যাগে সিদ্ধি লাভ হয় না। ত্যাগে পূর্ণতা চাই। এবার বুঝিলাম, আলিঙ্গনও ত্যাগ করিতে হইবে। স্পর্শসুখে আবদ্ধ থাকিলেও তো জড়েতেই আবদ্ধ থাকিলাম; শরীর না থাকিলে ছুটি আত্মাতে যে যোগ হইবার কথা, শরীর থাকিতে তাহা তো আর হইল না। এই সকল ভাবিয়া যখন মন অন্ধকার হইতেছে, এমন সময় এইদিন দেখি, কি করিয়া ব্রহ্মকৃপাতে তুমিও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছ; কি করিয়া তুমিও আমার ভাব অন্তরে পাইলে ও বুঝিলে, শরীরকে আরও দূরে না রাখিলে এ সাধনে সিদ্ধি হইবে না। তোমার ভাষায় সে দিন তুমি বলিলে, "অদ্য হইতে আমার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল।" আত্মা ও শরীর ছুই লইয়া যে সম্বন্ধ ছিল, এখন হইতে তাহা কেবল আত্মা লইয়াই থাকিবে; অপর অর্দ্ধাঙ্গ থাকিয়াও থাকিবে না। গলা পর্য্যন্ত পরস্পরের শরীর পরস্পরের অস্পৃশ্য হইল। আমিও দৈনিকে লিখিলাম, "এখন অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল। এমন অবশ করা তোমার শক্তি দ্বারাই হয়। তুমি যাহা করিলে তাহার জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা দিই। পূর্ব্বে আমি চাহিয়াছিলাম, যে জোর করিয়া স্ত্রীকে আলাদা করিয়া দিই; অস্পৃশ্য রাখি; কিন্তু তখন তাহা হইল না। জোর করিয়া হয় না, পৃথিবী যেন এই শিক্ষা পায়।"

সেই দিন হইতে, দেবি! তুমি আমার কাছে দেবী হইলে। শরীরের প্রভাব আত্মাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তোমার পক্ষে আর কিছুই অসম্ভব রহিল না। মনে পড়ে, দেবি! সেই দিনের শেষ আলিঙ্গনের উপাসনার কথা? প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বে শয়ন করিয়া ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলিত করিয়া যাই "সত্যম্" বলিলে, অমনি বুঝিলে, সত্যরূপ ভগবানের শক্তি কেমন! এমন ভয়ানক রিপুও সে শক্তির কাছে পরাস্ত হইল। এ উপাসনা আর কেহ

শুনিতে পাইল না, কেবল অঘোর-প্রকাশ শুনিতে পাইলেন। এইরূপ উপাসনা পূর্ব্বে কখনও করি নাই ; আর কেহ করিয়াছে কি না তাহা জানি না। সাক্ষ্য দিবার জন্য অঘোর-প্রকাশ বলিয়া যাইতেছেন, যদি মুখচুম্বন করিতে হয়, যদি ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলিত করিতে হয়, এইরূপেই যেন নরনারী করিতে পারেন।

এখন হইতে তুমি আরও মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে লাগিলে ; দেখিলাম চিত্তের দুর্ব্বলতার কথা পরস্পরকে বলিলে আরও বল পাই। মনের গতি কোন্ মুহূর্ত্তে কিরূপ হইয়াছিল, পূর্ব্বে সব বলিতে সাহসী হইতাম না। এখন হইতে অবাধে সব বলিতে লাগিলে, আমিও বলিতে লাগিলাম।

এই সময় দৈনিকে লিখিয়াছিলাম, "আলিঙ্গন নিষিদ্ধ হইল। গলা পর্য্যন্ত স্পর্শ বন্ধ হইল। মুখচুম্বনে সুখও হয় না, দুঃখও হয় না, এইরূপ হওয়া চাই। অভ্যাসে ইহাও হইবে।" আর একদিন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, "দৃষ্টিসুখ বৃদ্ধি কর।" কারণ দেখিলাম, অন্য একটি উন্নততর সুখ না পাইলে নিম্নতর সুখ ছাড়িতে পারা যায় না। দর্শনে যে কত সুখ সম্ভব, তাহা সহসা বুঝা যায় না, অভ্যাসে ঐ দর্শনানন্দ বৃদ্ধি পাইলে স্পর্শসুখের লালসা হ্রাস হইতে থাকে। স্পর্শের আনন্দ অপেক্ষা দর্শনের আনন্দ উচ্চ ; তাহা অপেক্ষা উচ্চ স্মৃতির আনন্দ। মানুষের কখনও কখনও এই তিন অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে লাভ হয়। পরীক্ষায় তুমিও দেখিয়াছ, আমিও দেখিতেছি, স্মৃতিই স্থায়ী অবস্থা, কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। স্মরণে যদি আনন্দ হয়, তাহা হইলে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না ; সেইরূপ দর্শনের আনন্দ না পাইলে স্পর্শের সম্ভোগ ছাড়িতে পারা কঠিন হয়।

ইহার পর আমাদের ইচ্ছা হইল, আমাদের "আধ্যাত্মিক বিবাহ" অনুষ্ঠান হউক। এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে প্রসঙ্গ হইত। ক্রমে এই অনুষ্ঠানটী আমাদের দুজনেরই প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইল। ১৮৯১ সালের ৫ই জানুয়ারী তোমার শরীর একটু

বেশী খারাপ হয়। তখন তুমি বলিয়াছিলে, "তবে বুঝি আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠান হইল না"। ভয় করিয়াছিলে, পাছে দেহত্যাগ হয় ও পাছে এ লোকে আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠান না হয়। অনেক দিন যাহার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিবাহ হইতেছে না, ক্রমাগতই কোন না কোন ব্যাঘাত হইতেছে, এমন নায়িকার মনের যে অবস্থা হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা হইল। আমি অনেক আশ্বাস বাণী বলিলাম। বলিলাম, "উৎসবের পর রাজগৃহে বিবাহ হইবে, তাহার তো অনেক বিলম্ব আছে; তুমি শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইয়া উঠ। বিবাহ হইবে বৈ কি ?" এরূপ কথা কহিতে কহিতে সে দিন অর্দ্ধরাত্রি নিদ্রা হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ আধ্যাত্মিক বিবাহ

১৮৯১ সালের মাঘোৎসব আসিল। বাঁকিপুরে উৎসব করিয়া ২৪শে জানুয়ারী (১২ই মাঘ) রাজগৃহ যাত্রা করিলাম। সকলেই তীর্থ যাত্রায় চলিয়াছেন; কেবল দুজন যাত্রীর, তোমার ও আমার, ভাব আরও গভীর। আমরা দুজনাই অনন্ত উৎসবে মিলিত হইতে চাহিতেছিলাম। ভিতরে আত্মা যাহা চাহিতেছিল, বাহিরে বন্ধুবান্ধবদিগকে কিরূপে তাহা জানাইব, সেই চিন্তা করিতেছিলাম। মনের এই আনন্দের ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে হঠাৎ একটু বাধা হইল; তাহা আমারই দোষে। ২৭শে জানুয়ারী রাত্রিতে বেহার পান্থভবনে অবস্থিত কালে শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সঙ্গে একটী বিষয় লইয়া আমার তর্ক হয়। তোমার ইচ্ছা ছিল না যে আমি অত তর্ক করি। শেষে যখন উঠিয়া আসিলাম, তখন আমার মুখ মলিন, মনও বড় খারাপ। আমার মুখ যে অপ্রসন্ন, তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে, জানি না। কিন্তু নিজের ঘরে গিয়া যখন প্রার্থনা করি, তোমার সহানুভূতি-পূর্ণ চক্ষের জলে আমার

বক্ষ অভিষিক্ত হইয়া গেল। তোমার আশ্বাসে আবার বল পাইলাম।

২৫শে আহারাদির পর রাজগৃহ যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার সময় তথায় পৌঁছিলাম। সেই তর্কের পর হইতে মন ভাল নাই। কোনও রূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। ২৬শে সকালে দেখি, কাহারও মনে স্ফূর্ত্তি নাই, কেহ কাহারও সঙ্গ লইতে চাহিতেছেন না, সকলে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিলেন। রাজগৃহে আসিয়া তো এমন কখনও হয় না! উপাসনা হইল বটে, কিন্তু সারাদিন যেন অন্ধকারে কাটিল। এদিকে দেবি! তুমি বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত; আমিও প্রস্তুত। ২৭শে ভোরে সেই ধর্ম্মশালার এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রার্থনা করিয়া তোমার মস্তক স্পর্শ করিলাম, এবং ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া স্বহস্তে ক্ষুর দিয়া মুণ্ডন করিলাম। আমার হাত কাঁপিতেছিল,—কখনও তো কাহারও ক্ষৌরকার্য্য করি নাই। তোমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ হইল; তোমাকে এমন সুন্দর আর কখনও দেখি নাই! তোমার বাল্যমূর্ত্তি, যৌবনের মূর্ত্তি, কোনও মূর্ত্তিই ইহার মত নয়। দেব-প্রভা যেন তোমার মুখমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কি চক্ষেই যে তোমাকে দেখিতেছিলাম! স্বর্গে গিয়া যে জড়ভাবমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে তোমাকে দেখিব, এ দিনের দর্শন যেন তাহারই পূর্ব্বাভাস।

নাপিত ডাকিয়া আমারও ক্ষৌরকার্য্য করা হইল। তার পর উপাসনা। এইবার শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবুকে জানাইলাম, যে অদ্য আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ। এতক্ষণ আমাদের মুণ্ডিত মূর্ত্তি কেহ দেখেন নাই। এখন দেখিবামাত্র, দেবি! মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলের মন সম্ভ্রমে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ম্লান উপাসনা-সভা সজীব হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধেয় অমৃতবাবু মহাশয়েরও মনের সেই ভার কোথায় চলিয়া গেল! তিনি অনু-প্রাণনে প্রমত্ত হইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনার পরে

নবসংহিতা অনুসারে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। সংহিতায় আছে, ৭ দিনের জন্য এই ব্রত লইবে; আমরা বলিলাম, অনন্ত কালের জন্য।

শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় "ব্রহ্মকন্যার অবতরণ" বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, জগতে মহাপুরুষ অনেক আসিয়াছেন, কিন্তু মহানারী অদ্যাবধি আসেন নাই। এইবার তাঁহার আগমন হইল। মহানারীর যে সকল লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা তোমাতে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তোমাকে এ আখ্যা দিলেন। আমি তো আগে তোমার মহানারীত্ব দেখিতে পাই নাই। আমার ঘোরীকে আমি নিজেই আদর করিতাম, পূজা করিতাম; আবার অপূর্ণতা দেখিলে মুখ আঁধার করিয়া থাকিতাম। ঘরে থাকিতে বলিয়া বুঝি তোমায় আগে বুঝি নাই। তুমি যে মহানারী তাহা এখন আমাকেও স্বীকার করিতে হইল।

সকালের উপাসনার পর সকলের মনে আমাদিগকে আদর করিবার জন্য এক আশ্চর্য্য আবেগ উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণ তোমাকে ও আমাকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইলেন। উপাসনার পর কন্যা-বরের বরণ হইল। 'কন্যাবর' কেন, 'বরকন্যা' কেন নয়, তাহা বুঝিলে তো? যখন শরীরের বিবাহ হইয়াছিল, তখন 'বরকন্যার' বরণ হইয়াছিল। এখন কনের দিন পড়িল, তিনি বরের পূর্ব্বে গেলেন। কন্যার মান্যে বরের মান্য হইল। তাঁহারা দুই জনে মাঝখানে; চারিপাশে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা বাতির ডালা হাতে লইয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে পরিক্রমণ আরম্ভ করিলেন। আমার মনে যে কি অবস্থা হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। এ পৃথিবীর কথা ভুলিয়া গেলাম অশরীরী আত্মা তুমি এখন আমার কাছে যাহা হইয়াছ, তখন যেন তাহাই হইয়া গিয়াছিলে।

এই দিনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভাই ষষ্ঠীদাস তাঁহার দৈনিকে লিখিয়াছিলেন, "উপাসনা স্বর্গের উপাসনা। আজ মহাব্যাপার।

ভক্তিভাজন সাধক প্রকাশবাবু ও তাঁহার ভার্য্যা অঘোরকামিনী আধ্যাত্মিক বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আহা, আজ কি মনোহর দেবদৃশ্য! বিধাতা আজ স্বয়ং পুরোহিত হইয়া এই উভয় সন্তানকে বিবাহ সূত্রে বাঁধিয়া দিলেন। এ বরকন্যার আর শরীরের সম্বন্ধ নাই। ইঁহারা বার বৎসর হইল সাধন আরম্ভ করিয়া আজ নয় বৎসর কাল ইন্দ্রিয়কে একেবারে দমন করিয়াছেন। তাঁহারা সাক্ষ্য দিলেন, এ নিগ্রহে তাঁহাদিগকে অনেক কাঁদিতে হইয়াছে, অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে, কিন্তু পরে যে সুখ শান্তি পাইয়াছেন, তাহার সঙ্গে তুলনায় সে কান্না সে দুঃখ কিছুই নহে। এই ব্যাপার সকলের মনে একটা স্বর্গীয় ভাব আঁকিয়া দিয়া গেল। এখন প্রকাশ বাবুর বয়ঃক্রম ৪৪ ও অঘোরকামিনীর ৩৬ বৎসর। রাত্রে বরকন্যার বরণ,—অমরধামের ব্যাপার; পরে সঙ্কীর্ত্তন। দয়াময়, তোমাকে ধন্যবাদ। রাজগৃহ, না স্বর্গ?"

বল তো, ২৭শে জানুয়ারী কেন "স্বর্গের উপাসনা" হইল? কেন সে দিন দেবদৃশ্য হইয়াছিল? তুমি যে দেবী, দেবকন্যা, তাহা সকলেই একবাক্যে কেন স্বীকার করিয়াছিলেন? যদি মানবী থাকিতে, তাহা হইলে মস্তক মুণ্ডন করার পর ভাল দেখাইত না। বিশেষতঃ নারী যখন সুশোভিতা, সালঙ্কারা, দীর্ঘকেশী হন, তখনই তিনি দেখিতে সুন্দরী হন; কিন্তু আজ যে তোমার কোন অলঙ্কার নাই, তুমি মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ, আজ কেন তোমাকে দেখিতে এত সুন্দর লাগিল? আজ তুমি অসংসারী, আজ তুমি সন্ন্যাসিনী, আজ তুমি আত্মাময়ী, তাই তোমার স্বর্গের রূপ। তাই ভাই ষষ্ঠীদাস দেবদৃশ্য বলিলেন।

মনে পড়ে, দেবি! ব্রতের প্রথম ছয়মাস কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে কাটাইয়াছিলে? একাকী শয়ন করিতে, আর চক্ষের জলে মাথার বালিশ ভিজিয়া যাইত? কেন, দেবি! আমাকে বলিতে না? বলিলে হয় তো তোমার চক্ষের জলের সঙ্গে আমার অশ্রুবারি মিশ্রিত করিয়া তোমার দুঃখভার লঘু করিতাম। অথবা যাহা করিয়াছিলে, ভালই করিয়াছিলে। হয় তো তোমার চক্ষের জল দেখিলে আমার

ব্রত ভঙ্গ হইয়া যাইত। আর "বিনা দুঃখে হয় না সাধন," একথাও তো সত্য। সে দুঃখভার বহন না করিলে আজ কি দশা হইত, বল দেখি? আত্মার বিবাহও হইত না, আর আজ তোমার শরীরে বঞ্চিত হইয়া আমি অন্ধকার দেখিতাম। তাই বলি, ঘোরী তোমার কষ্ট বৃথা যায় নাই। "অশ্রুসলিল ধৌত হৃদয়ে" আমরা আত্মার সম্বন্ধ ভিক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সলিলই আমাদের অভিষেকের জল হইয়াছিল।

অভিষেকের কথায় মনে হইল, রাজগৃহে প্রত্যহই স্নানের সময় অভিষেক হইত। কিন্তু ২৭শে জানুয়ারীর রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তুমি আমাকে বলিলে, "অভিষেক হইবে, কুণ্ডে চল;" সকলে তখনও নিদ্রিত। দুজনে ব্রহ্মকুণ্ডে আনন্দমনে গমন করিলাম। সেখানে তোমার চরণে ও মস্তকে আমি সুগন্ধি তৈল অর্পণ করিলাম। তুমিও সেইরূপে অর্পণ করিবার পর ব্রহ্মকুণ্ডে উষ্ণ জল দ্বারা আমাদের অভিষেক শেষ হইল। পরিষ্কার জল, আকাশ পরিষ্কার, সময় গম্ভীর। স্বামী স্ত্রীর অভিষেক করিলেন; আবার স্বামী অভিষেকের জন্য মাথা পাতিয়া দিলেন, স্ত্রী তাঁহার অভিষেক করিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তুমি আমার যাহা ছিলে, আমিও তোমার তাহাই ছিলাম। স্বামী বলিয়া আমার প্রাধান্য কোনও দিন রাখি নাই। এটুকু অন্য হইতে আমাদের প্রভেদ।

২৮শে জানুয়ারী—বাবুর বিধবা ভগিনী মস্তক মুণ্ডন করিলেন; তিনি যুবতী বালবিধবা। এতদিন বৈধব্য-বেশ ধারণ করেন নাই। তোমার এই মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারও মন প্রস্তুত হইল। তুমি স্বয়ং তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলে। কখনও ক্ষৌরকার্য্য কর নাই, ঈশ্বরচরণ ভরসা করিয়া এ কার্য্যও সমাধা করিলে। তোমার অনুসরণ করিয়া তিনি তোমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসায় আবদ্ধ হইলেন, এবং আত্মিক বিষয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারও জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

চতুর্থ খণ্ড ঃ সেবার্থিনী

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ সেবার উদ্যোগ

রাজগৃহ হইতে বাঁকিপূর ফিরিবার কিছুকাল পরেই উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও তোমার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তোমার গৃহখানি দেখিয়া বলিলেন, "এই তো তীর্থ। গয়া কাশী ঘুরিয়া আসিলাম, এমন তীর্থ তো আর কোথাও দেখি নাই।" রাওজী প্রাতঃকালে উপাসনায় বসিয়াছেন, উপাসনার পরেই গয়া যাত্রা করিবেন। যাত্রার সময় প্রাতঃকাল ৭টা। এই সময়ের মধ্যে উপাসনার পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া রান্না আরম্ভ করিয়া ভৃত্যকে আদেশ দিয়া আসিয়াছিলে, যে আহার প্রস্তুত হইলে তৎপ্রতি যেন দৃষ্টি রাখে। যেমন উপাসনা হইল, অমনি আহারের স্থান প্রস্তুত হইল, ওদিকে ঘোড়ার গাড়ীতে দ্রব্যাদি উঠিতে লাগিল। বন্ধু রাওজী আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আহার করিলেন। তাঁহার সন্তোষ দেখিয়া আমরা কত কৃতজ্ঞ হইলাম। তোমার আতিথ্যে সরলতা ও আদর মিশান থাকিত বলিয়া সে আতিথ্য গ্রহণে কাহারও সঙ্কোচ হইত না।

আধ্যাত্মিক বিবাহের পর নানা ভাব হৃদয়ে লইয়া আমরা আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। তুমি করিবে কি? দেবকন্যা স্বর্গের ধন লাভ করিয়াছ, কিরূপে তাহা অপরকে দিবে, পরস্পরে এ আলোচনা করিতে লাগিলাম। যাহা লাভ করিলে, অন্যে যদি তাহার অংশ না পায়, তোমার পাওয়া তো সার্থক হয় না। ভাবিতে ভাবিতে তোমার "পরিবারের" সূত্রপাত হইল। তখন জানিতাম না যে, উহার নাম "পরিবার" হইবে।

মোকামার ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণের বাড়ীকে তুমি আপনার বাটী মনে করিতে। তেমনি দানাপুরের ভাই ষষ্ঠীদাসের বাড়ীটিও তোমার

নিজের বাড়ী ছিল। তুমি ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণের বাড়ীকে পূর্ব্বের ও ভাই ষষ্ঠীদাসের বাড়ীকে পশ্চিমের ঘর বলিতে। এইবার তুমি একবার তোমার পূর্ব্বের ঘরে গিয়া দেখিলে, যে সেখানে খেলাত বাবুর কন্যা সুকুমারীর লেখাপড়া হইতেছে না। পশ্চিমের ঘরেও সেই অবস্থা; ভাই ষষ্ঠীদাসের কন্যার ক খ শেখা হইয়াছে মাত্র। নারীর অজ্ঞানতা তোমার এত ভয়ানক বোধ হইত, যে তাহা দেখিয়া কখনও তুমি স্থির থাকিতে পারিতে না। গরীব ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কলিকাতায় কন্যাদের রাখিয়া লেখা পড়া শেখান এক প্রকার অসম্ভব। তুমি বুঝিলে, এ মেয়ে দুটীর জ্ঞানাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে। তুমি বলিলে, বাঁকিপুরে নিজ বাটীতে বোর্ডিং খুলিবে। তাহাই হইল।

২৯শে মাঘ (১১ই ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৯১) বোর্ডিং স্থাপিত হইল। এই দুই কন্যাকে লইয়া নিজে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করিলে। কিন্তু এ অতি কঠিন কায। এ তো আর গৃহস্থালী নয়, রান্না বান্না নয়, যে পিতামাতার বা আত্মীয় স্বজনদিগের নিকট হইতেই ইহার সমুদয় প্রণালী অবগত হইবে। ভিন্ন পরিবারের কন্যাদের একত্র রাখিতে হইলে কি কৌশলে রাখিতে হয়, সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দিন কয়েক পরিশ্রম করিয়াই বুঝিলে, যে এই কাজটী সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার জন্য হৃদয়মনের আরও বিকাশ ও চরিত্রের আরও বিশেষ সাধন প্রয়োজন। তাই স্থির করিলে, কিছু কালের জন্য লক্ষ্ণৌ নগরীস্থিত Miss Thoburn এর প্রতিষ্ঠিত Women's College এ যাইবে এবং সেখানে ছাত্রীরূপে শাসনাধীন থাকিয়া কন্যাদের কিরূপে চালাইতে হয় তাহা শিক্ষা করিবে; আর যদি সম্ভব হয়, কিছু ইংরাজীও পাঠ করিবে।

কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা একজন বয়স্কা সন্তানবতী গৃহিণীর পক্ষে সহজ নয়। তুমি স্বামীর পরম সহায়, পাঁচ সন্তানের মাতা, অনেক দাস দাসীর উপরে কর্ত্রী। তোমাকে এ সকল ছাড়িয়া অপরের কন্যার শিক্ষার জন্য গৃহত্যাগ করিতে হইবে, ভিন্ন

ধর্ম্মাবলম্বীদের নিয়মাধীন হইয়া চলিতে হইবে; সেখানে স্বদেশবাসী অপর ব্রাহ্মব্রাহ্মিকার সঙ্গে থাকিতে পাইবে না, হয়তো ব্রাহ্ম সমাজেও যাইতে পাইবে না; এ সকল জানিয়া শুনিয়াও উন্মাদিনীর মত দূরদেশে চলিলে। যাইবার সঙ্কল্প করিবার সময় তোমার গৃহের তত্ত্বাবধান কে করিবে, সেজন্য তোমার আশঙ্কা হইল না। কোথা হইতে এত খরচ আসিবে, তাহারও ভাবনা করিলে না। গৃহে দ্বিতীয় এমন কোনও বয়স্কা নারী ছিলেন না, যিনি তোমার অনুপস্থিতিতে সন্তানদিগের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। মাসিক আয়ে তখনই স্বচ্ছল ভাবে ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না, তোমাকে বিদেশে সভ্য মেমদিগের মধ্যে থাকিতে হইলে কত খরচ হইবে, ও সে খরচ কোথা হইতে আসিবে, তার জন্যও একটুমাত্র চিন্তিত হইলে না। কোনও বাধা তোমায় বাধা দিতে পারিল না। তোমার এ যাত্রার প্রস্তাব শুনিয়া কেহ হাসিলেন, কেহ আশ্চর্য্য হইলেন। যাঁহারা জানিতেন তোমার উদ্দেশ্য কি, তাঁহারা সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সহানুভূতির দ্বারা এবং কার্য্যতঃ তোমার এই সঙ্কল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ মিলিত জীবনে যে তুমি নিত্য আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতে, যে তুমি কি রাজধানীতে, কি গ্রামে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, কি উৎসবে, নিরন্তর আমার ছায়ার মত সঙ্গে ছিলে, কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিতে না, সেই তুমি আজ কতদিনের জন্য কত দূরদেশে চলিলে! বনের পাখী অনেক দিন পোষা পাখী হইলে সে কত প্রিয় হয়! তুমি পরের মেয়ে আমাদের ঘরে আসিয়া আপনার গুণে সকলকে মোহিত করিয়াছিলে। তোমাকে দূরদেশে পাঠান আমার পক্ষে কত কঠিন ছিল, তাহা তুমি জানিতে। কিন্তু এখন তুমি আর শুধু আমার নও। আমার জন্য তোমাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলাম না; উড়াইয়া দিয়া, উড়িতে দিয়া আক্ষেপ করিলাম না; উড়িতে গিয়া তুমিও

আক্ষেপ করিলে না। দেবি, এই কি আমরা সেই দুজন, যাহারা বিদায় লইতে হইলে পূর্ব্বে নিরাশ্বাস হইয়া ক্রন্দন করিতাম? এবার অশ্রুজল কোথায় গেল? ব্রহ্মকৃপাতেই ইহাও সম্ভব হইল। হাসিমুখে আমরা বিদায় লইলাম।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯১ তুমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলে। সে দিন প্রাতঃকালে খুব ভাল উপাসনা হইল; প্রিয় দামোদর নূতন একটি গান রচনা করিয়াছিলেন। আমি আরা পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেকে তোমাদের দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি সেখান হইতে বিদায় লইলাম। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয় তোমাদের সঙ্গ লইয়া লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যাইবেন; এই স্থির ছিল। সকলে তোমায় প্রণাম করিলেন। আমি কি করিলাম তাহা অবশ্যই তোমার মনে আছে; তোমার মস্তকে চুম্বন করিলাম। পিতা যেমন অবাধে সকলের সম্মুখে কন্যার মস্তক চুম্বন করেন, আমিও তেমনি করিলাম। সকলের সম্মুখে কুলবধূর মস্তক চুম্বন, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সকলেই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কেহ কিছু বলিলেন না। এই পবিত্র চুম্বনে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। এরূপ যে করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই, কল্পনাও করি নাই। যেমন মনে হইল, তোমাকে ইঙ্গিত করিলাম, তুমিও মাথা বাড়াইয়া দিলে, আমি পবিত্র চুম্বনে সুখী হইলাম। আর দুইবার সকলের সম্মুখে চুম্বন করিয়াছি। যখন দেহত্যাগ করিলে, তখন একবার মস্তক চুম্বন করিলাম, আর শেষ শয্যায় গঙ্গাতীরে অগ্নি দিবার পূর্ব্বে ললাট চুম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চক্ষেও জল আসে নাই, আমিও আক্ষেপ করি নাই। তোমাদের গাড়ী হু হু করিয়া চলিয়া গেল, আমরা ঘরে ফিরিলাম। তোমার অনুপস্থিতিতে ভাই ষষ্ঠীদাস বালিকাবিদ্যালয়ের ভার লইলেন। সেটী খগোলে উঠিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ লক্ষ্ণৌ কলেজে দৈনিক জীবন

লক্ষ্ণৌ কলেজে যখন তুমি উপস্থিত হইলে, তখন গ্রীষ্মকাল সকালে স্কুল হইত। দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে ছুটী পাইতে। আহারাদি বোর্ডিংএর ভৃত্যেরা প্রস্তুত করিত। সকল মেয়েরা একত্র আহার করিতে বসিত। বাসন তোমাদিগকে মাজিতে হইত। আলো জ্বালিবার তেল প্রত্যেককেই ক্রয় করিতে হইত। স্নানের জন্য গরম জল চাহিলে তার জন্য তুপয়সা অতিরিক্ত দিতে হইত। তুমি নিজের ঘরে আগুনের বন্দোবস্ত করিয়া জল বসাইয়া রাখিয়া অন্য কাজ করিতে যাইতে। গরম হইলে তাহা স্নানের জন্য ব্যবহার করিতে। সেখানে তোমার দৈনিক কাজ এইরূপ ছিল,— ৪৷৷০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উপাসনা। ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে খাওয়া, বস্ত্র পরিধান ও ঘর পরিষ্কার করা। ৬টা হইতে ১০৷৷০টা পর্য্যন্ত স্কুল। ১০৷৷০টা হইতে ১২টার মধ্যে স্নান, আহার ও বিশ্রাম। ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা পর্য্যন্ত পাঠ। ৫৷৷০টা হইতে ৬টার মধ্যে আহার। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত নামপাঠ ও গান। ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পাঠ। ১০৷৷০টা হইতে ১১টার মধ্যে গান ও শয়ন।

মিস থোবর্ণ তোমাকে অন্যান্য ছাত্রীর মতন নিয়মের অধীন করিয়া রাখিতে চাহিতেন না। তুমি কিন্তু পূর্ণমাত্রায় নিয়মের অধীন হইয়াই চলিতে। তোমার সঙ্গে শীঘ্রই তাঁহার অতিশয় বন্ধুত্ব হইল। তিনি তোমাকে ছাত্রীর মতন না দেখিয়া আপনার ভগিনীর মতন দেখিতে লাগিলেন। তোমার পার্শ্বে আসিয়া একাসনে বসিতেন। যতই তিনি বলিতে লাগিলেন, মিসেস্ রায় এ সকল নিয়মের অধীন নহেন, ততই তুমি নির্দ্ধারিত নিয়মগুলি দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে লাগিলে। ইহাতে তোমারও উপকার হইতে

লাগিল। তুমি বাল্যাবস্থা হইতে কোনও কাজ কখনও নিয়মাধীন হইয়া কর নাই, কেহ নিয়মের কথা বলেও নাই ; এ বিদ্যালয়ে সকলই নিয়ম। নিয়ম যদি পালন করিতে না শিখিতে তাহা হইলে সেখানে হয়তো অত দীর্ঘকাল থাকিতেই পারিতে না ; জীবনের মহাব্রতের জন্য যাহা শিখিয়া আসিয়াছিলে তাহা আর শিখিবার অবকাশ হইত না। তোমার পরিবারের কন্যারাও নিয়ম পালনে সক্ষম হইত না। এই বিষয়ে লক্ষ্ণৌ হইতে পরে তুমি লিখিয়াছিলে, "বাধ্যতা যে কি, বাল্যকালে তাহা কেহ শেখায় নাই। গোপনে সেই জন্য নিজেই কষ্ট পাইয়াছি। বাধ্যতাতে যে এত সুখ, তাহা জানিতাম না। মনে হইত, বাধ্য হইয়া চলিতে হইলে কেবল দুঃখসাগরে ভাসিতে হইবে। এখন দেখিতেছি সে আমার ভুল। এই এক নূতন জিনিষ দেখিতেছি, যাহাকে তিক্ত বলিয়াছিলাম, সেই হইল মিষ্ট, আর যাহাকে মিষ্ট বলিয়াছিলাম, এখন তাহাকে তিক্ত বলিয়া পরিহাস করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

তুমি সেখানে গিয়াই এমন উৎসাহের সহিত নিজের কাজে নিযুক্ত হইলে এবং সেই উৎসাহে ও উন্নত আকাঙ্ক্ষাতে তোমার পত্রগুলি এমন পূর্ণ থাকিত, যে তোমার পত্র পড়া আমার বন্ধুদের একটি বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হইল। প্রথম প্রথম আমাদের ভয় হইয়াছিল যে খ্রীষ্টানদের মধ্যে থাকিয়া তোমার নিজ ধর্ম্ম সাধন করিতে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিতে, কিছু বাধা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তোমার পত্রে সে ভয় দূর হইল। শনিবারে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াছিলে ; রবিবারে সন্ধ্যার সময় স্বয়ং উদারহৃদয়া মিস্ থোবর্ণ তোমাদের সমাজে যাইতে গাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। তুমি তোমাদের ঘরের এক পার্শ্বে শালু দিয়া একটী ছোট দেবালয় করিয়া লইয়াছিলে। লাল রঙ্গের আশ্চর্য্য একটু ঘর দেখিয়া মিস্ থোবর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা কি ?" তুমি বলিলে "Prayer room।" মেম সাহেব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। সকল মেয়েদের বলিয়া দিলেন,

"মিসেস্ রায় যখন prayer করিবেন, কেহ যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে।"

উৎসাহের সহিত তুমি পড়িতে লাগিলে। হিন্দী ও ইংরাজী শিখিতে লাগিলে। প্রতিদিন স্কুলের ও বাড়ীর পাঠে প্রায় ১৪ ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে। এ আশ্চর্য্য শক্তি কোথা হইতে আসিল! এই পাঠের চাপে তোমার চিরশত্রু নিদ্রা তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তুমি যেন নূতন যৌবন ফিরিয়া পাইলে। ভাই ফণী বলিয়াছিলেন, "এ বয়সে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিয়া লাভ কি?" আরও অনেকে এরূপ বলিতেন। তুমি তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলে।

জ্ঞানে যে তুমি আমা অপেক্ষা খাট ছিলে, তাহা আমার ভাল লাগিত না। আমা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে দেখিতে ও জগৎকে দেখাইতে সাধ হইত। অন্ততঃ সমান সমান শ্রেণীতে দেখিতে ইচ্ছা ছিল। সে সাধ পূর্ণ মাত্রায় মিটে নাই, তাই ভগবান স্বয়ং তোমার শিক্ষার ভার লইলেন। আমার সুখের সীমা রহিল না। সকলে পূর্ব্বে মনে করিতেন, যে আমিই বুঝি তোমাকে লইয়া যাইতেছি, এখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তোমার নিজের যাইবার শক্তি আছে; বিলক্ষণ শক্তি আছে। এ তোমার প্রশংসা নয়, মায়ের প্রশংসা বাড়িল। তাঁহারই নাম জয়যুক্ত হইল।

এপ্রিল মাসের মধ্যেই তোমার একখানি ইংরাজী পুস্তক শেষ হইল। এই সময়ে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার শিরোনাম ইংরাজীতে লিখিলে। মার্চ্চ মাসে একজন ইংরেজ ও তাঁহার পত্নী তোমাদের কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তুমি নির্ভয়ে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলে; করিয়া তোমার নিজের খুব আনন্দ হইল।

মিস্ থোবর্ণ বলিলেন, তোমাকে প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া খেলিতে হইবে। তুমি প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়াছিলে। শেষে বুঝিলে

শরীরের জন্য ইহাও প্রয়োজন। তিনিও তোমার মত মাথায় রুমাল বাঁধিয়া তোমার সঙ্গে খেলিতেন। এইরূপে তুমি খেলাও শিখিলে। ফিরিয়া আসিলে তোমার পরিবারের বালিকাদের সঙ্গে এমন উৎসাহে খেলিতে যে, তাহারা তোমাকে আপনাদের একজন মনে করিত এবং প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ দূরে না নিকটে

১৮৯১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমে তুমি লিখিলে, "এজগৎ একটী প্রকাণ্ড বাঙ্গালা; তাহার এক কামরায় তুমি, অন্য কামরায় আমি।" কোথায় দূরতা অনুভব করিয়া ক্রন্দন করিবে, তাহা না করিয়া এত নৈকট্য অনুভব কিরূপে করিতেছিলে? যদি এই নৈকট্য প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে বিচ্ছেদের কষ্ট পৃথিবী হইতে একেবারে উঠিয়া যায়। লক্ষ্ণৌ গিয়া এই লাভ হইল, যে মৃত্যু তোমার পক্ষে সহজ হইল, পরকালে বিশ্বাস সহজ হইল।

অনেক সময় আমি প্রার্থনায় বলিতাম, যে আমি একটী আত্মাকেও ফিরাইতে পারিলাম না। তাই তুমি একদিন পত্রে সাক্ষ্য দিলে, "দুঃখ করিও না, অন্ততঃ একজনকে মায়ের ঘরে পৌঁছে দিলে।" একি কম কথা! স্ত্রীর মত সাক্ষী আর নাই। তুমি যে এ সকল কথা দূর দেশ হইতে লিখিবে, তাহা জানিতাম না। তুমি যে এতদূর গিয়া মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারিবে, আবার নিজের দুটি ও অন্য এক ভাইএর একটী কন্যার ভার গ্রহণ করিয়া সমাহিত চিত্তে নয় মাস কাল অতিবাহিত করিতে পারিবে, তাহা পূর্ব্বে কেহ মনেও করে নাই। নিশ্চয়ই শান্তির আলয় যিনি, তাঁহাকে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছিলে।

আর এক পত্রে তুমি লিখিয়াছিলে, তুমি যেন পরলোকে গিয়াছ, সেখানে গিয়া আমাদের ব্যবহার দেখিতেছ, দেখিয়া বুঝিতেছ যে আমি নির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্য লইয়া থাকিতে পারি, আর তোমার সন্তানদের

যত্ন করিতে পারি। লক্ষ্ণৌ থাকিতে থাকিতে বুঝিতে পারিয়াছিলে, একেবারে চিরকালের মত দেহের অন্তরাল হইলেও আমাদের যোগ কাটিয়া যাইবে না, বরং বাড়িবে। যাহা তুমি ভাবিতে, আমিও তাহাই ভাবিতাম। তোমার পত্র পাঠ করিয়া—বাবু বলিলেন, ইহাতে তাঁহার অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতেছে। কুড়ি বৎসর হইল তাঁহার স্ত্রীর পরলোক হইয়াছে। পরলোকের বিষয় তখনও তাঁহার নিকট অন্ধকার। তোমাতে আমাতে যে ব্যবহার হইতেছিল তাহাতে তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ পরিষ্কার হইতেছিল। তাহা কত ভাল কথা! বাঁচিয়া থাকিতে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সুখ হইতে পারে, যে, একজনের মৃত স্ত্রীকে নিকটবর্ত্তী করিয়া দিলে।

এই সময়ে একদিন তোমার মনে কি এক ভাব হইল, তুমি আমার জন্মতিথি করিতে চাহিলে। আমি বলিলাম, "একা তো কিছু নই, তুমি আমি যুক্ত হইলে তবে ত জীবনের মূল্য বুঝা যায়। যে দিন আমাদের আত্মার বিবাহ হইল, সেইদিন আমাদের দুজনার যথার্থ জন্মতিথি।" তখন হইতে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহের তারিখকেই জন্মতিথি বলিয়া স্বীকার করিলে ও করিলাম। যতদিন দেহে ছিলে, ততদিন ঐ তারিখে খুব উৎসব করিতে।

আর একদিন তুমি লিখিলে, "দেখ, মনে হইতেছিল খাঁটি বিশ্বাসী না হইলে জগৎ আমাদের বিশ্বাস করিবে না। হাড়ের পরমাণু সকল যেন এখনও সেই খাঁটি সত্য বলিতে পারে না। কবে আমার হাড় বলিবে, 'সত্যম্ সত্যম্?' যে দিন তাই হইবে, জগৎকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। জননি, সেই দিন আনিয়া দাও, এই প্রার্থনা আজ ছিল। মায়ের কার্য্যের জন্য* যে কাহারও নিকট ভিক্ষা কর নাই, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু ইচ্ছাও করে, মায়ের সেবার জন্য ভাই

* এবারকার বাঁকিপুরের মাঘোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য।

বোন সকলেই ধন মন প্রাণ দান করেন। আহা, কবে আমি তোমার হইতে পারিব? এখনও, প্রকাশ, তোমার উপযুক্ত হইতে পারি নাই। সত্যই বলিয়াছ, এবার যেন দূর নিকট হইয়াছে; এ যদি না হইত, বিশেষ কষ্ট হইত। আর তো দূর নাই। প্রতিদিন ৪ টার সময় যখন নাম জপ করি, আশ্চর্য্য লীলা দেখি; তোমার নিকটে বসে সত্যই যেন নাম করিতেছি। মনে হয় না যে, তুমি দূরে। এইরূপে যখনই তোমাদের দেখিতে ইচ্ছা করে, তখনি মার কোলে দেখিতে পাই। পূর্ব্বে দেখিতে ইচ্ছা হইলে শরীর দেখিলে যেমন সুখ হইত, তার চেয়ে এখন কিছু কম বুঝিতে পারি না। বড়ই সুখ হয়। আমার বড়ই ভাবনা হইত, তুমি আগে যদি চলে যাও, আমি কি করে থাকিব? মা বুঝি আমার সেই কাতর ভাব লুকাইয়া দেখিয়াছিলেন, তাই তিনি জীবিত থাকিতেই দূরকে নিকট করিয়া দিলেন। আর কখনও যে তোমা হতে আমাকে দূরে থাকিতে হইবে না, এই যখন ভাবি কত যে সুখ হয়, অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ। কঠিন সাধনের সমস্ত কষ্ট তখন সুখে পরিণত হয়। তুমি জান, তোমা হইতে দূরে থাকিবার কথা হইলেই কত কষ্ট হইত। তা বেশ হইয়াছে, আমার সাধ মিটিয়াছে। আর এখন কথায় নয়, এখন কার্য্যে পরিণত হইল। আর দুঃখ নাই, আর আমাদের বিচ্ছেদ অসম্ভব। এ বড়ই সুখের সংবাদ। যদি একজন লোকের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিলাম,—সে জন কে? জ্ঞানী ধার্ম্মিক পুরুষ, আর আমি ক্ষুদ্র একটী প্রাণী,—তবে তাহা অপেক্ষা আমার আর সুখ কি হইতে পারে? এর চেয়ে সংসারে আর ভাল জিনিষ তুমি কি দিতে পারিতে? এখন ভাবি আমি বড়ই চতুর। যদি সংসারের সুখ তোমার নিকট চাহিতাম, এ অমূল্য চিরযোগ পাইতাম না। মার কৃপা ভাবিলে, প্রকাশ, আমার প্রাণ আর স্থির থাকে না, চক্ষে জল আর ধরে না। কেন তিনি এত ভালবাসেন জিজ্ঞাসা করিলে হাসেন, উত্তর দেন না; তারপরে বলেন, 'হইয়াছে কি? আরও বাসিব'। প্রকাশ! আমাদের একি

হইল ? লোকে যে পাগল বলিবে ! আমিও সর্ব্বদা ব্যস্ত, যাহাতে আমার অমনোযোগে মার কার্য্য বন্ধ না হয়।"

আর এক দিনের পত্রে লিখিয়াছিলে, "তোমার ঘোরী প্রাণ থাকিতে কিছুতেই পিছুপাও হইবে না। তোমার ঘোরী কিছু জানে না। প্রকাশ ! তুমি যাহা বলিয়া দিবে, এ দাসী প্রাণ দিয়া তাহা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। এতদিন তবু যেন ভিন্ন ছিলাম, এখন যে আমরা বিবাহিত হইয়া* একটী হইয়াছি। আর কি এমন কোন কাজ মা দেবেন যা আমরা পারিব না ? না পারি, করিতে করিতে তো যাইতে পারিব ? মা তো আমাদের এমন কঠিন মা নন, যে যা না পারিব তাই দেবেন। তিনি জানেন যে, আমরা কত দূর পারিব। যদি আমাদের দ্বারা তাঁহার কাজ করাইতে ইচ্ছা হয়, অবশ্যই পারিব। প্রকাশ ! তোমার ঘোরীর সমস্ত রক্ত দিলেও কি মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না ? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমার ঘোরী তোমার মার কার্য্য যেন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া করিতে পারে, আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার সাধ পূর্ণ করিবার জন্য মা যে এ জীবন কিনেছেন, যখন ভাবি, তখন যে কি সুখ পাই, তোমাকে কি বলিব ! আর বলিতে ইচ্ছাও হয় না। ইচ্ছা হয়, যা আমি ভাবি, সকলই তুমি বুঝিয়া লও। বলিতে অনেক সময় লাগে। যতই নিকট হইতেছি ততই আরও নিকট হইতে ইচ্ছা হয়। নৈকট্যের কি শেষ নাই ? তোমার সহিত কথা বলিয়া বড়ই আরাম পাই ; উঠিতে ইচ্ছা করে না। যখন আমি বাটী যাব তুমি আমার সঙ্গে খুব অনেকক্ষণ কথা বলিও। কেমন ? চিরদিনই আমরা এইরূপে কথা বলিব, কেমন ? তোমার ঐ কথাটী বড় ভাল লাগিল, যে এত দূরে, তবুও আমি যেন তোমায় মন্দ দুগ্ধ খাইতে বারণ করিতেছি, আর তুমি তাহা শুনিলে। অনন্তকাল এইরূপে পরস্পরকে বারণ করিব, আর উভয়ের কথামত উভয়ে চলিব। দেখ

*আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠানের পর।

দেখি কি সুখ! আমরা কি ঠকিয়াছি? না! এ সুখ যে অমূল্য মা শেষ জীবনে বড়ই সুখী করিলেন। আমরা এখন প্রাণ দিয়া যাহাতে মার সেবা করিয়া, মার নাম জয়যুক্ত করিয়া মাকে সুখী করিতে পারি, তাই করি।"

তুমি ৩রা জুনের পত্রে লিখিয়াছিলে, "আমি যে কি লিখিব, তাহা ভাবি না। যেমন উপাসনার সময় যা মনে আসে তাই বলি, তেমনি তোমার পত্র লিখিবার সময় যা মনে আসে তাহাই লিখি।"

তোমার কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া আমি এই সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে কি?" তুমি বলিলে, "না আমার এখন বাটী যাইবার ইচ্ছা হয় নাই, কারণ আমি যে কার্য্য করিতে আসিয়াছি তাহার এখন বিলম্ব আছে। কেবল তো দু'খানি কেতাব পড়িতেছি।"

১৩ই জুন লিখিয়াছ, "এখন রাত্রি ১০টা। দানাপুরের সেই নদীর ধারের বারান্দায় আমার মন চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে যে তোমরা উপাসনা করিতেছ।"

আর একদিন লিখিলে, "উপাসনার সময় সেই ঘরখানি, আর সেই লোকগুলি যেন আমার চারিদিকে থাকেন। আমি যেন ঠিক তোমার বামদিকে বসিয়া উপাসনা করি। ভাগ্যে উপাসনা শিখাইলে, নইলে আজকের দিনে কি অবস্থা হইত বল দেখি? উপাসনার পর মনে হইতেছিল, এইরূপে উপাসনা শিক্ষা দেওয়া সকল স্বামীর উচিত।" এই উপাসনার গুণে দূর নিকট হইল, শুধু তাই নয়, সংবাদ না পাইলেও ব্যস্ততা চলিয়া গিয়াছিল। ৬ই, ৭ই আগষ্টের পত্র তুমি ৮ই পাইলে, এবং লিখিলে, "পত্র না পাইলেও মার নিকট সংবাদ পাই, সুতরাং আমার মন কেমন করে না। হয়তো তুমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পার না যে, আমি এ কি বলিতেছি। আমিও যখন নিজের অবস্থা ভাবি, নিজেই আশ্চর্য্য হই। তোমার কোন দোষ নাই। মা মধ্যে মধ্যে

আমাকে শিক্ষা দিবেন বলিয়া এইরূপ করেন। আমিও এখন সেয়ানা হইয়াছি, পত্র না পাইলে আর ব্যস্ত হই না। এমন কি, আজ পাঁচমাসের মধ্যে কোন দিনও মেমকে জিজ্ঞাসাও করি নাই, আমার পত্র আসিয়াছে কি না? অনেক সময় ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদে ও মার কৃপায় সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত হইতে দি না। পূর্ব্বে দুই দিন পত্র না পাইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তার দিয়াছি; আর আজ একি পরিবর্ত্তন?"

পূর্ব্বে দোষ করিলে আমার মুখ ভারি দেখিতে, দেখিয়া তোমার মন অস্থির হইত। এখন আবার মা মুখ ভার করিতে লাগিলেন। একটী বেশী কথা বলিলে অমনি প্রখর দৃষ্টিতে তোমার পানে তাকাইতেন। তোমার ভালই হইল; একদিকে মা, অন্যদিকে ছেলে, মাঝখানে তুমি। একদিন সমাজে গিয়া—সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথা কহিয়াছিলে। যতগুলি কথা বলা হইল তাহা না বলিলেও হইত, কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাসে পরিচালিত হইয়া অনেক কথা বলিলে। তখন মা কিছু বলিলেন না; কুটীতে আসিয়া শয়ন করিলে, কিন্তু কোন মতেই আরাম নাই। জিজ্ঞাসা করিলে "কি হইয়াছে?" মা বলিলেন, ভার মুখে বলিলেন, "তোমাকে বলিয়াছি, ওজন করিয়া কথা বলিও। কেন বে-ওজনে কথা বলিলে?" তৎপর দিবস প্রার্থনা করিলে, আর অনাবশ্যক কথা বলিব না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : লক্ষ্ণৌ কলেজে প্রথম ছয়মাস

মার্চ মাসের প্রথম ভাগে তুমি লক্ষ্ণৌ গিয়াছিলে। মে মাসে শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয় তোমাদের দেখিতে যান ও দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তোমরা আশাতীত ফল লাভ করিয়াছ, কিন্তু শরীর বড় খারাপ হইয়া

পড়িয়াছে। অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে আমি সেপ্টেম্বর মাসে যাইতে চাহিলাম। তুমি একেবারে নবেম্বর মাসে (তোমার ফিরিবার সময়) যাইতে বলিলে। তোমার কথাই থাকিল। আমার আর যাওয়া হইল না। তোমার তপস্যা চলিতে লাগিল। গ্রীষ্মের ছুটীতে সকলেই দেশ দেশান্তরে চলিয়া গেল, আমার তপস্বিনী লক্ষ্ণৌ থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

মে মাস শেষ হইল, আর বাঁকিপুরের উৎসবও শেষ হইল। তুমি দূর হইতে সে উপাসনা সম্ভোগ করিলে। তোমার উপাসনা সম্ভোগের কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। ইঁহারাও তোমার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উৎসব ও সেবা করিলেন। ইঁহারাও অনুভব করিলেন যে তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাকে এক বাস্‌কেট্‌ লিচি পাঠাইয়াছিলাম। তুমি লিখিলে, "লিচি সন্ধ্যার সময় আসিল; খুলিয়া দেখি, লিচি ও পাতা, যেন এখনি পাড়া হইয়াছে। তখনি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে ও তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া স্কুলের যতগুলি মেয়ে ও টীচার, দাস দাসী আছেন, সকলকেই একটী হইতে ২টী, ৪টী, ৬টী, করিয়া দিয়াছি। সকলেই বড়ই সুখী হইয়া ধন্যবাদ দিলেন। বড় ভাল মিষ্টি লিচি। মেম দেখিয়া যে কি সুখী হইলেন বলিতে পারি না। পাতা দেখিয়া বলিলেন, 'এই কি ইহার পাতা? ইহার গাছ কত বড় হয়?' আমি একটি গাছ দেখাইয়া বলিলাম, 'এত বড়।' আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন, 'এমন লাল ও সুন্দর লিচি এখানে হয় না। তোমার জন্য রাখিয়াছ?' আমি বলিলাম, 'হাঁ'। আজ উপাসনার সময় উৎসর্গ করিয়া তোমার দান বলিয়া আমরা তিন জনে দুইটী খাইলাম; বড়ই মিষ্ট।" এই সময়ে তোমার কন্যাদের আহারের কষ্ট হইত, তোমার তো কথাই নাই। কিন্তু তোমার মন অবিচলিত থাকিত। ১৬ই জুন নূতন আম্র পাইয়া উপাসনার সময় উৎসর্গ করিলে, মেয়েরা খাইল। কিন্তু আমি দূরে

বলিয়া তোমার কোনও ভাল বস্তু গ্রহণে রুচি হইত না, তাই আম্র নিজে খাইলে না।

জুলাই মাসে অতিশয় গ্রীষ্ম বশতঃ ও বৃষ্টির অভাবে সকলের বড়ই কষ্ট হইতেছিল। মৃদু মৃদু হাসিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্রী বলিলেন, "মিসেস্ রায়ের সম্মুখে 'বড় গরম পড়িয়াছে, বাপ্‌রে বাপ, জল হয় না কেন' এ সকল কথা বলিবার যো নাই।" অভিযোগ করা তুমি ভালবাসিতে না, তাই এমন বিদ্যাবতী মিস্ থোবর্ণও তোমাকে শুনাইয়া অভিযোগ করিতে সঙ্কুচিতা হইতেন।

লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজে অনেক সময় তুমি প্রার্থনা করিতে। সেখানকার মেয়েরা গান করিতেন। ১৩ই জুলাই সোমবার ডায়রীতে লিখিয়াছ—"কাল ভুবন বাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম। সুসার ॥৵০ আনা দিয়া সরোর জন্য ৬টা আম কিনিতে বলিলেন। আমি স্বীকার পাইলাম এবং আম কিনিয়া সমাজে গেলাম, মূল্য ফিরে রবিবার দিবার কথা রহিল। পথে যাইতে যাইতে এবং সমাজে উপাসনার সময় বিবেক এত ব্যস্ত করিয়া তুলিল, যে কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। অবশেষে বলিলাম, 'আচ্ছা আমি লইব না', তখন বিবেক আমাকে উপাসনা করিতে দিল।" ঋণের এত বিরোধী ছিলে যে, বিবেক তোমার উপাসনা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল!

এক দিন মিস্ থোবর্ণ একটী টী-পার্টি দিয়াছিলেন। তাহাতে তোমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আহারাদির পর মেয়েরা বলিল, যে টী-পার্টির কোনও খাদ্য বস্তুতে গোমাংস ছিল। অজ্ঞাতসারে এরূপ অনভ্যস্ত বস্তু আহার করিয়াছ জানিয়াও তুমি আপনাকে সম্বরণ করিলে ও বলিলে, "তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

৯ই আগষ্ট ১৮৯১ সাল, বাঁকিপুরে সুবোধের একটু জটিল রকমের জ্বর হয়। সেই রাত্রে তুমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলে; তবে পরিষ্কার বুঝিতে পার নাই যে কাহার অসুখ করিল। সেই দিনকার রাত্রে তোমায় সংবাদ দিলাম। তুমি ডায়রীতে লিখিলে, "কাল

সুবোধের জ্বরের কথা শুনিয়া নির্ভর আরও বাড়িয়া গেল।" তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলাম, তুমিও প্রস্তুত রহিলে। ১০ই বৈকালে বাঁকিপুরের চিকিৎসকগণ টেলিগ্রাফ করিয়া তোমাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। রাত্রে উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রী হইতে একেবারে ৯৭ ডিগ্রীতে দাঁড়াইল। ভাবনা হইল, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিলাম। শেষ রাত্রে সুবোধের জ্ঞান হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুবোধ, তোমার কি মাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়? তাঁহাকে কি তার দিয়া আনাইব?" একটু হাসিয়া মাতার অনুরূপ ধৈর্য্যের পরিচয় দিলেন; বলিলেন, "না; অনেক ক্ষতি হইবে।" তোমার ১২ই আগষ্টের দৈনিকে তুমি লিখিয়া রাখিয়াছ, "মা আমাকে আরও নিশ্চিন্ত কর; চিন্তা করিতে আমাকে একটুও সময় দিও না। এখন রাত্রি আটটা; সুবোধের অসুখের কথা মনে হইয়া একটু মন কেমন হইল" এই "একটু মন কেমন হইল" কথার মধ্যে যে কত বীরত্ব লুক্কায়িত আছে, তাহা যে তোমাকে জানিত, সেই বুঝিতে পারিত। সরোজিনী যখন মুমূর্ষু, তখনও তোমার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলে, এবারও দিলে। তুমি যে কাঁদিতে জান, তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। মনের ভিতর যে ভয়ানক তোলপাড় হইতেছিল, তাহা তোমার ১৩ই আগষ্টের দৈনিক পড়িলে বুঝিতে পারা যায়—"মা, তোমাতে আমাকে জীবিত রাখ, নইলে এ পরীক্ষায় কেমনে উত্তীর্ণ হইব? দিন দিন যে পরীক্ষা ঘন করিতেছ। কৃপা করিয়া মনে বল দান কর।" এমন পরীক্ষার মধ্যেও আমাকে সাবধান করিতে ভুলিলে না। বলিলে, "এ সময় লোকে কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, তুমি যেন ভুলিও না।" ডাক্তার বাবুরা বলিলেন, "মায়ের মতন কেহই যত্ন করিতে পারে না, মাকে আনাও।" তুমি ১৪ই দৈনিকে লিখিলে, "মা, তোমার মত যত্ন আর কেহই তো করিতে পারে না। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সেই যত্ন শেখাও।—সুবোধের অসুখের সংবাদে মার কোলে লুকাইলাম;

বড়ই আরাম।—১১টায় স্কুলে সুবোধের সুস্থ সংবাদ পাইলাম। বাটী আসিয়া আহারের পূর্ব্বে আবার উপাসনা করিলাম। মাও হাসিয়া কুটি কুটি, আমিও খুব হাসিলাম।" তৎপর পরদিবসে শুনিলে সুবোধের অসুখ বাড়িয়াছে, মনটা কিছু চঞ্চল হইল, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে খাঁটী বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। মানুষ মাত্রেই এইরূপে পরীক্ষিত হয়। তাহা না হইলে নরশ্রেষ্ঠ আদর্শ সন্তান কেন বলিবেন, "পিতা, পিতা, আমাকে ছাড়িলে কেন?" পিতা যে শুধু নিজের মুখ মাঝে মাঝে লুকাইয়া ফেলেন তাহা নয়; জীবের মঙ্গল হইবে বলিয়া আত্মীয় স্বজন-দিগকেও মাঝে মাঝে লুক্কায়িত করেন। সুবোধের সুস্থ সংবাদ পাইলে ১৮ই আগষ্ট মঙ্গলবারে; বুধবারে মিস্ থোবর্ণ পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। তিনিই সেখানে মানুষের মধ্যে তোমার একমাত্র আশ্রয়, বন্ধু ও নির্ভরের স্থান ছিলেন। তুমি বলিলে, "মেমের উপর একটু নির্ভর করিয়াছিলাম, তাই মা আর সইতে পারিলেন না, সরাইয়া লইলেন। বেশ, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

কয়েক দিন পরে আমার পেটের অসুখ হইয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া তুমি বলিলে, "মা এ কি রকম বার বার?" মা বলিলেন, "আমি আছি, ভয় কি? ভাবনা কি? তুমি আপনার কাজ করিয়া যাও।" তুমি অমনি ভাল মেয়ের মত তথাস্তু বলিয়া পড়িতে বসিলে; আর একটী বারও ভাবনা আসিল না।

প্রবোধের পত্নী বাঁকিপুরে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সন্তানদিগের ভার লইয়াছিলেন। তিনিও এ সময়ে দারুণ ক্ষয়কাশে শয্যাশায়ী হইলেন; তোমার মনে ভাবনা হইল, কিন্তু "শির্ দিয়া তো রোনা ক্যা?" এই বলিয়া ধৈর্য্যধারণ করিলে। দিন কম, কাজ বেশী, শিখিতে হইবে অনেক, মা তাই আর অবকাশ দিলেন না। তুমিও তোমার কর্ত্তব্য ভুলিলে না।

২৮শে আগষ্ট বর্ষাকাল, সেই বিদেশে তোমার পেটের অসুখ

হইল। অত্যন্ত যাতনা হইতে লাগিল, তবুও কর্ত্তব্য ভুলিলে না। বিদ্যালয়ের পাঠ দিয়া নিজ কক্ষে আসিলে। শয্যায় শয়ন করিলে, আরাম হইল না, বেড়ান যেন ভাল বোধ হইতে লাগিল। একটু জল পান করিলে তাহাতে আরাম হইয়াছে বোধ হইল, কিন্তু গেল না। তারপর উপবেশন করিলে। আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিলে, 'এখনই যদি আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে দেহত্যাগ করিতে কি প্রস্তুত'? কাহারও জন্য কোন আসক্তি আছে কিনা? মন বলিল, 'কোনও আসক্তি নাই, এখনই প্রয়াণ করিতে প্রস্তুত। অমনি বেদনা কমিতে লাগিল, ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সমুদয় বেদনা পলায়ন করিল। তার পরেই স্নান এবং দ্বিতীয় বারের উপাসনা। তখন তোমার অবস্থা দেখিয়া যত মা হাসেন ততই তুমি হাসিলে। হাসির সঙ্গী আমি, আমাকেও হাস্যের অংশ দিলে; আমিও হাসিলাম। এমন দিন ছিল যখন স্বামী-সর্ব্বস্ব অঘোর অল্পেই কাতর হইয়া পড়িতেন; কত আবদার করিতেন; কাহারও সেবা ভাল লাগিত না; একটু সামান্য মাথা ধরিলে স্বামীর আদর ভিন্ন মন উঠিত না। আজ তাঁহার এ দশা কেন হইল, কেমনে হইল? সকলই ভগবৎ কৃপা। আমি যাহার জন্য কাঁদিয়াছি, তাহাই তুমি পাইলে। অনাসক্ত হইয়া পরম ধামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে।

মিস্ থোবর্ণের পাহাড়ে যাত্রার পর নূতন একজন কর্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তোমার ভয় হইয়াছিল, না জানি নূতন কর্ত্রী কেমন ব্যবহার করিবেন। যাঁহার কৃপায় মিস্ থোবর্ণ বন্ধু হইয়াছিলেন, তাঁহারই কৃপায় নূতন কর্ত্রীও তোমার পরম বন্ধু ও সহায় হইলেন। এমন কি রবিবারে তুমি পত্র লিখিতে না, সে বিষয়ও অনুসন্ধান করিলেন, এবং রবিবারেও পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তুমি স্ত্রী-হাসপাতাল দেখিতে চাহিলে, অমনি অনুমতি দিলেন। শুধু তাহা নয়, মিস্ ডাক্তারকে পত্র লিখিলেন, যেন তোমার

প্রতি যত্নের ত্রুটি না হয়। ইনি তোমাকে এমন ভালবাসিতে লাগিলেন যে, তোমাকে নিজের জীবনের কথা সব বলিতেন। একদিন খাবার ঘরে মেয়েদের একটি মিটিং হইয়াছিল। সকলের সম্মুখে তিনি তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন। তুমি ব্রাহ্ম, তিনি খ্রীষ্টান, মেয়েরাও অধিকাংশ খ্রীষ্টান, তবু তোমাকে এই অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, যে সকল মেয়েরা কিছু দোষ করেন, তাঁহাদের নিকট মিসেস্ রায় মধ্যে মধ্যে উপদেশ দেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। তুমি এই উচ্চ আদেশ শ্রবণ করিয়া অবাক হইলে! মায়ের লীলা অনুভব করিলে। মেয়েরা তোমাকে বড়ই আদর করিলেন। পরদিন প্রাতে কর্ত্রী আবার বলিলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন যে তুমি মেয়েদের ধর্ম্মোপদেশ দিলে তাঁহাদের উপকার হইবে। তুমি বলিলে, তাঁহারা যেমন ছাত্রী, তুমিও তেমনি ছাত্রী, উপদেশ কি দিবে? তিনি বলিলেন, "না, মেয়েরা তোমায় ভয় করে, এবং ভালবাসে। তুমি মধ্যে মধ্যে একবার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলেও অনেক উপকার হইবে।" এই সময় তোমার যে শক্তির পূর্ব্বাভাস পাওয়া গেল, পরজীবনে তাহার আরও বিকাশ হইয়াছিল। অধীনস্থ কোনও লোককে কিছু বলিতে হইলে এমনি করিয়া বলিতে, যে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিত না। আর একদিন ঐ কর্ত্রী তোমার সঙ্গে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছিলেন। তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি বড় প্রীত হইলেন ও স্বীকার করিলেন, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মে বিচ্ছিন্নতা অল্পই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ পত্রত্যাগ

আমি দেখিয়াছি, তুমি দেখিয়াছ, যে পৃথিবীর ভালবাসা ক্ষণস্থায়ী; শরীর না থাকিলে কিছুদিন পরে উড়িয়া যায়। তাই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, শরীরের উপর ভালবাসার ভিত্তি স্থাপন করিব না। প্রথম বয়সে এ ভুল করিয়াছিলাম, তুমিও করিয়াছিলে; তাই চক্ষুর আড়াল হইলেই চক্ষের জলে পথ দেখিতে পাইতাম না; আবার নানা কার্য্যের মধ্যে সে জল আর থাকিত না। এ অট্টালিকা পাকা নয়; কোন দিন অল্প ঝড়েই পড়িয়া যাইতে পারে, তাই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দু'জনে পরামর্শ করিয়া এই অট্টালিকা ভাঙ্গিতে লাগিলাম। রূপের আকর্ষণ ছাড়িলাম, পরস্পরের প্রতি চরিত্র ও সদ্‌গুণের জন্য যে শ্রদ্ধা তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু দেখিলাম, শরীরের ভোগ থাকিলে গুণের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। তাই শরীরের ভোগ ছাড়িতে হইল। তখনও স্পর্শ-সুখ রহিল। সে অবস্থায় প্রথম প্রথম মনে হইত এইতো স্বর্গে আছি। কিছুকাল পরেই বুঝিলাম এ স্পর্শসুখও বন্ধন। তখন কি প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাতো জানই। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তুমিও পারিলে, আমাকেও সাহায্য করিলে। তোমার গুণ বুঝিলাম। ভাবিলাম, এইবার যদি শরীরের মৃত্যু হয়! দর্শন সুখ তখনও রহিল। রাজগৃহে কি দর্শনই হইয়াছিল! আপনার স্ত্রীকে সকলেই দেখিতে ভালবাসে, কিন্তু দেবীরূপ ক'জনে দেখিতে পায়? মস্তক মুণ্ডন ও গৈরিক পরিধান দেখিয়া স্বর্গের দেবকন্যা বলিয়া যখন ভ্রম হইতেছিল, তখন দর্শন সুখের উচ্চ সীমা দেখিতেছিলাম। কিন্তু ইহাও শক্ত জমি নয়। এ দেশের মাটী ও বালি মিশ্রিত "বলথর" জমির মত, ইহাও ভিত্তি স্থাপনের অনুপযুক্ত। ঈশ্বর তাই দর্শনসুখেও আমাদের বঞ্চিত করিলেন।

এখন তুমি আমি দূরে দূরে; চক্ষের দর্শনও নাই; কণ্ঠস্বর শুনি না। এ অবস্থা হইতে পরলোকের বেশী কি প্রভেদ? কিন্তু এখনও যে একটী সুখ বাকি রহিয়াছে। পরলোকে গেলে কেহ কখনও তো পত্র লেখে না! আমাদের এ স্বকৃত-পরলোকে এখনও তো পত্র লেখা চলিতেছে। দেখিলাম, অনেক দিন ধরিয়া কেবল পত্রাসক্তিতে সুখ সম্ভোগ করিতেছি; পাগলের মত পত্রের প্রতীক্ষা করিতাম। একবার, দুইবার কতবারই পত্র পড়ি; কত কথাই লিখি; কত পরামর্শ দিই, কত আশ্বাস বচন বলি; কত লোককে তোমার পত্রগুলি পড়িয়া শোনাই। এমন সময়ে একবার, ডাকের গোলমালে পত্র পাইতে দেরী হইল। এইবার বুঝিলাম, এ ভূমিটাও ছাড়িতে হইবে। পত্র লেখা বন্ধ করিয়া দেখিতে হইবে, পত্রের উপরে উঠিতে পারিয়াছি কি না। এত পারিয়াছি, ইহা কি পারিব না? জীবন-দেবতার নিকট হইতে আবার ত্যাগের আহ্বান আসিল। আবার অঘোর প্রকাশ বলিলেন, "প্রস্তুত!" ১৯শে সেপ্টেম্বর আমি পত্র বন্ধ করার প্রস্তাব করিয়া তোমাকে চিঠি লিখিলাম; তুমি ২০শে সে চিঠি পাইলে।

আমি যে সময়ে এইরূপ পত্র বন্ধ করিবার প্রেরণা মনে পাইয়াছিলাম, ও সে প্রেরণার অধীন হইতে সংগ্রাম করিতেছিলাম, সে সময়ে তোমার মনে কি ভাব চলিতেছিল, তাহা তোমার ঐ তারিখের লিখিত পত্রে জানা যায়। তুমি লিখিলে, "আজ তোমার পত্র এখনো পাই নাই। পাইব কি না জানি না। পাই বা না পাই, আমি তোমাকে এখনই দেখিতেছি। এমন সুবিধা তো আর নাই। বড় ভাল পথে আমাকে আনিয়াছ। আমার বড়ই সাধ ছিল কি না, যে তোমা হইতে দূরে কোন দিন থাকিব না; মা আমার সে প্রাণের প্রার্থনা বুঝি শুনিয়াছিলেন; তাই তোমাকে এই সুন্দর পথে যাইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এখন বেলা ৩টা। হয়তো তুমি রাজকার্য্যে ব্যস্ত। আমি সেই ব্যস্ততার পাশে বসিয়া তোমার সহিত কত কথা

কহিতেছি, ও কত সুখী হইতেছি। মনে হইতেছে যে, তোমার মুখখানি ঘামে লাল হইয়াছে। কেন এমন হইতেছে জানি না। আজ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, দেখিব বলিয়া বসিয়াছি। এই যে তুমি, তুমি তো দূরে নও। পরলোকে গেলেও আমরা এইরূপে মার কোলে একে অন্যকে দেখিব; সেই অভ্যাস মা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া দিতেছেন।"

এই পত্র লিখিবার পরই বুঝি আমার মনের ব্যাকুলতা তোমার মনে গিয়া লাগিল। নতুবা সে দিনের দৈনিকে কেন লিখিলে,—"মা, আমার মন কেন এমন করিতেছে অঘোর-প্রকাশের জন্য? তুমিই জান।" দেবি, আকুল হইবে, ইহা আশ্চর্য্য কি? দু'জনই আকুল হইতেছিলাম দু'জনাই মানুষ; দু'জনাই দেবজীবন পাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছিলাম; মানবত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব তো একদিনে আসে না। তাই আমি তোমার কাছে পত্র বন্ধ করার প্রস্তাব করিয়া, তারপর লিখিয়াছিলাম—"আমার তো বড় শক্ত বোধ হইতেছে। তোমার সাহায্য ভিন্ন কোন কাজই তো পারি না; সে কথা তো তুমি জান। যদি কেহ বলে, এত মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আবার এ কি কথা, তবে বলি, তোমার তো কিছু অজানা নাই। সে সকল সংগ্রামে কত পরিমাণে তোমার সহায়তা পাইয়াছিলাম, তাহা তুমি জান, আমি জানি, আর অন্তর্যামী জানেন। আগামী মঙ্গলবার ২২শে তারিখে আমি বেহার যাইব। পত্র লেখা না লেখা তোমার হাতে রহিল।"

যখন আমি এই পত্রখানি লিখিতেছিলাম, তখনই হয় তো তোমারও মন আকুল হইতেছিল। ২০শে এই পত্র পাইয়া তোমার মনের ভাব কি হইয়াছিল, তাহা তোমার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছ। ডায়েরীতে যাহা কিছু লিখিতে আমার সঙ্গে আলাপের আকারে লিখিতে। "বাটীতে আসিয়া তোমার ১৯শে তারিখের পত্রখানি পাইলাম। পাঠ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া গেলাম।

কেন এত চক্ষের জল, জানি না; বুঝি আসক্তিতে টান পড়িল বলিয়া। পত্রের যে এত আসক্তি আছে তাহা জানিতাম না। কোনও রকমে অনেকবার পড়িলাম। পড়িতে বড় ভাল লাগিল। পরে স্নান করিতে গেলাম; আজকাল স্নান বড় ভাল হইল। চক্ষের জলের সহিত স্নান করিলাম। যতবার আসক্তিতে বাধা লাগিয়াছে, ততবারই এইরূপে চক্ষের জলে স্নান করিতে হইয়াছে। আজও তাহা হইল। পরে আবার উপাসনায় গেলাম, প্রার্থনা বড় ভাল হইল। চক্ষের যেন বড় দরদ; সে খুব জল ঢালিতে লাগিল। উপাসনা হইতে উঠিয়া তোমাকে ডাকে পত্র লিখিলাম। কত চক্ষের জল যে পড়িল! অনেক সময় ঐ জলে লেখা নষ্ট করিল। সে কথা তোমাকে প্রাণে প্রাণে বলিলাম, কিন্তু লিখিলাম না; আমার চক্ষের জল দেখিলে পাছে তোমার ব্রত ভঙ্গ হয়, এই ভয়। পরে আহার করিলাম। আহারের পর আবার পত্র লিখিলাম। ৩টা পর্য্যন্ত লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় নাই বলিয়া পারিলাম না। আজ পত্রখানি যাওয়া চাই, নহিলে তুমি যথা সময়ে পাইবে না, বাহিরে চলিয়া যাইবে। ৩টার ১০ মিনিট আগে কুঠিতে গেলাম। পত্র লিখিতে লিখিতে চক্ষের জল শুকাইয়া গেল, যেন অন্ধকারের পর আশার প্রদীপ হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। কুঠিতে গিয়া দেখি, কেহ কোথাও নাই। Hall room এ একাকী বসিয়া মার কোলে তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ৩টা বাজিল, অমনি কর্ত্রী বাহিরে আসিলেন। পত্রখানি তাঁহার হাতে দিয়া Meetingএ গেলাম। যাহা শুনিতে লাগিলাম সকলের ভিতরেই তোমাকে মনে হইতে লাগিল। সকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত ৩ মিনিটের জন্যও তুমি আমার হৃদয় হইতে দূরে থাক নাই। বাটী আসিয়া কিছু কাজ করিলাম ও পাঠ করিলাম। কিন্তু হৃদয় কেমন উদাস হইয়া গিয়াছে। বার বার বলের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এইরূপে ৬টা বাজিল। আজ রবিবার, সমাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; ৭টা

বাজিতে চলিল, গাড়ী আসিল না। এই ৬ মাস ২০-দিনের মধ্যে আজ কেবল সমাজে যাইতে পারিলাম না। কি করিব? এখানে আমি অধীন, নিজে কিছু করিবার যো নাই। চুপ করিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিল, তাই খানিকক্ষণ বেড়াইয়া, যেমন ৭টা বাজিল, অমনি মেয়েদের ডাকিয়া লইয়া নিজের ঘরেই উপাসনায় বসিলাম। কি মধুর যে উপাসনা হইল, বলিতে পারি না। বোধ হয় সকলেরই ভাল লাগিল। প্রার্থনা হইল,—'মা, তুমি যাহা দিবে তাহা যেন বহন করিতে পারি; কেবল এই ভিক্ষা চাই, অঘোর-প্রকাশের হৃদয় হইতে ঐ পাদপদ্ম এক মিনিটের জন্যও সরাইও না; তবেই তোমার সন্তানের সাধ পূর্ণ হইবে। আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সন্তানের এই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

আমাকে ডাকে যে পত্র লিখিয়াছিলে তাহার কিয়দংশ এই— "১৯শের পত্রখানি পাঠ করিয়া যে কি মনে হইল তাহা আর বলিতে হইবে না। তোমরাও যে দশা আমারও তাই। পত্র পাঠ করিয়া নাইতে গেলাম। প্রাণ ভরিয়া মার কাছে প্রার্থনা করিলাম, বলের জন্য। প্রকাশ, আমি তোমার অপেক্ষা আরও দুর্ব্বল তাকি জান না? অঘোর-প্রকাশ কি পারিবে? কি জান? ভয়ে যে প্রাণ কাঁপিতেছে—আশা আমার মা, আর আমার চিরসঙ্গী। আজ বিশেষ আশীর্ব্বাদ কর। আর তো পত্র লিখিবে না; না লিখিলে, তাতে কি? হৃদয়ের তারে খবর পাইব। সেই তার আমার জন্য আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আনিবে। ভয় কি প্রকাশ? এখন যে আমরা দু'য়ে এক; আমরা দু'টি এক হইয়াছি বলিয়া মা আমাদের এত কঠিন হইতে কঠিন পরীক্ষায় ফেলিতেছেন। ফেলুন, দুঃখ নাই, ভয় যেন না পাই; 'পারিব না' যেন না বলি। কিসের ভয়? প্রাণের আলাপ তো কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না; যে ভাবে যেখানে থাকিব সেইখানেই আমরা একত্র থাকিব। পত্র ডাকঘরে দেরী করিত, এখন ভালই হইল, যখন তখন দুই জনে বসিয়া কত গল্প করিব, কত আলাপ

করিব। ভোর ৪টা হইতে ৫টা দুই জনে বসিয়া নাম করিব। সমস্ত দিন নানান্ কার্য্যের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া দু'জন দু'জনকে দেখিব আর কত সুখী হইব। আবার সন্ধ্যা ৬টার সময়ে দু'জনে মার কাছে বসিয়া মার কথা বলিব।"

পত্র লেখা বন্ধ হইল, তুমি আপনার মনের ভাব দৈনিক পুস্তকে লিখিতে লাগিলে আমিও আমার খাতায় লিখিতাম, কিন্তু ডাকে দেওয়া হইত না। তুমি লিখিলে, "কত দিন তুমি পত্র লিখিবে না, তাহা আমাকে বলিও না। আমিও যে কত দিন লিখিব না তাহাও বলিব না; কিন্তু কোন বিষয় তিক্তরূপে করিতে তোমারও ইচ্ছা নয়, আমারও ইচ্ছা নয়, মারও ইচ্ছা নয়, যখন ইচ্ছা হইবে, মন সায় দিবে বিবেক সায় দিবে, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি পত্র লিখিতে পার, আমিও পারি। সে কবে, কখন, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। দেখ, মা এ আবার কি লীলা আরম্ভ করিলেন। যাই করুন, চরণ তো কাড়িয়া লইতে পারিবেন না।"

এ সংগ্রামের মধ্যেও নিজের কর্ত্তব্য ভুলিলে না। ১১টার সময় বিদ্যালয় হইতে ফিরিলে; ঘরে আসিয়া আগুন জ্বালিলে, ঘর ঠিক করিলে; জল গরম হইলে স্নান করিলে। যোগযুক্ত স্নান হইল। সমস্ত কাজ কর্ম্ম পাঠ সকলের ভিতর এ দাস মিশিয়া গেল। সর্ব্বদাই যেন তোমার চক্ষের উপর রহিল। স্নানের পর আমার জন্যও প্রার্থনা করিলে। দিল-দরদী কি না, তাই আমার দরদ যাহাতে যায় পিতার নিকট সে জন্য নিবেদন করিলে। যখন উপাসনা করিতেছিলে, দিব্য চক্ষে আমাকেও উপাসনা করিতে দেখিলে। দু'জনার চক্ষের জল এক হইয়া মায়ের পদ ধৌত করিল। মা যে দিন স্পর্শসুখ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সে দিনও ঐরূপ মিলিত অশ্রুতে মাতৃপূজা হইয়াছিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ : পত্রত্যাগের একমাস

২২শের দৈনিক লিখিয়াছ,—এখন প্রাতঃকাল ৫টা। ভোর ৩টার সময় যেন কে ডাকিয়া উঠাইল। আজ তুমি বিদেশে যাবে কিনা, তাই একত্র উপাসনা করিবার জন্য মা ডাকিলেন। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এখানে কেহই নাই, কে ডাকিল? নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ৩৷টা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিলাম ও তোমার সহিত মনে মনে কত কথা কহিতে লাগিলাম। ৩৷টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত তোমার সহিত নাম করিলাম। তার পর উপাসনায় বসিলাম। ৫টার সময় উপাসনা হইতে উঠিয়া এই দৈনিক লিখিতেছি। আজ নিদ্রা ভঙ্গ হইতে না হইতে মা বলিলেন, 'দেখ, একগাছি সূত্রে তোমরা বাঁধা, যখন ইচ্ছা করিবে তখনই এই সূত্র ধরিয়া টানিও, অমনি দেখিবে তোমার প্রিয়-জন তোমার নিকটে আসিবেন।' এই আশার কথা শুনিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিতে লাগিল। কালকার অপেক্ষা আজ মন খুব ভাল। এই যে তুমি মফঃস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত, আমিও তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য স্কুলে যাইতে প্রস্তুত। দেখিতে অনেক দূর, কিন্তু এই যে তুমি আমার নিকটে। ত্যাগে যে যোগ বাড়ে, তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাইতেছি। যেন তুমি আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গেলে। আর চিন্তা করিয়া তোমাকে মনে করিতে হইতেছে না; আমার প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত যেন মার কোলে তোমাকে আমার বুকের ভিতর দেখিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে যেন দেখা সহজ হইয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্য! সেই জননীকে ধন্যবাদ দি। তুমিও যাইবার জন্য প্রস্তুত হও; একত্রই যাইব, ভয় কি? প্রকাশ, ভাবিও না, এই যে ঘোরী তোমার মার কোলে। তোমাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি। কত দূরে যাইবে যাও, কিন্তু হৃদয় ছেড়ে যাইতে পারিবে না।

"৫টার সময় কুঠিতে গেলাম। নূতন কর্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পত্র নাই কেন?' কালও পত্র চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলাম 'দিব না'। আজ বলিলাম, 'তিনি বাহিরে গিয়াছেন'। তিনি বলিলেন, 'Mr. Ray খুব ভাল ব্রাহ্ম; না?' আমি বলিলাম, 'আমি কি বলিব?' তিনি বলিলেন, 'কত কষ্ট হইতেছে, তবুও তোমাকে এতদূরে পাঠাইয়াছেন।' আমি বলিলাম, 'সংসারের কষ্ট না নিলে ভগবানের পথে চলা যায় না।' তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। ক্রমশঃ পরীক্ষা সহজ হইয়া আসিতেছে, আসক্তি প্রায় হারিল, তাহার আর জোর নাই। মন প্রায় শান্ত হইয়া আসিল। আহার, বিহার, উপাসনা, শয়ন যখন যাহা করিতেছি, মনে হইতেছে তুমিও যেন তাই করিতেছ। একটু তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। মার কৃপায় আর একটু অগ্রসর হইতে পারিলেই তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। মনে হইতেছে আমার অপেক্ষা তোমার কষ্ট বেশী হইতেছে। এমন কেন মনে হইতেছে জানি না। তোমার পরীক্ষা বেশী মনে হয়।

"আজ পড়া বেশ হইল, কিন্তু নির্জ্জন ভাল লাগিতেছে। পূর্ব্বে এইরূপ কোনও পরীক্ষার সময় আরাম আহার বিহার কিছুই কয়েক দিন ভাল লাগিত না। এবার আর তাহা নাই। সকল বিষয় ঠিক সমভাবে চলিতেছে। আজ শরীরটা ও মনটা বড়ই দুর্ব্বল বোধ হইতেছে। একটু আগে পেটে একরকম বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। শয়ন করিতে পারিতেছিলাম না। দেখিতে দেখিতে বেদনা বড় কষ্টকর হইয়া উঠিল। অমনি বলিলাম, 'মা, প্রকাশ, আমি প্রস্তুত—যদি এখনই যাইতে হয়।' চুপ করিয়া মাকে ও তোমাকে দেখিবার জন্য বসিয়া রহিলাম। মেয়ে তিনটির মুখ শুখাইয়া গেল। কোনও শব্দ করি নাই, কিছু বলিও নাই। শয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু পারিতেছিলাম না, ইহা দেখিয়াই তাহারা বুঝিতে পারিল। পরে বলিলাম, আমাকে একটু জল দাও।

জল খাইবামাত্র বেদনা বেশী হইল, মার চরণ আরও ভাল করিয়া ধরিলাম, ও মার কোলে লুকাইয়া গেলাম। দেখিতে দেখিতে বেদনা কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় ১৫ মিনিটে কিংবা তাহারও কম সময় ছিল; এখন আর কিছুই নাই। এ বেদনা আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু মার কোল আমাকে প্রত্যেক-বার বাঁচাইতেছে। প্রকাশ, এ তোমার সাধনার ফল।"

এ অবস্থায় তোমার আর এক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তোমাদের বিদ্যালয়ের নূতন কর্ত্রীর সহিত তোমার ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে আবার ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে তিনি বলিলেন, যে যদি তুমি খ্রীষ্টান হও, তাহা হইলে তিনি বড় সুখী হয়েন। তুমি বলিলে, "ঈশাকে আমরা ঈশ্বর-পুত্র বলি, কিন্তু ঈশ্বর বলি না। আপনারা কোন দরকার হইলে ঈশার নিকট যান, আমরা ঈশ্বরের নিকট যাই। তিনি বলিলেন, "আমরা কখনও ঈশার নিকট, কখনও ঈশ্বরের নিকট যাই।" এইরূপ অনেক কথা হইল। বেশী কথা ভাল নয় বলিয়া তুমি চুপ করিলে। তোমার মন ভীত হইল, মনে অনেক প্রকার আন্দোলন চলিল। বিশেষতঃ তুমি একাকিনী, আমার সঙ্গে পত্রও বন্ধ। তুমি প্রার্থনা করিলে, মায়ের হাতে সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে এবং আপনাকে শান্ত করিলে।

২৩শে, ২৪শে, দুদিন ক্রমে তোমার মন আরও শান্ত হইয়া আসিল। ২৪শে সেপ্টেম্বর ইংরাজী তৃতীয় পুস্তক শেষ করিলে। ২৫শে তোমার মন আরও ভাল ছিল। প্রাতে উঠিবামাত্র তোমার মনের যে টুকু শূন্যতা ছিল তাহাও যেন পূর্ণ হইল। আত্মার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও যেন আজ আমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে লাগিল, পুলকিত হইতে লাগিল। এই দিন বেলা ৪টার সময় মিস্ থোবর্ণ পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তুমি দেখা করিতে গেলে; তিনি বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ভাল আছ? তোমার

সন্তানেরা ভালত ?" বিদুষী ঈশ্বর-কন্যার এই আদরে তোমার চক্ষে জল আসিল, মাকে ধন্যবাদ দিলে। এইদিন শুক্রবার ছিল। শুক্রবার অনেকে বাটী যায়; যাদের বাড়ী দূরে তাহারা শনিবার আত্মীয় স্বজনকে পত্র লিখে। তোমার মনে হইল, সুবোধকে পত্র লিখিলে কিরূপ হয় ? তাহা হইলে আমিও তোমার সংবাদ পাই। কিন্তু তাহা করিতে কিছুতেই তোমার মন সায় দিল না।

১৯শে সেপ্টেম্বর পত্র বন্ধ করার প্রস্তাব করিয়া তোমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহার এক অংশে এই কথা ছিল—"পত্র লেখা ছাড়িলে কি উপায়ে ভাল বাসিব ও বাসিবে ?—মনে ও ভাবে। মনের এক শক্তি আছে তাহা দ্বারা সে দেশ কালকে অতিক্রম করিতে পারে; সাধু সঙ্গ করিয়া সুখী হইতে পারে। এই করিয়া আচার্য্য ঈশা-তীর্থ যাত্রা, মুসা-তীর্থ যাত্রা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেটাও আন্দাজী ; তীর্থযাত্রার ফল হইল কিনা, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু আমি যদি অঘোর-তীর্থে যাত্রা করি আর তুমি যদি প্রকাশ-তীর্থে যাত্রা করিতে পার, তাহা হইলে প্রমাণ হইবে, যে তীর্থযাত্রা সম্ভব। তুমি তোমার ভাবগুলি ডায়েরিতে লিখিবে, আমি আমার ভাবগুলি লিখিব ; তারপর যদি সেই ভাবগুলি মিলিয়া যায়, তাহা হইলে একটী ভয়ানক সন্দেহ দূর করিয়া যাইতে পারিব।" এই কথা অনুসারে তুমি তোমার দৈনিক পুস্তকে নিজের প্রতিদিনের ঘটনা লিখিতে। আমিও প্রতিদিনের ঘটনা লিখিতাম ; সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস তোমাকে সম্বোধন করিয়া লিখিতে লাগিলাম।

২৮শে সেপ্টেম্বর তুমি দিব্য চক্ষে দেখিয়া লিখিলে, আমি বাঁকীপুরে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি দৈনিক খুলিয়া দেখি, যথার্থই আমি বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহা কিরূপে বুঝিলে ? ঐ দিন তোমার শরীর বিশেষ অসুস্থ হইল, কিন্তু যন্ত্রণা বৃদ্ধির সঙ্গে মনে মনে আমাকে সাহস দিয়াছ, আর দৈনিকে লিখিয়াছ, "তুমি ভাবিও না, আমি চির দিনই তোমার। দুঃখ করিও না, মার আর তোমার ইচ্ছা

পালন করিতে করিতে গেলাম। এ আমার বড় সুখের যাওয়া ; আমি বড় সুখী। আমার দুঃখ আসিল না। তোমার সঙ্গে একত্র হইয়া, তোমাকে বিবাহ* করিয়া ইহকাল ও পরকালে সুখী হইলাম। তবে আর কেন দুঃখ করিবে? এ সকল কথা আজ কেন মনে হইতেছে, তুমি জান, আর মা জানেন। যা মনে উঠিল, প্রতিদিনকার মনের কথা লিখিয়া রাখিলাম। তুমি পড়িও, আর জগৎকে বলিও, যে একজনকে চিরসুখী করিয়া মার নিকট পাঠাইয়া দিলে। সরোজিনীর শরীর খুব খারাপ বোধ হইতেছে, নিজেরও মাথায় একটা কি বেদনা, ইত্যাদি ভাবিয়া একবার মনে হইতেছিল, ফিরিয়া যাইবার জন্য তোমাকে বলি। কিন্তু অমনি চেতনা হইল। ভাবিলাম, মা আমার তো নিদ্রিত নন; তিনি সকলি জানিতেছেন। যা যখন প্রয়োজন, নিশ্চয় করিবেন। এই ভাবিয়া মনকে বুঝাইলাম।"

ঐদিন শেষ রাত্রে ঘড়ি দেখিতে গেলে, দেখিলে ঘড়ি খারাপ হইয়া গিয়াছে। নিকটে থাকিলে আমিই মেরামত করিয়া দিতাম। সে ভার আমার, কিন্তু তখন আমি থাকিলেও নাই। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে এবং উত্তর পাইলে যে, তখনও কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে গিয়া কিছু ক্লান্ত হওয়াতে সেই খানেই প্রার্থনা করিলে, ও আমার পরিশ্রমের কথা মনে করিয়া পড়া প্রস্তুত করিলে। যখন রাত্রে একটী প্রাণীও জাগিয়া নাই, তোমার শরীর অসুস্থ, তখন আপনার অবস্থা আমাকে দেখাইবার ইচ্ছা হইল, ও আমাকে দেখিবার সাধ হইল। এই সময়ের আমার দৈনিক খুলিয়া দেখি, "সে সময়ে আমারও মনের অবস্থা ঐরূপই হইয়াছিল।" আমিও পরমাত্মার মধ্য দিয়া তোমাকে দেখিতে ছিলাম। আর একদিন শয়ন করিতে যাইবার সময় লিখিয়াছিলে, "এ রজনীতে যদি দুঃখ কষ্ট বিপদ আসে, আমাকে দাও ; সকলের হইয়া আমি বহন করিব।"

*আধ্যাত্মিক বিবাহ।

তখন তুমি লিখিয়াছিলে, "তুই জনের মধ্যে এক জন যখন এ লোকে না থাকিব, তখন অপরের কাজ বন্ধ হইবে না; কেবল এক রকমের অভাববোধ যেন ভিতরে থাকিবে। এখন আমার অবস্থা এই যে, শোকে মূহ্যমান হই না বটে, কাজ কর্ম্ম সবই করিতেছি, কিন্তু আমার প্রিয়জন কখনও কাছে থাকেন, কখনও দেখিতে পাইনা। প্রথম দিন কয়েকের চেয়ে আজকার মন খুব ভাল।" দেবি, তখন তুমি যাহা অনুভব করিয়াছিলে, আজ দেখ আমার তাহাই হইয়াছে। কাজ কর্ম্ম সবই চলিতেছে, কিন্তু একটা অভাব বোধ থাকিতেছে, সদাই মনে পড়ে, তুমি শরীরে থাকিলে আমার এ সকল কার্য্য কেমন ভাল করিয়া করিতে পারিতে।

আমি এই সময়ে তোমাকে সম্বোধন করিয়া আমার পূর্ব্বজীবনের যে ইতিহাস লিখিতেছিলাম, তাহার একখানি খাতা লেখা শেষ হইল। তখন পত্র বন্ধের কয়েক দিন হইয়াছে। তোমার কাছে সে খাতাখানি পাঠাইতে মনে প্রেরণা পাইলাম ও পাঠাইলাম। এই দিনে তোমার মন অত্যন্ত অস্থির হইতেছিল; মনে করিয়াছিলে কি যেন একটা নূতন ঘটিবে; সত্য সত্যই তাহা হইল। এমন করিয়া যে লিখিব, তাহা তুমি জানিতে না, আমিও জানিতাম না। পুস্তক পাইয়া তোমার মনে কিভাব আসিল, তাহা তোমার দৈনিকে লিখিয়াছিলে। "কল্যই বুঝিয়াছিলাম যে, আজ কিছু নূতন লীলা মা করিবেন। আজ তাহাই হইল। ধন্য, ধন্য, শত ধন্যবাদ দি সেই জননীকে। আমার মায়ের নাম যে জয়যুক্ত হইল, আসক্তি যে হারিয়া গেল, তাহাতে যে অঘোর-প্রকাশ কি সুখী হইল, তাহা বলিতে পারি না। কত পরিমাণে যে যোগের পরিচয় দরকার তাহাও বুঝিলাম। এক জনের অভাব হইলে যে আর এক জনকে কিরূপে শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে হইবে, তাহাও বুঝিলাম। বিশ্বাস যে কত পরিমাণে বাড়িল, তাহা বলিতে পারি না। মার সহিত যেন আরও নিকট হইয়াছি, তোমার সহিতও হইয়াছি তাহার আর ভুল নাই। প্রথমে ভয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু মার কৃপায় ও তোমার

আশীর্ব্বাদে সে ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। অঘোর-প্রকাশের জীবন-পুস্তকে লেখা থাকিবে যে মহা ত্যাগেই মহা সুখ। যত ত্যাগ ততই সুখ, ইহার আর ভুল নাই।" এই পুস্তক পাইয়া তোমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে তুমিও পত্র লেখ; কিন্তু মার ইচ্ছা নয় জানিয়া আর লিখিলে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিত যে আমার পুরাতন পত্রগুলি পাঠ কর। কিন্তু প্রাণ সায় দিল না। তাই সেগুলি স্পর্শও করিলে না।

এখন এমন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছ যে পত্র দিলেও হয়, না দিলেও হয়, কোন পরোয়া নাই। পূর্ব্বে এক দিন সংবাদ না পাইলে, খাবার টাকা হইতে কাটিয়া, কম খাইয়া, টেলিগ্রাফ করিতে। আজ তার এ দশা কিরূপে হইল? ব্রহ্মকৃপাবলেই হইল ৬ই অক্টোবর ডায়েরীতে লিখিয়াছিলে, "আজ ১৫ দিন তোমার সংবাদ পাই নাই বটে, কিন্তু মন খুব ভাল। এ কথা এই জন্য বলিলাম, যে আমার মত আসক্ত লোকেও মার কৃপায় এমন সুখ পায়। শ্রদ্ধেয় অমৃতবাবুর বড় সাধ ছিল, যে তোমার নিকটে থাকিলে আমার মুখে যে হাসি থাকে, তোমা হইতে দূরে থাকিলেও যেন আমার মুখে সে হাসি দেখিতে পান। মা তাঁহার ভক্তের সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন।" এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে যখন আমাকে ছাড়িয়া গয়ার উৎসবে ও গাজিপুরের উৎসবে গিয়াছিলে, তখন শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে তোমার মন ভাল করিয়া খুলিতেছে না।

এই সময় তোমার সাহসও বৃদ্ধি পাইতেছিল। প্রতি রবিবার তিনটি মেয়েকে লইয়া সন্ধ্যার সময়ে অযোধ্যা ব্রাহ্মসমাজে যাইতে; ফিরিয়া আসিতে রাত্রি দশটা বাজিত। একা তিনটি বয়স্ক কন্যা লইয়া যাইতে হইত। তুমি একাকী, নূতন সহর, যদি কোন নূতন বিপদ উপস্থিত হয় কে তোমাদের রক্ষক? মা জননী প্রহরী হইয়া যাইতেন, তাই তোমার কোনও ভয় করিত না।

এক দিন সমাজের উপাসনার পর তুমি মেয়েদের লইয়া সৎপ্রসঙ্গ করিতেছিলে, এমন সময়ে ভাই বিহারীলাল ঘোষ ছুটিয়া আসিয়া

বলিলেন, "হেমের মা (তাঁহার পত্নী) আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন।" তখন রাত্রি ৯টা। তুমি ইতস্ততঃ করিতেছিলে। ভাই বিহারীলাল তখন পীড়িতা পত্নীকে লইয়া একজন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গৃহকর্ত্তা ব্রাহ্মদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তুমি ভাবিতে লাগিলে, এমন বাটীতে গৃহকর্ত্তার নিমন্ত্রণ বিনা কিরূপে প্রবেশ করিবে? ভাই বিহারীলাল বলিলেন, 'হয়তো বাঁচিবেন না, একবার দেখিয়া যান।' আর কি তুমি থাকিতে পার? গাড়ী করিয়া চলিলে। সে বাটীর দরজায় যখন গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তখন একবার মাকে ডাকিলে; আর বুঝিলে আমার আত্মা তোমার সঙ্গে রহিয়াছে। বিহারী বাবু আসিয়া উপরে যাইতে বলিলেন, তুমি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে। উঠিবার সময় মুখে মা মা শব্দ করিতে করিতে উঠিলে। গিয়া ভালই করিলে। না গেলে ভগিনীর সে সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাইতে না; তোমার নির্ভয়ের পরিচয়ও দেওয়া হইত না। এই গৃহস্বামী লৌকিকভাবে তোমার অপরিচিত, তাহাতে আবার তিনি কোনও ব্রাহ্মকে বাটীতে আসিতে দিতেন না। কিন্তু যে মাকে চিনিয়াছে, তাহার কাছে সকল স্থান, সকল জীবই পরিচিত। তুমি গিয়া দেখিলে ভগিনীর দেহ অস্থিচর্ম্মসার। তুমি অতি সন্তর্পণে গলা ধরিয়া চুম্বন করিলে। তিনি বলিলেন, "মনে আছে তো?" তুমি বলিলে, "আর কি ভুলিতে পারি?" বুকের বেদনায় তিনি কথা কহিতে পারিতেছিলেন না; রোগের নানারূপ যন্ত্রণা এবং জ্বর; কিন্তু যতক্ষণ তুমি রহিলে, সেই মুখের হাসিতে শরীর আলো করিয়া রাখিয়াছিল। রোগের মধ্যে এমন হাসি দেখিয়া তুমি চমৎকৃত হইলে। ভগিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হয় ত আর বাঁচিব না।" তুমি প্রতিবাদ করিলে, এবং রাজগৃহে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলে। তাহাতে তিনি সুখী হইলেন। এই অবকাশে মায়ের কথাও অনেক বলিলে। নিকটে বসিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী গৃহস্বামিনী সকল কথা শুনিলেন, ও বলিলেন, "আপনি আসিবেন

বলিয়া আপনার প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলাম। আবার রবিবারে আসিবেন, মেয়েদের সঙ্গে লইয়া আসিবেন।” তাঁহার এই অভ্যর্থনা ও আদর পাইয়া প্রেমময়ী মাতাকে বারবার ধন্যবাদ দিলে। ইহার পর হইতে আর অপরিচিত লোকের বাটীতে যাইতে ভয় পাইতে না।

৫ই অক্টোবর তুমি একটি বক্তৃতাতে নিমন্ত্রিত হইলে। একজন পারসী স্ত্রীলোক হিন্দীতে বক্তৃতা দিবেন; তুমি যাইবে কি না এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে। অমনি ভগবান বুঝাইয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য উপায়! কত সহজ! বক্তৃতা শুনিতে গেলে, ও গিয়া উপকৃত হইলে।

১৪ই অক্টোবর হইতে আবার দ্বিপ্রহরে স্কুল হইতে আরম্ভ হইল। এতদিন গ্রীষ্মকাল বলিয়া সকালে হইত। প্রথম যে দিন বেলায় স্কুল কিম্বা কাছারী করিতে হয় সেদিন কেমন একটু ঘুম পায়। দিনের বেলায় বিশ্রাম করা তোমার অভ্যাস হইয়াছিল। তাই পাঠ করিতে করিতে শরীর কেমন করিতে লাগিল ঘুমও পাইল। যে নামের গুণে সকলি করিতে পার, সেই নাম করিতে লাগিলে। আমার পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিলে, অমনি নূতন বল পাইলে। তার পর খুব পড়িলে ও পড়া বেশ দিলে।

মাঝে মাঝে মনটা পত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আজ নূতন রূটীনের দিনে কি জানি কেন পত্র পাইবার আশা প্রবল হইল। ৫টার সময় আহার হইল। তার পর কুঠীতে গেল। আমার পত্র কিন্তু পাইলে না। মনটাতে আশা পোষণ করিয়াছিলে বলিয়া বুঝি একটু কষ্ট হইল, তাই ফিরিতে ফিরিতে মায়ের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলে। উচ্চারণ করিতে করিতে যেন শুনিলে, আমিও তোমার সঙ্গে নাম উচ্চারণ করিতেছি। তখন তোমার মুখ অত্যন্ত প্রসন্ন। একটী মেয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এত প্রফুল্ল কেন? পত্র পাইয়াছ না কি?’

তুমি বলিলে,—'না।' 'এত প্রফুল্ল কেন?' তোমার উত্তর—'জানিনা।' তিনি বলিলেন, তুমি সব সময়ই প্রফুল্ল থাক।

এক রবিবারে ৮টার সময়ে গৃহে বসিয়া আছ, এমন সময়ে বোর্ডিঙের একটী মেয়ের মা তোমার ঘরে আসিলেন। তাঁহার কন্যার ফি'র টাকা আনিয়াছিলেন, মিস্ থোবর্ণ বাটীতে নাই, আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাই তোমার নিকট টাকা রাখিয়া গেলেন। তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলে। তিনি খ্রীষ্টান হইয়াও খ্রীষ্টান অপেক্ষা তোমাকে অধিক বিশ্বাস করিলেন!

আর একদিন জল গরম করিবার জন্য আগুন আনিতে যাইতেছিলে। পথে পড়িয়া গেলে। আগুন আনাও হইল না, জল গরমও হইল না, স্নানও হইল না। উপাসনায় বসিয়া মনে যথেষ্ট বল আসিল। তারপর আমার প্রেরিত আমার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাসের খাতা আর একখণ্ড পাইলে। অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেছ, এমন সময় খাবার ঘণ্টা বাজিল। অমনি সে বই রাখিয়া দিতে হইল। আহারের পর আবার পড়িতে আরম্ভ করিলে, কিন্তু এবার স্কুলের ঘণ্টা বাজিল। আর তাহা পড়া হইল না; স্কুলের পুস্তক লইয়া পড়িতে গেলে। পড়া বেশ হইল। এই যে তুমি নিজের কর্ত্তব্যে দৃঢ় থাকিলে ইহাতে তোমার মন বড় সুখী হইল। বেলা ১টার সময় এই আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে। আপনার কর্ত্তব্য করিলে এইরূপ হাতে হাতেই পুরস্কার পাওয়া যায়।

আর একদিন আমার ঐরূপ একখানি খাতা পাইয়া তোমার মনে হইয়াছিল, "আমি তো পত্র চাহিতেছি না, তবে শুধু লিখিতে দোষ কি?" কিন্তু যিনি আমাকে বারণ করেন, তিনি তোমাকেও বারণ করিলেন। পত্র লেখা হইল, কিন্তু ডাকে দেওয়া হইল না। পত্র লেখাতেও যে সুখ আছে। ছোট বেলায় গুরুজনের আজ্ঞায় দিনের বেলায় আমার সঙ্গে আলাপ করিতে না; এখন পরম গুরুর আজ্ঞায় আমাকে পত্র লেখা বন্ধ হইল।

এই যে ৮মাস প্রতিদিন ১৪।১৫ ঘণ্টা করিয়া পাঠ অভ্যাস করিলে, ইহাতে তোমার চক্ষের জ্যোতিঃ না কমিয়া যেন আরও বাড়িতে লাগিল। যেন বাল্যচক্ষু পাইলে। বাস্তবিক এ সময়ে তোমার চেহারা ও স্বভাব এত শিশুর মত হইয়াছিল, যে, তোমার মেয়ে দু'টীকে দেখিয়া লোকে মনে করিত না যে তাহারা তোমার কন্যা। কেহ কেহ তোমার স্বামীর পূর্ব্ব পক্ষের কন্যা বলিয়া সন্দেহ করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ লক্ষ্ণৌ কলেজে শেষ একমাস

ক্রমে পত্রসাধন শেষ করিবার দিন আসিল। ২০শে অক্টোবর আমি তোমাকে প্রথম পত্র লিখিলাম। এক মাস ধরিয়া ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইয়াছিল, পাছে ব্রত ভঙ্গ হয়, পাছে পত্র নিজ ইচ্ছায় লিখিয়া ফেল। ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে লাভ ভিন্ন লোকসান হয় না। আচার্য্য দুঃখ করিয়া ছিলেন যে, ধর্ম্ম লইয়া সকলেই বলে লোকসান, কিন্তু এত ত্যাগ করিয়াও তুমি বলিলে লাভ।

২১শে অক্টোবর বিকালে কুঠীতে গিয়া দেখিলে, টেবিলের উপর আমার লিখিত পত্র রহিয়াছে। কিন্তু এখন যে আপনাকে জয় করিয়াছ, তাই আর ব্যস্ত হইলে না। পূর্ব্বজীবন এবং এখনকার জীবন কত ভিন্ন। প্রবোধ একদিন আমার লিখিত পত্র তোমাকে দিতে বিলম্ব করিয়াছিল, সে জন্য সে বেচারা কতই লজ্জিত হইয়াছিল, আর তুমিই বা কত মর্ম্মাহত হইয়াছিলে। প্রবোধচন্দ্র নিজে ডাকঘরে গিয়া তোমার পত্র তোমাকে আনিয়া দিলে তুমি তৃপ্ত হইতে। তারপর মতিহারীতে পাছে পত্রের বিলম্ব হয় তাই ভ্রাতৃ-জামাতা রামচন্দ্র নিজে তোমার পত্র লইয়া যাইতেন। পত্র পাইতে বিলম্ব হইত বলিয়া আমাকে পোষ্ট মাষ্টারের নামে অভিযোগ করিতে বলিয়াছিলে। এখন যেখানকার পত্র সেইখানেই রহিল, চাহিলে না।

মনে মনে বলিলে, পত্র পাইবার হয় তো অবশ্যই পাইব। শুধু হাতে আপনার স্থানে চলিয়া গেলে। কিছু পরে একটি মেয়ে তোমার পত্র তোমাকে অর্পণ করিল। এইরূপে তুমি ধৈর্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলে। এই যে জয়লাভ হইল, ইহাতে তোমার আনন্দ ধরিল না। তুমি লিখিলে, "পত্র ভালবাসিতাম বলিয়া কত লোকের গঞ্জনা খাইয়াও নিত্য পত্র লিখিতে, কখনও তুমিও ভোল নাই, আমিও ভুলি নাই। যখন বাটীতে থাকিতাম, তখন পূর্ণ অধীন ছিলাম। দিনে সময় পাইতাম না, কারণ দাস দাসীর, পাচকের, গৃহিণীর সমস্ত কাজই নিজে করিতে হইত; তারপর সন্তান পালন। সুতরাং রাত্রিতে নিদ্রার সময় হইতে কিছু কাটিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে হইত। কত দিন তৈল পাইতাম না, যদি সকলের শয়নের পর কেহ দেখিতেন প্রদীপ জ্বলিতেছে, বড় বকিতেন,—এত তৈল কোথা হইতে আসিবে? অমনি প্রদীপ নির্ব্বাণ হইত। অন্ধকারে কালি, কলম আর খুঁজিয়া পাইতাম না। অন্ধকারে বল দেখি কিরূপে পত্র লিখিতাম? ঝাঁটার কাটি আমার কলম, পুঁই শাকের বীচির রস আমার কালি, চন্দ্র আমার আলো হইত, এই উপায়ে পত্র প্রস্তুত হইত।"

এক দিকে মায়ের যেমন আদর, আবার অপরাধ হইলে একটুতে মুখ ভারি হয়। ২৩শে অক্টোবর একটু বিলম্বে উঠিয়াছিলে। কেন তাহা হইল? এ অপরাধ আর তাঁহার সহ্য হইল না। সমস্ত দিন মুখ ভারি করিয়া থাকিলেন। এত শাসনে তবে মানুষ উদ্ধার হয়।

২৪শে অক্টোবর আর একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। একটি বাঙ্গালী মেয়ে বেশী দামের কাপড় চাহিয়াছিলেন। কর্ত্রী মিস্ থোবর্ণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ শীতের সময় তোমরা সাদা কি মেরুণা ব্যবহার কর? তুমি বলিলে সাদা। কর্ত্রী সেই ছাত্রীকে বলিলেন, "ইহার অপেক্ষা তুমি ধনী নও, বেশী মূল্যের কাপড় পাইবে না।"

সে ছাত্রী অসন্তুষ্ট হইয়া অতি রঞ্জিত কথায় মাতাকে পত্র লিখিলেন। লেখা পত্র তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। মেয়েদের বাঙ্গালা পত্রগুলি কর্ত্রী তোমাকে পড়িতে দিতেন, তুমি মত দিলে তবে ডাকে দেওয়া হইত। মন্দ বলিলে ফেরত যাইত। এ ব্যবহারে তোমার বিশেষ শিক্ষা হইয়াছিল। বিশ্বাস করিলে কিরূপে বিশ্বাস-ভাজন হইতে হয়, সে শিক্ষা বেশ লাভ করিয়াছিলে। তোমাকে এত বিশ্বাস করেন বলিয়া নিজের কিম্বা নিজ কন্যাদের কোন ভুল হইলে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাহা স্বীকার করিতে। ঐ দিন ঐ ছাত্রীর পত্র ও তোমার নিজের পত্র লইয়া কুঠীতে গেলে; কর্ত্রী নিজস্থানে ছিলেন না বলিয়া ঐ ছাত্রীর পত্র দেখান হইল না। একে একে তিনবার গেলে কিন্তু সাক্ষাৎ হইল না। টেবিলে পত্র রাখিয়া চলিয়া গেলে। পত্রবাহক কিছু জানিত না, সে অন্যান্য পত্রের সহিত সে পত্রও ডাকে দিয়া আসিল। যদি প্রথম শিক্ষয়িত্রীকে পত্রখানি দেখাইতে, ভাল হইত। একখানি আপত্তিজনক পত্র তোমার অসাবধানতার জন্য ডাকে চলিয়া গেল; ইহাতে তোমার মনে অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপ উপস্থিত হইল। তুমি সন্ধ্যার সময় কুঠীতে গিয়া যেমন দেখিলে টেবিলে পত্র নাই, অমনি মন বলিয়া উঠিল, করিলে কি? যিনি তোমাকে এত বিশ্বাস করেন তাঁহার বিশ্বাস ভঙ্গ করিলে? বিবেক তোমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। বলিল, কর্ত্রীর নিকট গিয়া সব খুলিয়া বল ও ক্ষমা চাও। সেই যে মতিহারীতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলে, তাই এখন সহজ হইল। কর্ত্রীর দেখা পাইলে না, সুতরাং মনেও শান্তি পাইলে না। পাঠ করিতে বসিলে পাঠ অভ্যাস করিতে পারিলে না। চতুর্থবার ৭টার সময় কুঠীতে গিয়া কর্ত্রীর সাক্ষাৎ পাইলে। তিনি লিখিতেছিলেন; লেখা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে?

তুমি—আজ ভারি অপরাধ করিয়াছি; আপনি মাপ করিবেন।

কর্ত্রী—(হাসিতে হাসিতে) শীঘ্র শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে।

এমন কি অপরাধ করিতে পার? (পরিহাসচ্ছলে) কিছু চুরি করিয়াছ নাকি?

তুমি—চুরি তো ভাল, কারণ সে বাহিরের অপরাধ।

কর্ত্রী—(তোমাকে আরও নিকটে টানিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া) বল!

তুমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলে। কর্ত্রী খুব হাসিলেন, ও বলিলেন, এই? ইহার জন্য এত?

তুমি—আমি বিশ্বাস করি, এ অপরাধ আমার আর কখন দেখিতে পাইবেন না। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।

কর্ত্রী তোমার মুখে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার ক্ষমা চাহিবার পূর্ব্বেই তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। এ কিছুই নয়; বহুমূল্য বেশভূষা বিলাস, যাহাতে বিদ্যালয় হইতে চলিয়া যায়, এ তাহারই চেষ্টা।

তুমি এই ঘটনায় বুঝিলে দোষ করিয়া যদি স্বীকার করিতে পারে, তবে সে দোষের ক্ষমা হয়, আর সে দোষ ভবিষ্যতে না করিবার জন্য মনে চেষ্টাও হয়। মা বিদেশে লইয়া গিয়া অনেক শিখাইলেন।

২৩শে অক্টোবর মিস্ থোবর্ণের নিকট পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন করিলে। তিনি হাসিয়া স্বীকার করিলেন। তুমি বলিলে, "কিন্তু, ক্লাসে পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিতে হইবে।" তিনি বলিলেন, "খুব ভাল কথা, অবশ্যই দিব। তারপর তাঁহার সঙ্গে স্কুল সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। তিনি অনেক সময় তোমার পরামর্শ লইয়া চলিতেন।

২৪শে অক্টোবর তারিখে তোমার একজন মেম-বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আদর করিয়া তোমাকে এক বাক্স আঙ্গুর খাইতে দিলেন। তুমি খাইতে চাহিলে না; কারণ তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোন ভাল জিনিস সম্ভোগ করিতে না। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে একটা আঙ্গুর উঠাইয়া লইলে, এবং আঙ্গুরটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া মায়ের করুণা বর্ণনা করিতে লাগিলে। মেম বলিলেন, "কেবল

দেখিবে?” তুমি একটু হাসিলে, কিন্তু খাইলে না। মেমের মনে কি হইল কি জানি; তিনি সন্ধ্যার সময় সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তুমি স্বীকার করিলে। পাঠ ও আহারের পর ঘর অন্ধকার হইয়া আসিল; তুমি তোমার প্রিয় আত্মার সঙ্গে যোগ সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলে, এমন সময় সেই মেমটী হাজির। তিনি তোমার হাত নিজ হাতে চাপিয়া ধরিলেন, এবং বলিলেন, “বল আমাকে আর ভুলিবেনা। যখন কলিকাতায় যাইবে আমার সঙ্গে দেখা করিবে, আমার জন্য প্রার্থনা করিবে।” তুমি বলিলে, চেষ্টা করিবে। তিনিও তোমার জন্য প্রার্থনা করিবেন, বলিলেন। তিনি তাঁহার এক বন্ধুর নিকট তোমার কথা শুনিয়া তোমাকে ভাল বাসিয়াছিলেন; তুমি যে ঈশ্বরকে পাইয়াছ, তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরম পিতাকে তুমিও চাও, এই কারণে তোমার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ।

তুমি লক্ষ্ণৌ কলেজে থাকিতে তোমার দুই কন্যা ব্যতীত আর একটী কন্যার ভার লইয়াছিলে। তাঁহার পিতা লক্ষ্ণৌ সহরেই থাকিতেন। সেই কন্যা একদিন পিতার কাছে যাইতে চাহিলেন। সঙ্গে কে যাইবে? মিস্ থোবর্ণের সাধারণ আদেশ ছিল যে, মিসেস্ রায় যতদিন যেখানে ইচ্ছা করেন থাকিতে পারিবেন। এমন অনুমতি সত্ত্বেও সেই কন্যার বাটীতে গিয়া রাত্রিবাস করিতে পারিলে না। কারণ দিনকয়েক পূর্ব্বে কথায় কথায় মিস্ থোবর্ণকে বলিয়াছিলে যে, নভেম্বর মাসের পূর্ব্বে তুমি কোথাও গিয়া থাকিবে না। তিনি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তো ভোল নাই। অনেক দিন পরে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, একত্রে সদালাপ হইবে, বাহিরে থাকিবার জন্য তোমার মন ব্যগ্র। তাই মিস্ থোবর্ণকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সে সঙ্কল্প হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিলে। কিন্তু মিস্ থোবর্ণ কুঠীতে নাই। শীঘ্র ফিরিয়া আসিবারও সম্ভাবনা ছিল না। ৫টার সময় গোপাল

বাবুর বাটীতে গেলে, কন্যাকে তাঁহার মায়ের হাতে অর্পণ করিলে, এবং জানাইলে যে, রাত্রিতেই তুমি ফিরিয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া আবাল বৃদ্ধ সকলেই বলিয়া উঠিলেন, তাহা কখনই হইবে না। তুমি মেমের নিকটে তোমার সত্যের কথা বলিয়া বলিলে, যে তোমার সত্যরক্ষার ভার তোমার ভাই বোনের হাতে। ইহাতেই সকলে পরাস্ত হইয়া গেলেন, গাড়ী করিয়া তোমায় পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর একদিন তোমার ভবিষ্যৎ কার্য্যক্ষেত্র বিষয়ে ঐ কন্যার পিতা যদুবাবুর সঙ্গে এইরূপ আলাপ হয়।

যদু বাবু—আপনারা নাকি বাঁকিপুরে স্কুল করিতেছেন?

তুমি—ইচ্ছা তো আছে, তবে জানি না।

যদুবাবু—টাকা কোথায়?

তুমি—তাহা জানি না। তবে বিশ্বাস করি যদি সত্য মার কাজ কেহ করে, তাহার টাকার অভাব হইবে না। অনেকে দিতে পারেন। টাকার জন্য কিছু ভাবি না; আসিবে। কোনও দিন কোন ভাল কাজ টাকার জন্য বন্ধ থাকে না।

যদু বাবু—এ ভার লইবার লোক কোথায়?

তুমি—জানি না, অবশ্যই লোক আসিবে। আর স্বয়ং মা-ই লোক। শ্রদ্ধেয় অ—বাবু এ বিষয়ে খুব উৎসাহী, তিনি কিছু করিতে পারেন।

যদু বাবু খুসী হইয়া বলিলেন, তিনি বেশ লোক। কত টাকা খরচ হইবে মনে করেন?

তুমি—জানি না, কিছুই ঠিক নাই। মনের ইচ্ছা যে একটা স্কুল হয়। তাই মনে হয় এক শত টাকার কমে চলিবে না।

যদু বাবু—মেয়েদের নিকট কত ক'রে লওয়া যাইবে?

তুমি—এ সকল কথা কিছু স্থির হয় নাই। তবে মনে হয় গরিবেরা কম দিবেন। ধনীরা সেই স্থান পূর্ণ করিয়া একটু বেশী দিতে ইচ্ছা করিলে দিবেন।

যতু বাবু—মেয়ে কোথায় পাইবেন ?

তুমি—কিছুই জানি না।

যতু বাবু—এ বিষয়ে আপনাকে সহানুভূতি করিবার কেহ আছেন ?

তুমি—ভগবান, আর এ পৃথিবীতে শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু।

যতু বাবু—এ বড় কাজ, হাতে লইলে লোকের গালি খাইতে হইবে।

তুমি—তা জানি। কোন্ কাজ কোন দিন কে বিনা গাল খাইয়া করিতে পারিয়াছেন, যে সে আশা আমরা করিব ?

যতু বাবু—(খুসী হইয়া) তবে আমি কিছু বলি। (১) ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও উপর নির্ভর করিবেন না। (২) বিলাস একেবারে থাকিবে না। (৩) আপনারা তুইটীতে একেবারে সেই জন্য প্রাণ দিবেন। পৃথিবীর গালি ও নিন্দাতে ভয় করিবেন না।

তুমি—ইচ্ছা তো তাই।

যতু বাবু—এইরূপ করিলে আপনাদিগকে কন্যা দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

আর এক দিন গোপাল বাবুর বাটীতে তোমার নিমন্ত্রণ হইল। সে দিন আবার যে কথা বার্ত্তা হইল তাহার সার অংশ এই।

তুমি—কিসে মেয়েরা সত্য খাঁটী উপাসনা শিখিতে পারেন, কিসে পরলোকের বিষয় জানিতে পারেন, পুরুষেরা এই সকল বিষয় মেয়েদের ভাল করিয়া শিখাইয়া দিন। মেয়েদের মন অতি তুর্ব্বল, জ্ঞান অতি কম। বিশেষ যত্ন না করিলে মেয়েরা এ ধন লাভ করিতে পারিবেন না। আর তাই যদি না পারেন কি শোচনীয় অবস্থা দেখুন দেখি ? অনেক সময় পুরুষেরা মেয়েদের সামান্য কিছু সাহায্য করিয়াই বলিয়া দেন, 'যাহা বলিলাম তাহাই এখন হজম কর।' তুর্ব্বলা নারী হয়তো এমনই হজম করিয়া ফেলিলেন যে, আর তাহার চিহ্নই পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া কেহ কেহ

বলেন, 'মেয়েদের কিছুই হইবে না।' একবার কোনও বিষয় না বুঝিতে পারিলেই বলেন, 'আর কি করিব?' মা জননী যদি পুরুষদের প্রতি এইরূপ করিতেন, কি হইত?

যদু বাবু—পুরুষেরাই এখনও কিছু পান নাই, নারীকে কি দিবেন?

তুমি—যাহা পাইয়াছেন তাই দিন। এখনকার মত তাহাই অনেক হইবে। আবার দিতে দিতে যে বাড়ে।

যদু বাবু—যাঁহারা দিতে আসিয়াছেন (অর্থাৎ প্রচারকেরা) তাঁহারাই দিন।

তুমি—তাঁহারা দিন, কিন্তু আমার মনে হয় আপন স্বামী, ভাই, বাপ যদি দেন, তাহাতে বেশী ফল হইবে।

এই কথায় যদু বাবুর স্ত্রী বড় সুখী হইলেন। সকলেই অতি মিষ্ট ও শান্তভাবে কথা বলিতেছিলেন।

রাত্রি ৯॥ টা পর্য্যন্ত এইরূপ কথা বার্ত্তার পর সে বাড়ীর পুরুষেরা আহার করিলেন। পরে ১০॥ টার সময় মেয়েরা আহার করিতে বসিলেন। অধিক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া ছোট মেয়েরা খুব খুসী; ভাবিল যে তোমাদের সে রাত্রিতে আর ফিরিয়া যাওয়া হইবে না। কিন্তু তাহারা তোমাকে চেনে নাই; সকল মেয়েরা আহার করিতেই রহিলেন, তুমি ও তোমার দুই মেয়ে অভদ্রের মত পাতা গুটাইয়া উঠিয়া পড়িলে, ও ক্ষমা চাহিলে। ভুবন বাবুর গাড়ীতে রাত্রি ১১ টার সময় কলেজে চলিয়া গেলে।

৩১শে অক্টোবর তোমার ভাই জ্ঞান তোমার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। অনেক দিনের পর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে বলিয়া মাকে ধন্যবাদ দিলে। বড় ভাল লাগিল। ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। তারপর জ্ঞান বিশেষ অনুরোধ করিলেন, যাহাতে তুমি তাঁহার শ্বশুরবাড়ী যাও, ও তোমার বৃদ্ধা মাসীর সহিত সাক্ষাৎ কর। ছুটীর পরে যাইতে স্বীকার করিলে, কিন্তু তাহাতে

তাঁহার মন উঠিল না। ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া জ্ঞান বলিলেন 'বিবেচনা করিয়া বলিও'। তুমি রক্ষা পাইলে। একদিকে ভাইয়ের অনুরোধ, আর একদিকে কর্ত্তব্যের অনুরোধ। শেষটাই জয়লাভ করিল। কথাবার্ত্তার সময় জ্ঞানের মুখে শুনিলে,—বাবু বলিয়াছেন, 'তোমার দিদি একজন ভক্ত'। তুমি শুনিয়া লজ্জিত হইলে। ভাবিলে, দিন রাত্রি যে জীবনের সঙ্গে লড়াই করে, সে আবার ভক্ত, এ কি কথা!

পরের দিন ভাই জ্ঞান যখন একেবারে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে আর ফিরাইতে পারিলে না। তোমাকে যাইতে হইল, মেয়েরাও সঙ্গে গেলেন। প্রথমে বৃদ্ধা মাসীমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, তারপর জ্ঞানের শ্বশুরবাটী গেলে। এ বিষয়ে পরে লিখিয়াছ, "সেখানেও ১॥ ঘণ্টা ছিলাম। অনেক দিন হিন্দু পরিবার দেখি নাই। সকলই নূতন বোধ হইল। যেমন ঈশ্বরের নিকটে আমরা অজ্ঞান, তেমনি এ সকল পরিবার অজ্ঞান বোধ হইতে লাগিল। মাসীর সহিত ও তাঁহার পুত্রবধূর সহিত ধর্ম্মবিষয়ক অনেক গল্প হইল। বধূ বাল্যকালে আমায় খুব ভাল বাসিতেন। এখনও সেই স্নেহ ভোলেন নাই। পরে ৫ টার সময় জ্ঞান আমাদের সমাজবাড়ী পৌঁছিয়া দিলেন। সেইখানে বসিয়া নানা কথা হইল। বিশেষ কথা দাদার ছেলেদের পড়ার বিষয়। একটু পরে সব লোক সমাজে আসিয়া পড়িলেন,—জ্ঞানও বাটী চলিয়া গেলেন, আমার একটু মনটা কেমন করিতে লাগিল। আমার ভাই সমাজে বসিলেন না! মনে মনে তার জন্য মার নিকট বলিলাম।"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন গোপালবাবুর স্ত্রী অনেক ভাল খাবার, ফল, চন্দন বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তো ভাই নাই, সকলেই ভগিনী। তাই ভগিনী-দ্বিতীয়াই হইল। তুমি সকলকে ভাগ করিয়া দিলে, কর্ত্রী মেমকেও দিয়া আসিলে; কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিসটী

(করুণার মাতা যেমন প্রস্তুত করিতেন সেইরূপ চন্দ্রপুলি) খাইলে না। ঐ খাবারটী আমি ভালবাসি বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া খাইতে ইচ্ছা হইল না। আমের সময় আম খাইলে না, ভগিনীদ্বিতীয়ার চন্দ্রপুলিও ত্যাগ করিলে। তোমার বড়ই ভয় হইত, পাছে ব্রত ভঙ্গ হয়। "সর্ব্বদা সতর্ক থাকিলে পতন হইতে বাঁচা যায়" এই শিক্ষা লাভ করিলে।

আর একদিন প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে মেয়েদের হাসপাতাল দেখিতে গিয়াছিলে। তিনি গাড়ী ভাড়ার অংশ দিতে চাহিলেন; তুমি লইলে না কেন? অভ্যাস নাই বলিয়া। তিনিও বুঝিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় মিস্ ডাক্তার ছাতা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও লইলে না কেন? এটাও অভ্যাসের জন্য। সে দিন রবিবার ছিল। পথে ভগিনী মহালক্ষ্মীকে (বিহারী বাবুর স্ত্রী) দেখিতে গেলে। তিনি তখনও রোগে জীর্ণ শীর্ণ। তাঁহার ইচ্ছা তুমি আর কিছুক্ষণ থাক, তুমি বলিলে, সমাজে যাইতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিন কি রবিবার? হাঁ, এই উত্তর পাইয়া তিনি চুপ করিলেন। সমাজে গিয়া তোমার মনে আক্ষেপ হইতে লাগিল, সমাজে না গিয়া যদি ভগিনীর পার্শ্বে বসিয়া উপাসনা করিতে, খুব ভাল হইত।

১২ই নভেম্বর লিখিতেছ, "এই মাত্র স্কুল হইতে আসিলাম, সকাল হইতে বুকের ভিতর কেমন করিতেছে জানি না। মেমকে বলিলাম, তিনি একটী ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। পরে তোমার পত্রপাঠ করিয়া বুঝিলাম, কেন মন অমন করিতেছে। আজ হয়তো তোমার বেদনাটা বাড়িয়াছে কিম্বা ফোড়াটা কাটাইয়াছ ও আমার কথা মনে করিতেছ। পত্র পাইবার অনেক আগে হইতে বুক কেমন করিতেছিল। না বলিলে কি হইবে, মা-ই বলিয়া দেন।"

একদিন ডাকের পত্র দিয়া চলিয়া আসিতেছ, এমন সময় মিস্ থোবর্ণ বলিলেন—মিসেস্ রায়, একটু অপেক্ষা কর। (জনৈক

ছাত্রীর প্রতি)—তুমি এখনও যাও, মিসেস্ রায়ের সঙ্গে অনেক দিনের পর আলাপ করিব। মিসেস্ রায়, স্কুল সম্বন্ধে কি বল? বোর্ডিং কিরূপ চলিতেছে? তুমি যে আমার বন্ধু।

তুমি—(অনেক ভাল মন্দ যাহা জানিতে বলিলে; শেষে—) যদি আমি কোন কথা ভুল বলিয়া থাকি মাপ করিবেন।

মিস্ থোবর্ণ—(তোমার গলা জড়াইয়া নিজ বক্ষে চাপিয়া) আমাদের মধ্যে কখনও অমিলনের কথা হইবে না, মাপ চাহিবার পূর্ব্বেই সকল মাপ হইয়া আছে।

সন্ধ্যার সময় মিস্ থোবর্ণ তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, একটী মেয়ে পীড়িত; সুসার কি তাহার নিকটে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবেন? আর একটী মেয়েকে সঙ্গে দিব। তুমি বলিলে, সুসারকে জিজ্ঞাসা করি। এ কথা বলিয়াই মনে অতিশয় লজ্জা উপস্থিত হইল। ভাবিলে কোথায় আমি নিজে হইতে সেবার ভার লইবার প্রস্তাব করিব, তাহা না করিয়া এ কথা কেন বলিলাম? প্রকাশ করিয়া বলিলে—হয় সুসার থাকিবেন, নয় আমি থাকিব।

মিস্ থোবর্ণ—(আপনার বুকে চাপিয়া ধরিয়া) তুমি বড় রোগা হইয়া গিয়াছ। আমি তোমাকে এ কাজ দিব না। অন্য বন্দোবস্ত করিব। কিছুতেই শুনিলেন না, অন্য মেয়ের বন্দোবস্ত হইল।)

তুমি কিন্তু নিজের ঘরে গেলে না, রোগীর গৃহে গিয়া সেবা করিতে লাগিলে।

মিস্ থোবর্ণ একটু পরে আসিয়া বলিলেন, শয়ন করিতে যাও। বড় রোগা হইয়া গিয়াছ, অসুখ করিবে। (যাইবার সময় তোমাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।)

তুমি—না, আমি এখানেই থাকিব।

মিস্ থোবর্ণ—অন্য দিন থাকিবে, একটু ভাল হও।

তুমি—না, আজ আমিই থাকিব। (তোমার মনে তখনও অনুতাপের অনল জ্বলিতেছিল।)

মিস্ থোবর্ণ তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন, 'হুকুম মানো'।

তুমি—যে আজ্ঞা (ঘরে গেলে।)

যে তুমি অসাবধান হইয়া পূর্ব্বে কত অপরাধ করিতে, তাহার আজ এই দশা! এই সামান্য অপরাধে কত আত্মগ্লানি, অনুতাপ সহিতে হইল। পত্রে তোমার এই অপরাধের কথা ভাই, বোনের কাছে প্রচার করিতে বলিয়াছ। আরও অনুরোধ করিয়াছ, "বলিও মার নামে একজন অজ্ঞান বঙ্গনারী, আজ একজন জ্ঞানধর্ম্মে ভূষিতা মহানারীর বন্ধু হইয়া প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। এই কি পৃথিবীর কৌশলে হইতে পারে? না। সেই জননীর কৌশলে। মাকে প্রাণের প্রাণ করিতে পারিলে আর কিছুই অভাব থাকে না। এ তো আমার গৌরব নয়, মার আর তোমার।"

এক দিন গোপাল বাবু তোমাকে, তোমার কন্যাদ্বয়কে ও বোর্ডিঙের আর দুটী কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার পত্রখানি মিস্ থোবর্ণের কাছে পাঠাইয়া দিলে। অল্পক্ষণ মধ্যেই মিস্ থোবর্ণ তোমার ঘরে আসিয়া তোমাকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য মেয়ে দু'টীকে পাঠান বিষয়ে তোমার পরামর্শ কি?"

তুমি—আমার মেয়ে হইলে যাইতে দিতাম। কিন্তু এ দু'টী মেয়ে খ্রীষ্টান, ইহাদের সম্বন্ধে আমি কোন উত্তর দিতে পারি না।

মিস্ থোবর্ণ—তুমি যাইবে?

তুমি—না।

মিস্ থোবর্ণ—তুমি গেলে উহাদের যাইতে দিতাম, কিন্তু একা যাইতে দিব না। এ মাসের শেষ শনিবারে যখন তুমি যাইবে তখন তোমার সঙ্গে উহারাও যাইবে।

মেয়েরা বলিল, "মিস্ থোবর্ণ তোমার সকল কথাই শোনেন।" তুমি বলিলে, "আমি কি করিব?"

আর একদিন তুমি দৈনিক লিখিতেছিলে, একটি এফ্.এ ক্লাসের

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি?" তুমি বলিলে "ডাইরী।" বিদ্যাবতী মেয়ে ডায়েরী কি তা জানেন না; কেমন করিয়াই বা জানিবেন? অল্প লোকেই দৈনিক বৃত্তান্ত লিখিতে অভ্যাস করেন এবং উহাতে কি ফল হয় তাহা জানেন না। তোমার দেখাদেখি সেই মেয়েটীও তাঁহার মানের খাতায় ডায়েরী লিখিতে উদ্যত হইলেন। অবশেষে সে খাতাখানিকে এ অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য ভিন্ন কাগজ আনান হইল ও সেই দিনই তাঁহার ডায়েরী লেখা আরম্ভ হইল।

তোমার লক্ষ্ণৌ ত্যাগের সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ভবিষ্যৎ কার্য্যের বিষয়ে ততই তোমার মনে চিন্তা আসিতে লাগিল। একদিন দৈনিকে লিখিলে—"এই তো কার্য্যের বুনিয়াদ পড়িল। কত কাজ যে করিতে হইবে বলিতে পারি না! কেমন করিয়া হইবে, তাহাও জানি না; কিন্তু করিতেই হইবে। একটী উপাসনা গৃহ, একটী মেয়েদের স্কুল, একটী পীড়িতাশ্রম, একটী ছাত্রাশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। স্কুলটি তো অতি শীঘ্র করিতে হইবে খরচ আপাততঃ মাসে প্রায় ১০০ টাকা করিয়া লাগিবে। একটী বড় বাটীর প্রয়োজন। ৩০।৩৫ টাকা হইলে—বাবুর কন্যা, যিনি এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছেন, আসিতে পারেন। এখন বুঝিতেছি, জ্ঞানের কত প্রয়োজন। কত মেয়ে এই জ্ঞানের অভাবে ব্রাহ্মসমাজে জড়ের মত আহার নিদ্রায় দিন কাটাইতেছেন। টাকার জন্য আমরা কোনদিন ভাবি নাই, ভাবিও না। যদি সত্য মায়ের কাজ অঘোর-প্রকাশ করিতে পারে, নিশ্চয় কোন অভাব থাকিবে না।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ: লক্ষ্ণৌ কলেজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষা

বড় বড় বোর্ডিঙের নিম্নতন কর্ম্মচারী ও ভৃত্যেরা প্রায়ই কোমল ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে না। সেখানেও অনেক সময় তাহাই হইত। তোমাকেও কখনও কখনও তাহার ফল

ভোগ করিতে হইয়াছে। একদিন তোমার তেল ছিল না। কাঙ্গালিনীর মত তুমি সেখানকার মেট্রনের নিকট তেল ভিক্ষা করিলে, তিনি বলিলেন, আজ পাইবে না। মেথরানীর নিকট ভিক্ষা করিলে, সেও অস্বীকার করিল। তারপর চাপরাসী অনুগ্রহ করিয়া একটু তেল দান করিয়া গেল। আর একদিন এক পয়সার ধুনা ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আবার সেই মেট্রনের নিকটে গেলে। নিজের ভাণ্ডার হইতে দিতে হইত না, কেবল চাপরাসীকে হুকুম করিলেই সে আনিয়া দিত। মেট্রন অতিশয় কর্কশ স্বরে তোমাকে ধমক দিয়া বিদায় করিলেন। তখন মা জননী নিকটে না থাকিলে সহ্য করিতে পারিতে না। তুমি মেট্রনের কর্কশ বাণী যেমন শুনিলে, অমনি বলিয়া উঠিলে, "মার ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক।"

আর একদিন, যে দাসীর উপর সকলকে তেল দিবার ভার ছিল, সে তোমাকে তেল না দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত তুমি তাহার কাছে তেল ভিক্ষা করিলে; সে দিল না। তুমি বলিলে, "আলো ধরিতেছি একটু তেল দাও। দাসী হাত মুখ বিকৃত করিয়া ধমক দিয়া রাগের সহিত তেল দিতে গেল। তুমি বলিলে, আচ্ছা দিও না, কিন্তু বকিও না।" তখন সুসার আসিয়া তেল লইলেন। তুমি বারণ করিলে না। কিয়ৎকাল পরে তোমার জ্ঞানের উদয় হইল। যখন অপমানের প্রথম আঘাত আসিয়াছিল, মুহূর্ত্ত কালের জন্য জ্ঞানহারা হইয়াছিলে।

আর এক দিন আগুন আনিতে গেলে; দাই বলিল, আগুন নাই, পাইবে না। চোরের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে। দ্বিতীয় কিঙ্করীর একটু দয়া হইল। আজ্ঞা দিল অন্য উনুন হইতে আগুন লও। অতি সশঙ্কচিত্তে আগুন লইতে গেলে, পাছে একটু আগুন পড়ে, এবং কিঙ্করীদের কাহারও পা পোড়ে; তাহা হইলে

আর কখনও তাহারা আগুন দিবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক টুক্‌রা জ্বলন্ত অঙ্গার তোমারই হাতে পড়িল। হাত বিলক্ষণ পুড়িয়া গেল। কিছু না বলিয়া সেই অগ্নি বহন করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে আসিলে।

আর এক দিন শুধু ডাল ভাত খাইতে হইবে বলিয়া একটু মাখন গলাইতে উনুনের নিকট গিয়াছিলে। মেট্রন অতি কর্কশ ভাবে ধমক দিলেন এবং একটু ধাক্কা দিলেন। তোমার উত্তর দিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু অমনি মনে হইল তুমি যে ছাত্রী, এখন অধীন। এই মনে হইতে না হইতে বুঝিলে, উত্তর দেওয়া উচিত নয়। চুপ করিয়া চলিয়া আসিলে। শুধু ডাল, ভাত খাইতে বসিলে। আহার যখন প্রায় শেষ হইয়াছে তখন একটি মেয়ে কিছু মাংস আনিয়া দিলেন। মেট্রনের বোধ হয় দয়া হইল, তাই তিনিও একটু মাংস আনিয়া দিলেন। এইরূপই হয়। মানুষের প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলে এইরূপেই দয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এ বিদ্যালয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল না। তোমার কন্যাদের অত্যন্ত কষ্ট হইত; তোমার তো কথাই নাই। কোনও দিন আহারের সময় তোমার কন্যা কাঁদিয়া ফেলিতেন। নিজের দুগ্ধে দধি পাতিয়া প্রায় তাহারই সাহায্যে আহার করিতে। একদিন তোমার দৈনিকে লেখা আছে—"আজ আহারের সময় লবণ, ভাত, দধি, দুগ্ধ সবই অল্প ছিল, কিন্তু আনন্দ মনে আহার করিলাম।" আর এক দিন—"আজ বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে, কিন্তু খাবার নাই। মায়ের নামই আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল।" আর এক দিন—"টাকা ভাঙ্গাইতে পারিলাম না। খাবার কিছু নাই, কিন্তু প্রাণ শান্ত, মার কৃপায়।" আর একদিন তোমার অত্যন্ত ক্ষুধা লাগিয়াছিল; মেয়েরা দুধসুজি আহার করিলেন; অসাবধানতাবশতঃ সুসার তোমার অংশ ফেলিয়া দিলেন;

তোমার বিরক্তি না হইয়া হাসিই পাইল। আর একদিনের ডায়েরীতে দেখিতেছি যে সে দিন শুধু গুড় ভাত খাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। আর এক দিন পেটের বেদনায় বড় কষ্ট পাইয়াছিলে। অনেক ক্ষণ কষ্ট ভোগের পর উঠিয়া দেখিলে, তোমার খাবার বানরে লইয়া গিয়াছে; রাত্রিতে একটু দুগ্ধ মাত্র সম্বল; কিন্তু বিরক্তি আসিল না। আর এক দিন লিখিয়াছিলে, "আহারের স্থানে গেলে হাসি পায়। কারণ দুই কিম্বা তিন মিনিটে আহার শেষ হয়; কিন্তু বাসন মাজিতে অনেক সময় লাগে। বাসন নিজেই মাজিতে হয়।" অনেক দিনই দধি ভাত মাত্র আহার হইত। ১৮ই অক্টোবর লিখিয়াছ "আজ খাবার কম ছিল। শয়ন করিয়া পেট কেমন করিতে লাগিল। আর কোন উপায়ও ছিল না। গানে শুনিয়াছিলাম, হরিনামের এমনি গুণ যে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায়। আজ আমি সেই নাম করিতে করিতে কাপড় খুব কসিয়া পরিয়া মার নিরাপদ কোলে নিদ্রা গেলাম। একেবারে ৪টার সময় মা ডাকিলেন, তখন উঠিলাম।"

লক্ষ্ণৌ যাইবার পূর্ব্ব হইতেই তোমার শরীর অপটু হইয়া যাইতেছিল। ওখানে গিয়া পেটের অসুখ ও মাথার অসুখ প্রায়ই করিত। তোমার কন্যাদেরও শরীর দুর্ব্বল হইয়া নাসিকার রক্তস্রাব হইত। কিন্তু আহারের ক্লেশ তোমাকে একটুও অশান্ত করিতে পারে নাই। অন্যান্য মেয়েরা তোমাকে উত্তেজিত করিতেন, যে তুমি কর্ত্রীর নিকটে এ সকল জ্ঞাপন কর। কিন্তু তুমি তাহাতে কখনও সায় দিতে না। কারণ সেখানকার বিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়ম ছিল যে কোনও মেয়ে অভিযোগ করিবে না। যদিও তোমার সম্বন্ধে এই নিয়ম ছিল না, তথাপি তুমি আপনাকেও এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিলে।

যখন হইতে বেলায় স্কুল হইতে লাগিল, তোমার বিশ্রামের সময় অল্প হইয়া গেল, তখন তোমার শরীর আরও রোগা হইতে লাগিল।

তোমাকে রোগা হইতে দেখিয়া মিস থোবর্ণ ক্লেশ পাইতেছিলেন। কিসে নিবারণ হয় তাহার জন্য চেষ্টাও করা হইতেছিল।

এক দিন গভীর রাত্রিতে তোমাদের পাশের ঘরে কি গোলমাল হইল। সুসার ভাবিলেন, রাত্রি শেষ হইয়াছে, তোমাকে ডাকিলেন। একটু পরে শুনিলে ২টা বাজিল, আবার তোমরা শয়ন করিলে। প্রাতঃকালে শুনিতে পাইলে, একটী মেয়ের কলেরা হইয়াছে, কিন্তু পাছে তোমাদের অসুবিধা হয়, তাই তাহাকে দূরের একটী ঘরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বেলা ২টার সময় মেয়েটী মারা গেল! বোর্ডিঙের একশতটী মেয়ে একেবারে চুপ! যাহাদের মা বাপ নিকটে ছিলেন, কন্যা লইয়া গেলেন। তুমি যদু বাবুর কন্যাকে গোপাল বাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলে। আর তুমি দুই মেয়ে লইয়া কোথায় রহিলে? মায়ের নিরাপদ কোলে, কেন না সেই তোমার চির দিনের বাড়ী ও ঘর। সেখানে বিনা হুকুমে অসুখের সংবাদ দিবার নিয়ম ছিল না, তাই সংবাদ দিতে পারিলে না। ইচ্ছা হইল, দিন কয়েক স্থানান্তরে যাও, কিন্তু হুকুম পাইলে না, বলা হইল না। দেখিতে দেখিতে আর একটী বড় মেয়ের ভেদ বমি হইল। তোমার মনে হইল, যদি তোমার অন্যত্র যাওয়া প্রয়োজন হয়, অবশ্যই মিস্ থোবর্ণ বলিলেন। এইরূপে এক্ষেত্রেও বিশ্বাসের পরিচয় দিলে। মাকে বিশ্বাস করিয়া কোন দিন ঠক নাই, বরং লাভই হইয়াছে। ১২ই নভেম্বর কলেরার সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল; ভিন্ন কাগজে লিখিয়া মিস্ থোবর্ণের কাছে লইয়া গেলে। তিনি সংবাদ দিতে বলিলেন, আর বলিলেন যে "লেখ, এখানে আর কলেরা নাই, স্কুলের মেয়েরা ভাল।" তাই করিলে এবং বিশ্বাসের পরিচয় দিলে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ কন্যা সুসারের পরীক্ষা

এই সময়ে জামাতা বৃন্দাবনচন্দ্র পুনরায় হিন্দুমতে বিবাহ করিলেন। তোমার জন্য এ পরীক্ষাটা বড় কি ছোট? তোমাকে যে ভাল করিয়া দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারিয়াছে, যে এ পরীক্ষাটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। বাল্যকালে কিংবা যৌবনে যদি এ পরীক্ষা আসিত তাহা হইলে স্বভাবতঃই তুমি অত্যন্ত অধীর হইতে। লোকেও বুঝিতে পারিত, যে তুমি সহ্য করিতে পারিতেছ না। যখন তোমার সম্মুখে তোমার প্রিয় পিতাঠাকুর দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন মোমের পুতুলের মত তুমি গলিয়া গিয়াছিলে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার ছোট ভ্রাতার দেহ ত্যাগ হইয়াছিল, সেই সংবাদ শুনিয়া তুমি এমনি অসুস্থ হইয়াছিলে যে, ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু আজ তুমি ও তোমার কন্যা বিশ্বাসী ব্রহ্মসন্তানের মত এ আঘাত সহ্য করিলে।

তুমি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলে, সুসারের কপালে সংসারে যাহাকে সুখ বলে তাহা ঘটিবে না। স্বামীর ধর্ম্মবিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, শাশুড়ী, ননদ, দেবরেরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী; এমন গৃহে তোমার কন্যার স্থান কখনই হইবে না, ইহা তুমি জানিতে। সুসারও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বীর নারীর মত সকলই সহ্য করিতে হইবে। স্বামী সঙ্গ লাভ কখনই ঘটিবে না। তাই যে কয়দিন ধরাধামে থাকিতে হইবে, পরসেবা কিরূপে ভাল করিয়া করা যায়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য সুসারকে লইয়া লক্ষ্ণৌ নির্ব্বাসিত হইলে।

১২ই শ্রাবণ ১২৯৮ বৃন্দাবন পুনরায় বিবাহ করিলেন। তুমি সংবাদ পাইয়া লিখিলে, 'বৃন্দাবন যে বিবাহ করিবে তাহা জানিতাম ও প্রস্তুত ছিলাম তাই কিছুমাত্র লাগিল না। সুসার শুনিলে

অবশ্যই তাহার লাগিবে, সেই জন্য তাহাকে বলিলাম না। মা যা করেন তাই ভাল, কি আঁধার, কিবা আলো। প্রকাশ-অঘোর, আশীর্ব্বাদ কর, শেষ নিঃশ্বাস যেন এই বলিতে বলিতে ফেলিতে পারি, মা তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে সুখী করুন' এই পূর্ব্ব-জ্ঞান, এবং পূর্ব্ব-প্রস্তুতি তোমাকে রক্ষা করিল। তুমি এই পরিণত বয়সে বুঝিয়াছিলে, যে জীবনে অনেক এমন ঘটনা ঘটে যাহার হাত হইতে কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যায় না। নীরবে তাহা বহন করিতে হয়। তুমি জানিতে, আইন অনুসারে বৃন্দাবনের নামে নালিশ করা যায়। কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্ম্মের উচ্চতার পরিচয় দেওয়া হইত না। সুসারেরও কোন লাভ হইত না। ভয়ে কতদিন মানুষকে শাসন করা যায়? ভয়ে তো আর প্রেম হয় না। ভালবাসা না হইলে সকলই বৃথা তাই লিখিলে, মা যা করেন, তাই ভাল; তাই এই ভয়ানক অপরাধ করিয়াছে শুনিয়াও তুমি বলিলে, মা তাহার অপরাধ ক্ষমা কর। শুধু তাই নয়, তাঁহার সুখের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলে। হায়, বৃন্দাবন কি কখনও ইহা বুঝিবেন?

মাতার ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের কথা বলিলাম; যার জন্য এত, তার অবস্থা কি? সুসারের ডায়েরী পড়িলে কতকটা বুঝা যায়। সুসার শরীরে থাকিতে এ দৈনিক কেহ পড়িতে পাইত না। তুমিও বোধ হয় পাও নাই। এখন সুসার দেহে নাই। তাঁহার পবিত্র শোকের চিহ্নে পরিপূর্ণ এই ডায়েরীখানি এখন আমি পাইয়াছি। প্রথম প্রথম স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া মাসে মাসে এক একবার করিয়া লিখিতেন, "আজ একমাস হইল," "আজ দুই মাস চলিয়া গেল।" ডায়েরীর প্রতি মাসের শেষের এই কথাগুলি আমার চক্ষে এখন কন্যা সুসারের হৃদয়ে বিদ্ধ এক একটী নূতন নূতন শেলের মতন লাগিতেছে। ৭ই অক্টোবর ১৮৯১ লিখিতেছেন, "আজ কি দিব! আজ যে আমার এক আশ্চর্য্য দিন! মার কৃপায় আজ

৪ বৎসর মায়ের সুখী সন্তান হতে পৃথক রয়েছি। কেবল মায়ের কৃপায় উভয়ে বেঁচে আছি। ধন্য! মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এই যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, এইরূপই হউক। মাগো, তুমি যে তোমার সন্তানকে তোমার ঐ স্নেহকোলে এতদিন এত সহ্য করে রেখেছ, কি করে মা তুমি এত সহ্য কর, এত ভালবাস, জানি না। মা, তুমি কেমন মা! তোমার ভালবাসায় তুমি তোমার ছেলেকে মোহিত কর; দেখে সকলে সুখী হউক, জগৎ সুখী হউক। মা ধন্য, তোমার ব্যবহার, তোমার আশ্চর্য্য ব্যবহার! এমন করে এই এত দিন কাটিয়ে দিলে; জানিনা মা কোথা হতে গেল দিন! মা তোমারই কৃপায় বেঁচে আছি।" বৃন্দাবনের জন্মদিনে (১৯শে নভেম্বর ১৮৯১) লিখিতেছেন—"আজ কি দিব! আজ এক জীবনের জন্ম দিন। আজ আমার পালনীয়, স্মরণীয়। আজ আমার স্বামীর জন্ম দিন। মার চরণে শত শতবার কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিলাম, যে তিনি আজ ২৬ বৎসরে পড়িলেন। মা ধন্য! তাঁহার স্নেহ ধন্য! তিনি আমায় এত ভালবাসেন। আমি তাঁর প্রেমের কথাতো আর বলিতে পারি না; দেখে দেখে অবাক্! মার কাছে প্রাতে উঠিয়া প্রার্থনা করিলাম, মা, তোমার সন্তান বলে তিনি যখন একবার জীবন সঁপেছিলেন, তখন মার দয়া কখনও তাঁকে ছাড়িতে পারে না; কারণ মার মত স্নেহ জগতে আর নাই। সকলে ছাড়িতে পারে, কিন্তু আমার এই জগন্মাতা, অসহায়ের মাতা, দুর্ব্বলের মাতা, কখনও সেই দুর্ব্বল এবং অসহায় সন্তানকে ছাড়িবেন না। তাঁর এই নবজীবনের দিনে তাঁকে মা আপনার দিকে টানিয়া লউন।"

তুমি লক্ষ্ণৌ থাকিতে বৃন্দাবনের পুনর্বিবাহের সংবাদ পাইয়াছিলে। তখন সুসারকে বল নাই। লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আসার পর যখন সুসার এ সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, "আজ আমার জীবনের কি দিন! আজ বৈকালে জানিলাম, প্রাণনাথ

পুনরায় বিবাহ করেছেন। কি আঘাত! ভেবে দেখিলাম আজ যদি আমার পরম জননীর সান্ত্বনাক্রোড় না পাইতাম, কাঁদিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিতাম। কেবল জগজ্জননীর আশ্রয় ভেবে আমি আজ খাড়া হয়ে রয়েছি।" ধন্য মাতা, ধন্য কন্যা! সত্যই তোমরা এই গুরু পরীক্ষাকে ব্রহ্ম কৃপাগুণে হাল্কা করিয়া আপনাদের সমুদয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছিলে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : লক্ষ্ণৌ ত্যাগ ও লক্ষ্ণৌর ফল

এদিকে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইল। লক্ষ্ণৌর উৎসবে থাকিয়া তোমাকে লইয়া আসিব, ও পথে কয়েকটী স্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিব বলিয়া আমি কিছু দিনের জন্য ছুটী লইয়াছিলাম। তুমি ইহার মধ্যে একবার ভগিনী মহালক্ষ্মীকে দেখিতে গিয়াছিলে। তাঁহার মহাপ্রয়াণের সময় নিকট হইয়া আসিতেছিল। চিকিৎসা হয় তো পথ্য হয় না, খরচ পত্রের অভাব। ডাক্তার যাহা বলিতেছেন তাহা পালন হইতেছে না দেখিয়া, আমার মত না লইয়াই পথ্যের জন্য যে খরচ হইবে তাহা দিতে স্বীকার করিলে। লক্ষ্ণৌ উৎসবের জন্য প্রচারক মহাশয়েরা আসিবেন, তাই চাঁদা তোলা হইতেছিল। হাতে পয়সা নাই বলিয়া তুমি চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করিলে না, অথচ ভগিনীর পথ্যের যত খরচ হয় তাহা দিতে স্বীকার করিলে!

আমার প্রস্তাব ছিল যে তুমি ২৬শে লক্ষ্ণৌ হইতে ফয়জাবাদ আসিয়া থাকিবে। সেখান হইতে উভয়ে প্রাচীন অযোধ্যানগরী দর্শন করিয়া উৎসবের জন্য পুনরায় লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিব।

এই প্রস্তাব অনুসারে তুমি ২৬শে মহানারী মিস্ থোবর্ণের নিকট বিদায় লইয়া গোপাল বাবুর বাটীতে আসিলে। ফয়জাবাদ পর্য্যন্ত তোমাকে কে পৌঁছিয়া দিবে, গোপাল বাবু তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে

পারিতেছিলেন না, প্রাতঃকালে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তুমি বলিলে, যদি কোন লোক না যায়, আমি একাকীই যাইতে প্রস্তুত। ভাই গোপালচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে সামান্য বঙ্গনারীর পক্ষে ইহা স্বপ্নের কল্পনা। যখন দৃঢ়তা দেখিলেন, ষ্টেসনে যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দিলেন। ছেলেরা একজন ষ্টেসন পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিল। আর ফয়জাবাদ প্রবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকারকে তারে খবর দেওয়া হইল। দুইকন্যা ও তুমি কোনও পুরুষ মানুষ সঙ্গে না লইয়া অজানিত স্থানে যাত্রা করিলে। ফয়জাবাদ ষ্টেসনে মহেন্দ্র বাবু মেয়েদের গাড়ী তল্লাস করিয়া তোমাদের স্বীয় বাঙ্গালায় লইয়া গেলেন। সেখানে হাত মুখ ধুইয়া আবার ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলে। যেমন আমাদের ট্রেণ ফয়জাবাদ ষ্টেসনে পোঁছিল, অমনি গাড়ির অতি সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে আমরা সকলেই মহেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলাম।

মহেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালায় সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইল। আহারান্তে তুমি আমার কাছে আসিলে। নয় মাস পরে তোমাকে দেখিলাম। তপস্যায় তোমার দেহ চর্ম্মাবশেষ, মস্তক কেশহীন, হস্ত অলঙ্কার শূন্য, পরিধান সামান্য পরিচ্ছন্ন বস্ত্র, কিন্তু আমার সম্মুখে তুমি যেন দিব্য জ্যোতিতে উজ্জ্বল। এ তোমার কি রূপ! এ কি দেবী না মানবী? এত দেবসৌন্দর্য্য কোথায় পাইলে, এ তো পৃথিবীর রূপ নয়। তখন তোমাকে প্রণাম করিলাম কি না মনে নাই কিন্তু প্রণাম করিবার সময় ছিল বটে।

দেখিলাম, এই নয় মাসে তোমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মন প্রশস্ত হইয়াছে; বিদুষী নারীদের সঙ্গে মিশিয়া সাহস বাড়িয়াছে; কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে মনের চিন্তা বাড়িয়াছে; হৃদয়ের কোমলতা বাড়িয়াছে, উপাসনার মধুরতা বাড়িয়াছে। লক্ষ্ণৌ গিয়া নারীর মর্য্যাদা বুঝিতে শিখিলে! জীবনে কি কি করিতে হইবে তাহার পূর্ব্বাভাস এখানেই লাভ করিলে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে

কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও এখানে শিখিলে। তোমার পরিবার কিরূপে গঠিত হইবে, বিদ্যালয়ে কিরূপে কার্য্য করিতে হইবে, ছোট ছোট মেয়েগুলির হৃদয় কিরূপে আকর্ষণ করিবে, তাহাদের খেলার সাথী হইয়া কিরূপে তাহাদেরই একজনা হইবে, কিরূপে ছেলে মানুষের মত খেলিবে, দৌড়িবে, কিরূপে মধুমাখা হাসির দ্বারা তাহাদের শাসন করিবে, এ সকল সেখানে থাকিয়া দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিখিয়া আসিলে।

মহানারী মিস্ থোবর্ণের সঙ্গলাভ করিয়াই তোমার এমন অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এই উৎসাহময়ীর সঙ্গ লাভ করিয়া তোমার উৎসাহ দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নয় মাসে চারিখানি ইংরাজী পুস্তক পড়িয়াছিলে। দুটী চারিটী সরল ইংরাজীতে কথা কহিতে পারিতে। ইংরাজী সুরে "Oh my" এমন মিষ্ট করিয়া বলিতে যে, তাহা আমার অনেকবার শুনিতে ইচ্ছা করিত। পূর্ব্ব হইতে পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু মিস্ থোবর্ণের সঙ্গ লাভ করিয়া তুমি একেবারে স্থির করিয়া ফেলিলে, যে যদি বাহিরে যাইতে হয়, তাহা হইলে ভদ্রোচিত বস্ত্র পরিধান করা প্রয়োজন। সাড়ীর অঞ্চল মস্তক হইতে পড়িয়া যায়। যাহারা বাহিরের কাজ করিবে, তাহাদের পক্ষে সর্ব্বদা মাথার কাপড় উঠাইয়া লওয়া সম্ভব নয়। যাহারা পরহিত কামনায় বাহিরে যাইবে তাহাদের মস্তক ও মুখ ঘোমটায় আবৃত থাকিলে চলিবে কেন? মস্তক ঢাকিবার জন্য নন্‌দিগের মতন এক প্রকার মস্তকাবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলে। একদিন খেলিবার সময় মিস্ থোবর্ণ তোমার দেখাদেখি রুমালে মস্তক আবৃত করিয়া খেলা করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বঙ্গনারীর উদ্ভাবিত শিরোবসনে ভূষিত হইয়া কি সুন্দর না জানি দেখিতে হইয়াছিলেন। মিস্ থোবর্ণের দেখাদেখি তুমিও, না কামিজ, না অলষ্টার, গলা হইতে পদতল পর্য্যন্ত বিলম্বিত, এক প্রকার গাত্রাবরণ প্রস্তুত করাইয়াছিলে। কখনও এই গাত্রাবরণ সাড়ীর উপরে, কখনও বা সাড়ীর ভিতরে পরিতে। এই সময় হইতে

জুতা মোজা ব্যবহার করিতেও অভ্যস্ত হইলে। মোজা কাটিয়া গেলে অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প ব্যয়ে কিরূপে মেরামত করিতে হয়, তাহা ঐ বিদ্যালয়েই শিখিয়া আসিয়াছিলে। বঙ্গনারীর যে জড়সড় ভাব তাহা এই সময় হইতে তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। হঠাৎ বিপদ আসিলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা আর তোমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। তুমি বঙ্গনারীর উন্নত পদবী বুঝিলে। তাহার উন্নতি করা, তাহাকে রক্ষা করা, যেন তোমার জীবনের এক মহামন্ত্র হইল। তোমার মধ্যে উৎসাহাগ্নি প্রথম হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইত জানি না, যদি তুমি খ্রীষ্টান মাহিলাদের সঙ্গে এত দীর্ঘকাল না থাকিতে পাইতে। ভস্মে ঢাকা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আর সে অগ্নি কেহই নিবাইতে পারিল না। সেই অগ্নিই যেন তোমাকে গ্রাস করিল। ফিরিয়া আসিবার পর কেবল তোমাকে অগ্নিময় দেখিতাম, আর ভাবিতাম সে অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার হেতু খ্রীষ্টিয় মহিলাদিগের সঙ্গে বাস। এই নয় মাসে আবার উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারাও মিস্ থোবর্ণের শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলে। খ্রীষ্টানদের বাইবেল ক্লাসে যাইতে হইত, গির্জ্জাতেও যাইতে হইত, কিন্তু তাহাতে তোমাদের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় নাই। খ্রীষ্টের জীবনের ইতিহাস; তাঁহার ছোট ছোট উক্তিগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে। খ্রীষ্টানদিগের মত কার্য্যময় দয়ার ব্যাপারে কিরূপে নিযুক্ত থাকিতে হয়, বিপদের সময় বিশ্বাসীর মত ভগবানের উপর কিরূপে নির্ভর করিতে হয়, তাহাও ঐ সময় শিখিলে। শুদ্ধতা কি বস্তু তাহাও বুঝিতে পারিলে। গৃহে থাকিতে পাপবোধ তত প্রখর ছিল না। ধার্ম্মিকা মহানারীর সঙ্গলাভ করিয়া তোমার পাপবোধও কেমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল! সর্ব্বোপরি কেমন করিয়া পরসেবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দিতে হয়, এ শিক্ষাও খ্রীষ্টিয় মহিলাদিগের সংস্পর্শে থাকিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে।

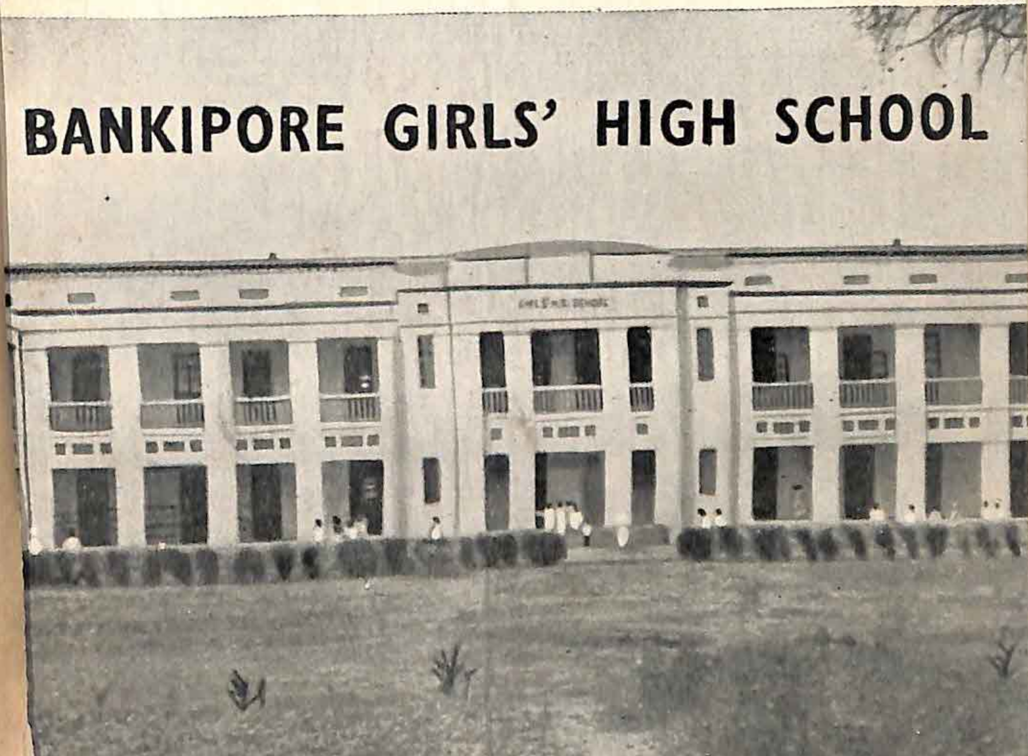
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিবার পথে।

লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া তোমার কানপুরে গিয়া—বাবুর বাড়ীতে উঠিবার কথা হইল। তাঁহার বাটীতে যাইবার প্রস্তাবে সকলে আপত্তি করিতেছিলেন, কারণ তিনি দুই বৎসর কাল উপাসনা করিয়াছেন; বাড়ীর উপাসনার ঘর বন্ধ। ক্রমে ক্রমে তিনি সরিয়া যাইতেছিলেন। তুমি কিন্তু তাঁহার বাটীতে যাওয়াই মীমাংসা করিলে। তোমার গমনে তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। ১লা ডিসেম্বর ১৮৯১ বেলা ৯॥০ টার সময় তাঁহার বাটী প্রবেশ। ১০টার সময় তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উপাসনায় যোগ দিলেন। নিজে উপাসনার ঘর পরিষ্কার ও প্রস্তুত করিলেন। বেশ উপাসনা হইল! অনেক দিন জমি পড়িয়া থাকিলে যেমন ভাল শস্য উৎপন্ন হয়, তেমনি ভাইয়ের পরম উপকার হইল। এমন সরল অনুতাপের ক্রন্দন অনেক দিন শুনি নাই। আবার সন্ধ্যার সময় মেয়েদের উপাসনা হইল। দুই বৎসর যাহার উপাসনার ঘর বন্ধ, আজ তাহার এ কি দশা? বাহিরে তিনি নিজে ধর্ম্মালোচনা করিলেন, ভিতরে তুমি মেয়েদের লইয়া উপাসনা করিলে। সকালে ভাইয়ের অনুতাপাশ্রু প্রমাণ করিল যে বিশ্বাস একেবারে পলায়ন করে না। স্বামী স্ত্রী উভয়ের মিলিত অনুরোধে পরদিন ৭টায় আবার উপাসনা হইল। ভাই ভগিনী উভয়েই উপাসনায় যোগ দিলেন, খুব ভাল উপাসনা হইল, দুই ঘণ্টা তাহার স্থিতি। ভাই অনুতাপ সূচক প্রার্থনা করিলেন ও অনেক কাঁদিলেন। দুই বৎসর পর এবার কাঁদিলেন ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। যখন তাঁহার বাটীতে যাইবার কথা হয়, তখন যাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ যদি ভাইয়ের অবস্থা দেখিতেন, তাঁহারাও কাঁদিতেন ও তোমাকে শত আশীর্ব্বাদ করিতেন।

কানপুর হইতে আগ্রা গমন করিলাম এবং তথায় একটী সরাইয়ে

बाँकीपुर बालिका उच्च विद्यालय, पटना

सत्य · शुद्धता · सेवा



অঘোর-কামিনী দেবী প্রতিষ্ঠিত বাঁকিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (পাটনা)

দ্বিতল গৃহে অবস্থিতি করিলাম। দুখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমরা সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইলাম। আকবর বাদসাহের তিনটী স্ত্রী ছিলেন, একজন হিন্দু, একজন খ্রীষ্টান, একজন মুসলমান। জীবনে তিনজনার সম্মান দেওয়া তাঁহারই পক্ষে সম্ভব ছিল। বিধানের প্রথম সূত্র সেইখানে। আচরণে দেখাইলেন, সকল আত্মাই ভগবানের, সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে। তাজমহল দেখিয়া ভালবাসার মহত্ত্ব বুঝিলে।

৪ঠা ডিসেম্বর মথুরায় শ্রীযুক্ত বাবু———মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তোমরা ভিতরে গেলে, আমি বাহিরে রহিলাম। ইহাতে তোমার মনে ক্লেশ হইতে লাগিল। অনেক দিন অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়াছ এখন আর কেন ভাল লাগিবে? কোনও উপায়ে একত্রে উপাসনা হইল। একত্রে উপাসনা হইবে না, ইহা কি তোমার প্রাণে সয়? তার পরদিন ৫ই প্রাতঃকালে Dr. Miss Sheldonএর স্কুলে উপাসনা করিলাম। আমার উপাসনার স্থান পাইতেছি না শুনিয়া Miss Sheldon স্কুল খুলিয়া দিয়া সেখানে স্থান করিয়া দিলেন। সকলে মিলিয়া উপাসনা করিয়া সুখী হইলাম। ঠিক যেন ধর্ম্মের লোকের জন্য আয়োজন করিয়া দিলেন। Miss Sheldon এক জন M. D. কিন্তু কোন অভিমান নাই। নিজ হাতে দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া উপাসনা করিতে অনুরোধ করিলেন। এমন করিয়া অপর ধর্ম্মাবলম্বীর উপাসনার সহায়তা কে করে? এখানে এ বিষয়ে তোমার বিশেষ শিক্ষা লাভ হইল? ৬ই ডিসেম্বর বৃন্দাবনে গোবিন্দ দেবের মন্দির, গোঠের মন্দির দেখা হইয়া গেল। তোমার মনে হইল এখানকার সকলই মিষ্ট। ভিখারীগুলি অনেক দূর পশ্চাতে পশ্চাতে আইসে, একটী সিকি পয়সা দিলেও দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যায়। অন্য স্থানের ভিখারীরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। ৭ই সনাতনের সমাধি দেখিতে গেলাম। তিনি যে পরম বৈরাগী ছিলেন, সেই স্থানটী তাহার পরিচয় দিতে

লাগিল। কোনরূপ বিলাসের চিহ্ন নাই, শিশুগুলিও একটী পয়সা চাহিল না। স্থানটী সন্তোষ-পূর্ণ।

৮ই তারিখে প্রেমানন্দ স্বামী নামক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কিরূপে সহজে দোষ স্বীকার করিতে হয়, উচ্চ নীচ বিচারশূন্য হইয়া সকলের নিকট হইত যোড় করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে হয়, এ সকল বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিলে। তথা হইতে মথুরা কানপুর ও এলাহাবাদ হইয়া ১৫ই ডিসেম্বর মোগলসরাই আসিলে। অসি নদীর তীরে একজন মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মোকামার দিদি (শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) সঙ্গে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নারীর বেদে অধিকার আছে কি না? সন্ন্যাসিনী বলিলেন স্ত্রীর অধিকার নাই। কিন্তু স্ত্রীর আটটী লক্ষণ আছে। যথা, (১) অদয়া (২) ভয়, (৩) অবিবেক, (৪) সাহসহীনতা, (৫) চঞ্চলতা, (৬) মায়া, (৭) অশৌচ, (৮) অনর্থ। এই লক্ষণগুলি থাকিলে স্ত্রী বলা যায়। যাহাতে এ লক্ষণ নাই, তিনি স্ত্রী নহেন, তাঁহার বেদে অধিকার আছে।

তথা হইতে কাশী হইয়া ১৬ই ডিসেম্বর খগোলে ভাই ষষ্ঠী-দাসের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলে, এবং সকলকে লইয়া বাঁকিপুরে আগমন করিলে। বাঁকিপুরে তোমার জন্য এমন অভ্যর্থনা অপেক্ষা করিতেছিল, যেন তুমি মহাযুদ্ধ জয় করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়াছ। রাজপথ হইতে গৃহ পর্য্যন্ত দীপমালা শঙ্খধ্বনি, আলো বাদ্য প্রস্তুত। মানুষের জন্য মানুষ এত করে তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। বাটীতে আসিবামাত্র তুমি উপরের ঘরে দৌড়িয়া গেলে, প্রবোধের বিধবা পত্নীকে আলিঙ্গন করিলে, তারপর ঘরে উপাসনা করিতে গেলে। উপাসনার ঘর খুব ভাল করিয়া সাজান হইয়াছিল।

অঘোর-প্রকাশ

পরিণতি

পঞ্চম খণ্ড ঃ সেবিকা

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ শিক্ষয়িত্রী

১লা জানুয়ারী ১৮৯২ হইতে ভাই পরেশের সহিত মিলিয়া তুমি বাঁকিপুরের গঙ্গাতীরের নিকটবর্ত্তী Boilard সাহেবের বাঙ্গালা ভাড়া লইলে। দুই পরিবার, কিন্তু উপাসনার ঘর একটি ; তার সম্মুখে লেখা হইল "মহামিলনের গৃহ।" উপাসনা একত্রে হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মাঘোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঁকিপুরের উৎসব সম্পন্ন করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করা গেল। ১৩ই মাঘ একটি নূতন ব্যাপার হইল। তাহা লইয়া তোমাকে ও আমাকে অনেক নিন্দা শুনিতে হইয়াছিল, কিন্তু তোমার মন একবারও টলে নাই। যে কাজ ঠিক বুঝিতে, তাহা তুমি শত বাধা সত্ত্বেও করিতে।

ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিভূমি, ঈশ্বর পিতা এবং নরনারী ভাই ভগিনী। এখানে সকলের সমান অধিকার। পুরুষ বড়, নারী ছোট, এখানে এ কথা কেহ বলিতে পারে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সত্য তোমার হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছিল। তাই উপযুক্ত বুঝিয়া তোমাকে রাজপথে সঙ্কীর্ত্তনের অধিকার দিতে চাহিলাম। তোমার কাছে যেমন বলা, তোমারও তেমনি তাহা করা। তোমার নিজের উপাসনা গৃহ হইতে তুমি পূর্ব্বেই অবরোধ তুলিয়া দিয়াছিলে। কিন্তু সামাজিক উপাসনায় অবরোধ উঠে নাই, কারণ বাঁকিপুর অবরোধ প্রধান স্থান। তোমার মনে থাকিতে পারে, প্রথম যখন বাঁকিপুরে আসিলে, বন্ধুরা পাল্কি করিয়া তোমাকে নামাইয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে তোমাদের

কার্য্যের ফল অন্য ভাইদের স্পর্শ না করে, এমন স্থানে, (বিহার নগরীর রাজপথে), ব্রহ্ম নাম করিবে স্থির হইল। শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয়কে বলিলাম, তিনি আনন্দিত হইলেন। সঙ্কীর্ত্তনের সমুদয় ভার তিনি লইলেন। সম্মুখে খোল বাদক ও শ্রদ্ধেয় মহাশয়, মাঝখানে নারীদল ; ছোট ছোট মেয়েরা নিশান ধরিয়া চলিতেছেন। চারি পাশে ও পশ্চাতে আমাদের লোকজন তোমাদের রক্ষীরূপে চলিতেছে। বাঁকিপুরের রাজপথে যদি সঙ্কীর্ত্তন হইত, তাহা হইলে পুরাতন হিন্দু সম্প্রদায় ও রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ভাই সকলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন। অপরিচিত বিহার নগরী ধার্য্য হওয়াতে তখন আর কেহ কিছু বলিলেন না। সঙ্কীর্ত্তন হইয়া গেল। বুঝা গেল, ভার দিলে নারী খুব ভাল সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারেন, ও লোকের মনকে আকর্ষণ করিতে পারেন।

তৎপর দিবস "শিলাও" বাজারে তুমি বক্তৃতা দিলে, ভাই বলদেও নারায়ণও কিছু বলিলেন। তোমার বক্তৃতা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে, কিন্তু ভাবে ভরা ; চক্ষে জল পড়িতেছিল। আমি দূর হইতে দেখিতেছিলাম, দেবী কিরূপে পাপী সংসারী মানুষের জন্য ক্রন্দন করিতে পারেন। এ সকল তোমাকে কে শিখাইল, তাহা জানি না। ২৬শে জানুয়ারী গৈরিক পরিয়া কমণ্ডলু লইয়া দুই তিন জনা সঙ্গীনীর সঙ্গে কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাজগৃহে যাইবার পথে গৃহে গৃহে ব্রহ্মগুণগান করিয়াছিলে। গৃহস্থেরা সামান্য ভিখারী জানিয়া ভিক্ষা দিতে আসিলে বলিতে, "ভিক্ষা চাই না, হরির শরণাপন্ন হও"। ২৬শে রাত্রিরে রাজগৃহে পৌঁছিলে। ২৭শে জানুয়ারী আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ উৎসবের প্রথম সাম্বৎসরিক সম্পন্ন হইল। সকল সাধু সাধ্বীর পদধূলি ভিক্ষা করা গেল।

এইরূপে উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। ইহার পর তুমি তোমার কাজ আরম্ভ করিলে। বাঁকিপুরের বালিকাবিদ্যালয়টী তখন উঠিয়া যায় যায় হইয়াছিল। নবেম্বর মাসে শিক্ষয়িত্রী পরলোক গমন

করিয়াছেন, সেই হইতে আর স্কুলের কাজ হয় নাই। দশটী অল্প বয়স্কা কন্যা তখন স্কুলের ছাত্রী। স্কুলের আয় ছিল মাসিক ৪৮৲ মাত্র, কিন্তু চাঁদা প্রায়ই পাওয়া যাইত না। এমন সময় স্বর্গগত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় আমাদিগকে স্কুলের ভার লইতে বলিলেন! আমি বলিলাম, "মেয়েদের থাকিবার জন্য স্কুলে স্থান দেওয়া হউক, আর মিসেস্ রায়কে স্কুলের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হউক।" তিনি বলিলেন, "মিসেস্ রায় কাজ করিতে থাকুন, আপনিই তিনি সমুদয় ভার পাইবেন।" বাস্তবিক তাহাই হইল। তুমি ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ভার লইয়া পুনরায় স্কুলের কাজ আরম্ভ করিলে। সে কিরূপ ভার? টাকা নাই, তুমি যেখান হইতে পার টাকার যোগাড় করিবে, না পারিলে নিজে দিবে। বালিকা নাই, বাড়ী বাড়ী গিয়া, বিদেশে দেশে ঘুরিয়া ছাত্রীসংগ্রহ করিবে। শিক্ষক নাই, শিক্ষকের বন্দোবস্ত করিবে ও নিজেও পড়াইবে। ছোট ছোট মেয়েদের শ্রেণীতে তুমি নিজেই পড়াইতে লাগিলে।

এদিকে তোমার পরিবারের কাজও চলিতে লাগিল। তিনটী কন্যা পূর্ব্ব হইতেই আসিয়াছিলেন, এখন আরও আসিতে লাগিলেন তুমি মাতা হইয়া তাঁহাদের শরীরের সেবা, শিক্ষার ব্যবস্থা, চরিত্র পরিদর্শন, ধর্ম্মজীবন গঠন সকলি করিতে লাগিলে। প্রভাতে সন্ধ্যায় "পরিবারের" পরিচর্য্যা, দ্বিপ্রহরে বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ, ইহা ছাড়া বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদয় সাধারণ বন্দোবস্তের ভার তোমারই উপরে পড়িল। কেমনে তুমি এত ভার লইয়া পারিয়া উঠিবে আমিও পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না; কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতাম, সকল মানবাত্মাই অনন্ত শক্তির অধিকারী, তাই বুঝিতাম মার কৃপায় তুমিও পারিবে। দেবি, এখন হইতে তুমিও কাজে নিযুক্ত, আমিও নিযুক্ত; তুমি ও আমি উভয়ে নিজের নিজের ক্ষেত্রে দায়িত্বভার বহন করিতে লাগিলাম। তোমাতে ও আমাতে জীবনের অবস্থার প্রভেদ আরও ঘুচিয়া যাইতে লাগিল।

মিলন বাড়িতে লাগিল। এ কিরূপ মিলন? তুমিও আমার মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা নয়; তুমি আমার সম্মুখে নিজের মহৎ অধিকার লইয়া, নিজের স্বাধীন দায়িত্বভার লইয়া দাঁড়াইবে, আবার সাধনে ও তপস্যায় আমার সঙ্গিনী হইবে—এইরূপ মিলন। এ মিলন এক দিনে শেষ হয় না, ইহা চির-উন্নতিশীল। যতই তোমার কাজ বাড়িতে লাগিল, ততই আমিও তোমার সাহায্য করিয়া অতি উচ্চ সুখে সুখী হইতে লাগিলাম; আবার যখন তোমার ও আমার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইতে লাগিল, তজ্জনাই আত্ম ইচ্ছাত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলাম। এ শিক্ষা সব সময় সহজ হয় নাই, কিন্তু এ শিক্ষা বিনা কে কবে উচ্চ মিলন সম্ভোগ করিয়াছে?

মার্চ্চ মাসের শেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ২৯ হইল। এ ছাড়া ১৫টী হিন্দুস্থানীর মেয়ে আসিতে লাগিল। বিদেশ হইতে কন্যাগণ তোমার পরিবারে আসিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় তোমার অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু তোমার সকল কাজকেই আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ব্রজগোপাল তোমার কাজে যোগ দিতে চাহিলেন। আর এই সময়ে প্রবোধের বিধবা পত্নী স্বীয় কন্যাটীর ভার তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া, বয়স হইলে পাত্রস্থ করিতে বলিয়া দিয়া, মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন।

স্কুলের কাজ হাতে লইয়া তোমাকেও অনেক শিখিতে হইল। প্রতিদিন শত কাজের মধ্যেও খানিকক্ষণ পাঠ করিতে হইত। এই কাজটী নিয়মিতরূপে করিতে। একবার স্কুলে ভূগোল পড়াইবার প্রয়োজন হইল। ভূগোল তুমি জানিতে না। তোমার প্রধান মন্ত্রী আমি, আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কি করিবে। মন্ত্রী বলিলেন, "একটু পড়িয়া লও না!" তুমি তাহাই করিলে, এবং স্কুলে গিয়া পড়াইলে। অঙ্কও জানিতে না। যখন

অঙ্ক শিখাইবার প্রয়োজন হইল, তখনও ঐরূপে নিজে শিখিলে তারপর শিখাইলে। একটি কথা তুমি খুব বুঝিয়াছিলে, তাহা এই, যে মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে অধিকাংশ লোকের মনোযোগ নাই; অথচ তাহারা যাহাতে সংসারের রান্না বান্না প্রভৃতি কাজ করিবার উপযুক্ত হয় সে দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আছে। তাই তুমি লেখাপড়া শেখার দিকটাতেই বেশী জোর দিতে। একদিন আমি বলিলাম, "মেয়েদের রান্না শেখা হইতেছে না।" তুমি বলিলে, "এখন যে সময় আছে তাহা পড়িতে কুলায় না; তাহা হইতে রান্নার জন্য সময় কাটিলে চলিবে না। ৭।৮ বৎসর মাত্র মেয়েরা পড়িতে পায়, তাহা হইতে যদি রান্না শিখিতে সময় কাটিয়া লওয়া যায়, তবে কিছুই শিক্ষা হইবে না। আমি ১৫ দিনের মধ্যে মেয়েদের রান্না শিখাইয়া দিব।" যখন তুমি এই কথাগুলি বলিতেছিলে, তোমার ব্যাকুলতা চোখে মুখে যেন আঁকা দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই দিন হইতে আর আমি এজন্য পীড়াপীড়ি করিতাম না। অথচ দেখিতাম তোমার পরিবারের মেয়েরা রন্ধনের প্রাইজ পাইত। পাঠের সুব্যবস্থা যাহাতে হয়, সর্ব্বদা ও সকলের জন্য সে চেষ্টা করিতে। তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবোধ রাত্রিতে শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িতেন, পাঠের সময় পাইতেন না, তাই তুমি সুবোধের চেয়ারের সম্মুখে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত খাড়া বসিয়া থাকিতে, সুবোধের নিদ্রা আসিলেই জাগাইয়া দিতে।

স্কুলে উপস্থিত হওয়া ও স্কুলের কাজ করা সম্বন্ধে তোমার নিয়ম দেখিয়া বেতনভোগী শিক্ষকেরাও আপনাদিগকে নিয়মিত করিতেন। শরীর অসুস্থ থাকিলেও সহজে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিতে না। অনেক দিন আহার করিয়া যাইতে পারিতে না। কখনও কখনও তোমার খাদ্য স্কুলে লইয়া যাওয়া হইত, কিন্তু সে শুষ্ক অন্ন গলাধঃকরণ করা কঠিন হইত। অবকাশের (টিফিনের ছুটীর) সময় বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিয়াছি, মেয়েদের সঙ্গে তুমি

প্রাঙ্গণে দৌড়িতেছ, কিরূপে খেলিতে হয় তাহা শিখাইতেছ। তুমি এ সময়ে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীও অল্প শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলে।

এ সকল তো স্কুলের সময় করিতে। তারপর আর একটি কাজ ছিল সেটী বাড়ী বাড়ী গিয়া মেয়ের মা-দের সঙ্গে দেখা করা। অনেক খোসামোদ করিয়া তবে এক একটি মেয়ের যোগাড় করিতে। বিদ্যালয়ের মেয়েরাও তোমাকে আপনার লোকের মতন ভাল বাসিত। তারা তোমাকে "মাইজী" বলিত। "মাইজী" বলিলে বিদ্যালয়ের বালিকামাত্রেরই মন ভালবাসায় পূর্ণ হইত।

তোমার দৈনিক পড়িলে বুঝা যায়, এই সময়ে তোমার কাজ কত বাড়িয়া চলিল। একদিনের কতগুলি কাজের তালিকা এই। (১) ছেলেদের আহার দেখা, (২) পাঠ, (৩) উপাসনা, (৪) রোগীর সেবা, (৫) স্কুলে যাওয়া, (৬) ধোপার বস্ত্র লওয়া ও দেওয়া, (৭) দেখা করা, (৮) লেপ প্রস্তুত করা, (৯) নূতন বন্ধুর বাটীর সংবাদ লওয়া। (১০) জুতার বন্দোবস্ত করা, (১১) এষ্টিমেট করা এবং বেতন দেওয়া। দেখিতে ও শুনিতে হয়তো সহজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের পক্ষে এ অনেক কায। ইহার মধ্যে দেখা করাটা একটা বিশেষ কাজ ছিল। নূতন কোন বন্ধু আসিলে একবার যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিত। কেন না নূতন স্থানে কেহ আসিলে তাহাকে কত অসুবিধায় পড়িতে হয়, তাহা তুমি বিলক্ষণ বুঝিতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে, ও সাহায্য করিতে। যদি কাহারও ফিলটার আবশ্যক হইল, মিসেস্ রায় তাহা প্রস্তুত করিবেন। বালি, কয়লা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর হাঁড়ি বসাইতে হয়, তোমাকে গিয়া বলিয়া দিতে হইত। কখনও কখনও কোন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া ভদ্র পুরুষদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইত।

পাছে বাহিরের বড় বড় কাজে মন গেলে সংসারের কর্ত্তব্য ভাল করিয়া করা না হয়, তাই সদাই তুমি চিন্তিত হইতে। ছেলেরা কি খাইল কি না খাইল, তার তত্ত্বাবধান করিতে তুমি সদাই সযত্ন হইতে। সেইজন্য ছেলেদের সঙ্গে একত্রে আহার করিতে ভাল বাসিতে। খাবার জিনিষ দেওয়া বিষয়ে তোমার মতন সমদৃষ্টি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। একদিন রন্ধনের কর্ত্তা আমার পাত্রে অনেক বেশী বেশী বস্তু দিয়াছিলেন। তারতম্য এত অধিক যে ছেলেদের সম্মুখে বসিয়া আমার খাওয়া অসম্ভব হইতেছিল। কি করিব ভাবিতেছিলাম; তোমার আহারে আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। তুমি আসিবামাত্র আমার মনের ভাব বুঝিলে এবং আমাকে কিছু না বলিয়াই আমার পাত হইতে দ্রব্যাদি তুলিয়া লইয়া সকলকে সমান ভাগ করিয়া দিলে; আমি বাঁচিলাম। ছেলেদের খাওয়া দেখা যেমন, তেমনি অতিথির আহারের বন্দোবস্ত করাও তোমার একটা নিত্য ব্রত ধর্ম্ম ছিল। অতিথির সম্মুখে বসিয়া তুমি আহার করাইতে, অন্যের হাতে এ ভার দিয়া রাখিতে না। যে কোনও সময় হউক না কেন, অভ্যাগত জনকে কখনও বাসী ভাত কিম্বা বাজারের খাবার খাইতে দিতে না। পূর্ব্বাহ্ণে, অপরাহ্ণে, রাত্রিতে সর্ব্বদাই গরম ভাত দিতে চেষ্টা করিতে। ভাই চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গল্প করেন, একবার তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া স্থির করিলেন, প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়া ৭টার ট্রেণে গয়া যাত্রা করিবেন, এবং গয়ায় গিয়া আহার করিবেন। এই সংকল্প করিয়া উপাসনা করিতে বসিলেন। যেমন উপাসনা শেষ হইল অমনি দেখেন যে তাঁহার সম্মুখে গরম খিচুড়ী প্রস্তুত। এদিকে তুমিও উপাসনায় বসিয়াছিলে, কখনই বা খিচুড়ী প্রস্তুত করিলে কেহই বুঝিতে পারিলেন না। উপাসনায় বসিবার পূর্ব্বেই কেরোসিনের ষ্টোভে খিচুড়ী চড়াইয়া দিয়াছিলে। উপাসনা ফেলিয়া কখনও আহারের বন্দোবস্ত করিতে যাইতে না।

তোমার পিসিমাতারা একবার গয়া তীর্থ করিবার জন্য তোমার গৃহে আসিয়াছিলেন তুমি নিজে তাহাদের সেবার আয়োজন করিয়া দিলে, কিন্তু রন্ধন করিলে না। অন্যান্য হিন্দু কুটুম্ব আসিলেও ঐরূপে আহারের সব আয়োজন করিয়া দিতে, কিন্তু সাবধান হইয়া একটু অন্তরে অন্তরে থাকিতে। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ব্রাহ্ম বন্ধুরা দয়া করিয়া প্রায়ই আসিতেন। বড় মানুষ অতিথি হইলে বড় মানুষের মত আয়োজন করিতে হইত। তাহাতে কখনও কখনও খরচের অকুলান হইত। শেষে লজ্জা ত্যাগ করিয়া যাহা আছে তাহাই দিতে, এবং তাহা দিয়াই ভক্তিভাবে সেবা করিতে। মাসের শেষে কখনও কখনও অতিথিকে দিবার উপযুক্ত মিষ্টান্ন থাকিত না। কিন্তু প্রাণান্তেও বাজারে দেনা করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুবিধা হইলেই সন্তানদের লইয়া একত্রে আহার করিতে বসিতে। নিজের সন্তান ছাড়া স্থানীয় স্কুলের ছাত্রদিগের প্রতিও তোমার দৃষ্টি থাকিত। একবার কলিকাতা হইতে ৪টা নারিকেল আসিয়াছিল। প্রিয় বস্তু পাইয়া আপনার ছেলে মেয়েদের খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলে না। পিঠা প্রস্তুত করিলে, আদর করিয়া সার্ভে এবং মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগকে তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পৌষ পিঠা খাওয়াইলে।

একবার একটা সার্কাস পার্টি বাঁকিপুরে আইসে। তাহাদের মধ্যে এক জন টাইফয়্‌ড জ্বরে আক্রান্ত হন। তাঁহার পীড়া সংক্রামক বলিয়া তাঁহাকে কেহ স্থান দিতে চাহে নাই। তুমি তাঁহাকে নিজগৃহে আনয়ন করিলে; ঔষধ, পথ্য দিয়া ও যথাবিহিত সেবা করিয়া নীরোগ করিলে এবং স্বদেশে পাঠাইয়া দিলে। যুবা তোমার সেবায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যখন শুনিলেন যে তুমি দেহত্যাগ করিয়াছ, তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যে কোনও বিষয়ে লোকের একটু সাহায্য করিতে পারিলে তুমি সুখী হইতে। একবার একজন লোক বাঁকিপুরের মেডিক্যাল স্কুলের মাঠে বেলুন উড়াইলেন। তখন মেডিক্যাল স্কুলের মাঠ খুব বড় ছিল, হাঁসপাতালের বাড়ী তখনও তৈয়ারী হয় নাই। তোমার বাটী সে মাঠের অতি নিকটে। তোমার বাটীর ছাতে বসিয়া যাহাতে অন্য অন্য বাড়ীর মেয়েরা বেলুন উঠা দেখিতে পান, তার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলে। কিন্তু সে বাঙ্গালা বাড়ী, তার ছাত আছে তো সিঁড়ি নাই। সিঁড়ি নাই বলিয়া তুমি এক বুদ্ধি করিলে। খান পঁচিশেক তক্তপোষ যোগাড় করিয়া তাই সাজাইয়া প্রকাণ্ড সিঁড়ি প্রস্তুত করাইলে। তোমার নিমন্ত্রণে অনেক হিন্দু মেয়েরাও আসিয়া বেলুন দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

নয়াটোলার বাটীতে থাকিতে একবার তোমার পার্শ্বের খোলার ঘরে আগুন লাগিয়াছিল। তখন তোমার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ঈশ্বর-স্মৃতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তোমার দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্র আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিবামাত্র তুমি উপরের ঘরে আসিলে; একখানা বড় সতরঞ্চি ছিল, সেখানাকে স্নানের ঘরের জলে ভিজাইয়া, জানালা দিয়া সেই জ্বলন্ত চালে নিক্ষেপ করিলে; তার উপর বাল্‌তি করিয়া জল দিতে দিতে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। যখন সতরঞ্চি নিক্ষেপ কর, তখন মুখে কেবল 'মা' 'মা' বলিতেছিলে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ গুপ্ত গোদাবরী

লক্ষ্ণৌ যাইবার পূর্ব্বে প্রায়ই তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে জেলার নানা স্থানে ঘুরিতে। অনেক দিন দূরে থাকিতে চাহিতে না। কিন্তু এখন দেবতা তোমাকে অন্য বিধির মধ্য দিয়া গড়িতে লাগিলেন। একস্থানে ক্রমাগত থাকিয়া, দায়িত্বপূর্ণ ভার বহন করার যে শিক্ষা তাহা তোমাকে গ্রহণ করিতে হইল। কর্ত্তব্যের খাতিরে আমাকে

মফঃস্বলে যাইতে হইত, কর্ত্তব্যের খাতিরে তোমাকে প্রায়ই বাঁকিপুরে বাঁধা থাকিতে হইত। মাঝে মাঝে ছুটী পাইলে আমার সঙ্গে বাহিরেও যাইতে। যাদের জীবনে নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, তারা যখন মাঝে মাঝে নির্জ্জন প্রকৃতির সঙ্গ পায়, তখন তাদের কতই উপকার হয়! অন্যের এত হয় না। তুমি এখন হইতে এ উপকার পাইতে লাগিলে।

মাঝে মাঝে আমি যখন তোমার কিছু ত্রুটি ধরিয়া দিতাম, তখন তোমার মনে কিরূপ সংগ্রাম আসিত, তোমার দৈনিক পড়িলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আগষ্ট মাসে একদিন লিখিয়াছ, "আজ স্বামী মহাশয়ের প্রার্থনায় নিরাশের কথা শুনিয়া মন জাগিয়া উঠিল। এখনও যে ত্যাগ স্বীকার হয় নাই তাহা বুঝিলাম।" তারপর প্রার্থনা করিলে, "নিজকে ভুলিয়া তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য শেষ ক'টা দিন যেন কাটাইতে পারি। তোমার ও তোমার সন্তানের সাধ পূর্ণ করাই আমার জীবনের কাজ। এই কাজ প্রাণ দিয়া করিয়া শেষ দিনে উভয়ের প্রসন্নমুখ দেখিয়া যাইব। পূর্ব্বে আর একবার এই সাধনের ভিতর এসেছিলাম, কিন্তু এ বার তাহা অপেক্ষা সহজ বোধ হইতেছে। স্বামীর শরীর স্পর্শ করিবার যে সুখ তাহা ত্যাগ করিলাম, মুখছাড়া।" এতদিন পরে আবার এ কথা কেন? দেবি, তখন তুমিও দেহী ছিলে, আমিও দেহী। যতদিন দেহ থাকিবে, বুঝি দেহের সংগ্রামও থাকিবে। শ্রীঈশাই যখন শেষ দিন পর্য্যন্ত দেহের সংগ্রাম করিয়াছেন, তখন আমরা আর কোন্ ছার? এ সংগ্রাম তোমার পক্ষে অনেক কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু কখনও পিছ-পাও হও নাই। এক এক বারের সংগ্রামের অবসানে তুমিই আবার সাক্ষ্য দিয়াছ, "শরীরের সুখ ত্যাগে আরও যেন ভালবাসা বাড়িয়াছে। এখন দেখিতেই বেশী ইচ্ছা করে। মা! তুমি এই দর্শন আরও মিষ্ট করিয়া দেও। সংসারের কোন বাধা যেন আমাদের গতিরোধ না করিতে পারে, এই আশীর্ব্বাদ কর। পিকুর সহিত গোপন ভাব একেবারে

চলিয়া গিয়াছে। মা আশীর্ব্বাদ করুন, যদি কিছু থাকে হাড়ের ভিতরে, অজানিতরূপে, তাহাও যাক।" মিলনের ধর্ম্মে চলিতে হইলে গোপন করা যে অন্যায়, মনের ভাব গোপন করা যে পাপের লক্ষণ, তাহা বুঝিতে পারিলে। অকস্মাৎ মনে কোনও ভাবের উদয় হইলে অমনি দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিয়া যাইতে; পাছে মিলনধর্ম্মের কোন ক্ষতি হয়।

৩০শে আগষ্ট দৈনিকে লিখিয়াছ,—"পিকুর কোথাও যাইবার কথা শুনিলে বুকের ভিতর কেমন করে। তাহাতে বুঝিতেছি; এখনও আসক্তি আছে। নিশ্চয় ইহা যাইবে। যখন এইরূপ হয়, তখন পা ধরিয়া প্রার্থনা করি, পরলোক স্মরণ করি। মনকে এইরূপে ঠিক করি।" ক্রমশঃ শরীর সম্বন্ধে উভয়ের পাপবোধ সমান হইতে লাগিল। একদিন তোমার শরীর আমার শরীরে স্পর্শ হওয়াতে দুজনার সমান পাপবোধ হইয়াছিল। কাহারও কাহারও কাছে এটা একটা আজগুবি কথা মনে হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা আমাদের ত্যাগের মন্ত্র জানেন, কি এক অজড় ধর্ম্মশৈলে উঠিতে চাহিতেছিলাম তাহা যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা একথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন, আমাদের সংগ্রামও বুঝিতে পারিবেন।

পূজার ছুটিতে বিদ্যালয় বন্ধ হইলে কয়েকটী কন্যাকে লইয়া আমার সঙ্গে বেড়াইতে গেলে। এই ভ্রমণে তোমার অনেক উপকার হইয়াছিল।

পাটনা সহরে গঙ্গাবক্ষে পূর্ব্বকালের একটী পাকা বাড়ীর সন্ধান পাইয়াছিলাম। এ গৃহে ডচেরা (Dutch) বেহারের মাল খরিদ করিয়া বোঝাই করিত। তাহাদের পাকা রেক্তার গাঁথনি এখনও নষ্ট হয় নাই। এখন সে বাড়ী একজন নবাবের, ব্যবহার প্রায় হয় না। কয়েকদিনের জন্য সেই গৃহে গিয়া তোমার শরীর মনের অনেক উপকার হইল। তোমার দৈনিকে লিখিয়াছিলে,—"৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৯২ (পাটনা, নবাবের বাঙ্গালা)। প্রার্থনা—গঙ্গার নৌকা

দুরকমে চলে। এক, অনুকূল বাতাসে; মাঝিরা বসিয়া আছে, নৌকা আপনি চলিতেছে, খুব বেগে। আর রকমে, নৌকা প্রতিকূলে যাইতেছে; তাহাতে পাল দিয়া, চেষ্টা করিয়া মাঝিরা পালের দড়ি সাবধানে ধরিয়া বসিয়া আছে; যাইতেছে খুব শীঘ্র, কিন্তু ভয় আছে, দড়ি ছিঁড়িলে নৌকা মারা যাইবে। আমার অবস্থাও তাই। ভিক্ষা করি, মা, শীঘ্র শীঘ্র অনুকূল বাতাসে আমার জীবন-নৌকাকে নিয়ে ফেল।"

২৮শে সেপ্টেম্বর আমরা চুণারে গমন করিলাম। তোমরা গড় দেখিলে গঙ্গাস্নান করিলে। সেখান হইতে চিত্রকূট দেখিতে চলিলাম। আমা অপেক্ষা, তুমি অধিক ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর সীতাপুর পৌঁছান গেল। সে রাত্রি ষ্টেসনে কাটান গেল। ষ্টেসনটী অতি সুন্দর, বেশী লোক ছিল না। খোলা স্থানে সকলকে রক্ষা করিবার ভাবে আমি শয়ন করিলাম। বড় ভাল লাগিল। ৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে কতক গো-যানে কতক পদব্রজে চিত্রকূটাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বেলা ১০টার সময় গ্রামে পৌঁছিলাম। একটী দ্বিতল গৃহ ভাড়া করা গেল। সে বাসাটী নিরাপদ নয়, কিন্তু সেখানে তুলনায় সেটীকেই ভাল বলিয়া গ্রহণ করা গেল। নদীর তীরে রামঘাট দর্শন করিয়া সকলেই সুখী হইলে। ১লা অক্টোবর গুপ্ত-গোদাবরী দেখিতে চলিলাম। পথে দুটী ঘোড়া ভাড়া করা হইল, অন্য কোনও যান পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত—মহাশয়ের জন্য একটী অশ্ব নির্দ্দিষ্ট হইল; অপরটী আমার জন্য! অল্প দূর গিয়া তিনি বলিলেন, অশ্বে যাইতে পারিবেন না। তখন ঘোড়াটি লইয়া করা যায় কি? আর সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ অশ্বারোহণে যাইতে স্বীকার করিলেন না। তখন সেই অশ্বে তোমার চড়িয়া যাইবার প্রস্তাব হইল। বঙ্গনারীর অনেক কলঙ্ক আছে; তিনি দুর্ব্বলা, ভীরু। এ অপবাদ আরোপ তোমার সহ্য হইত না, সুতরাং অনুরোধ করিবামাত্র ৬।৭ মাইল অশ্বারোহণে চলিয়া গেলে। ঘোড়াটি ছোট ও শান্ত; পথও দৌড়িবার মত ছিল না; কিন্তু তুমি তো কখনও ঘোড়ায় চড়িতে

শেখ নাই। শেখ নাই, তাহাতে কি? তুমি জানিতে তুমি আত্মা; উন্নতির আত্মার স্বভাব; নূতন যাহা কিছু ভাল সম্মুখে আসে, তাহাতে অগ্রসর হইয়া চলাই আত্মার স্বভাব। এই স্বভাবের কাছে তোমার দ্বিধা, সঙ্কোচ ভয় সব উড়িয়া যাইত। লোকে ভাবিত তুমি নারী, তুমি কেমন করিয়া সাহসের কাজ করিবে? তুমি ভাবিতে, আমি আত্মা, আমি কেমন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব! আমিও ভুলিয়া যাইতাম, যে তুমি নারী। আমিও কেবল দেখিতাম, তুমি আত্মা; তোমাকে নিত্য নূতন নূতন পথে লইয়া যাওয়াই তোমার সেবা করা। অশিক্ষিতা বঙ্গনারী তুমি যখন জিন-শূন্য অশ্বপৃষ্ঠে চলিতেছিলে, আমার কাছে তখন দেখিতে অতি সুন্দর লাগিতেছিল। বেলা দশটার সময়, যে পর্ব্বত হইতে নির্ঝরিণী বাহির হইতেছিল, সে পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম। অনেকটা উঁচুতে চড়িতে হয়, পথে একটা ছোট গুহায় প্রবেশ করিতে হয়। ভিতরে হল ঘরের মত বিস্তৃত স্থান; তাহার পার্শ্ব দিয়া ক্ষুদ্র একটি স্থান হইতে উৎস উৎসারিত হইতেছে, দেখিতে পাইলাম। সে স্রোত কখনও বন্ধ হয় না।

এখন আমার মনে হয়, মানুষ মাত্রেরই মধ্যে এই গুপ্ত গোদাবরীর ভাব রহিয়াছে। প্রত্যেকের হৃদয়ে গুপ্ত প্রেমের প্রস্রবণ আছে। আহা, যদি কেহ তাহা আবিষ্কার করিয়া দিতে পারে, বাহিরে আনিতে পারে, পরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিতে পারে! তোমার মধ্যেও যেন এই ভাব ছিল। তোমাতে যেন গুপ্ত-গোদাবরী লুক্কায়িত ছিল। প্রথম জীবনে তাহার অপ্রশস্ত ভাব ছিল; তখন স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোনও ভাব তোমাকে অধিকার করিতে পারিত না। কেহ জানিতেও পারিত না যে, তোমার হৃদয়খানির মধ্যে প্রেম-প্রস্রবণ লুক্কায়িত ছিল। সাহস করিয়া তোমার হৃদয়-গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলাম বলিয়া সেই স্থায়ী প্রেম-ধারা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে নিজেও সুখী হইয়াছিলাম, প্রিয়জনেরাও সুখী হইয়াছিলেন। পরসেবায় সে প্রেম ধারাকে নিযুক্ত করিতে সাহায্য করিয়া আমিও ধন্য হইয়াছিলাম।

গুহাস্থিত প্রস্রবণ দর্শনান্তে সেই পর্ব্বতে বৃক্ষতলে বসিয়া লীলাময় হরির উপাসনা করিয়া সুখী হইলাম। ভৃত্য অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিল। উপাসনার পর আমরা আহার করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আবার তুমি অশ্বপৃষ্ঠে আসিলে; শরীরের কোনরূপ অসুবিধা হইয়াছে, এরূপ জানিতে দিলে না। বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। পথে রাত্রির জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা গেল। দুধ কিরূপে লওয়া যাইবে, এই প্রশ্ন উঠিল; কারণ আমাদের সঙ্গে কোনও পাত্র ছিল না। দোকানদারের স্ত্রী বিক্রয় করিতেছিলেন; অবশেষে তিনি বলিলেন "আমার পিতলের লোটায় লইয়া যাও।" আমরা আপত্তি করিলাম, বলিলাম, "যদি তোমার লোটা ফিরিয়া না আসে?" তিনি বলিলেন, "একবারই না?" অর্থাৎ একবার বই দুবার তো আর লোটা হারাইবে না। কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস! এটা স্থানের গুণ! এখানে কেহ কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। ঐ ঘটনা আমাদের মনে খুব ভাল ভাব উদয় করিয়া দিয়াছিল।

২রা অক্টোবর কাম্‌তানাথ পাহাড় দর্শন। এ শিলা অতি সুন্দরভাবে সুরক্ষিত। রামচন্দ্রের এ কাম্য পাহাড়, রাম সীতা অনেক সময় এখানে কাটাইতেন। আমরা ঐ পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে গেলাম। একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসিনী আমাদের আহার প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আমরা তথায় পাদপমূলে উপাসনা করিলাম। ৪ঠা অক্টোবর জানকীকুণ্ডে স্নান। পাহাড়ের নদী পাহাড় ভেদ করিয়া চলিয়াছে। একপার্শ্বে সাধকেরা গুহা প্রস্তুত করিয়া স্থায়ীরূপে বাস করিতেছেন। নিকটে দোকান নাই, কোন দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইলে তিন মাইল দূরে যাইতে হয়। কয়েক দিনের আহারের সামগ্রী একবারে লইয়া আসিতে হয়। স্থানটী বড় ভাল লাগিল, নির্জ্জনবাসের বেশ উপযুক্ত স্থান। নদীর জল বড় ভাল। এক স্থানে নদীবক্ষে উচ্চ হইতে জল পড়িয়া পড়িয়া জল গভীর হইয়াছিল, তাহারই নাম জানকীকুণ্ড। প্রবাদ আছে যে, এইখানে সীতাদেবী

বনবাসের সময় স্নান করিতেন। এই পবিত্র স্থানে আমরাও অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম। স্রোতের বেগে পরিধানের বস্ত্র টানিয়া রাখা কঠিন হইতেছিল। উপাসনায় সীতার চরিত্র ভিক্ষা করা গেল। সলিল পাথরের বাধা পাইয়া এত তেজাল হইয়াছে; সীতাদেবীও রাবণের কাছে বাধা পাইয়া এমন অতুল বীর্য্যবতী হইয়াছিলেন যে, রাবণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এ সংসারে কত রাবণ আছে! আমরা, বিশেষতঃ আমাদের মেয়েরা, কোমল হইয়াও যেন বলশালী ও বলশালিনী হইতে পারি। সন্ন্যাসিনী আমাদের জন্য রন্ধন করিতে ছিলেন; কোথা হইতে বানর আসিয়া জোর করিয়া তাঁহার কাছ হইতে চাল কাড়িয়া লইয়া গেল। বাসায় আসিয়া ২টার সময় আহার করা গেল!

৫ই অক্টোবর গৃহে প্রত্যাগমন করিব বলিয়া মানিকপুর ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম, এমন সময় জব্বলপুর হইতে সংবাদ আসিল, অদ্য গেলে নর্ম্মদার প্রস্রবণ দেখা যাইতে পারে। আহার প্রস্তুত, কিন্তু ট্রেণ আসিয়া পড়িল। তোমার আদেশ হইল, প্রস্তুত করা খিঁচুড়ী গাড়ীতে উঠাইয়া লইতে হইবে। যেমন বলা তেমনি করা; গিয়া একখানা খালি গাড়ীতে উঠিলাম। জব্বলপুরে একজন বন্ধুর বাটীতে রাত্রি কাটান গেল। ভোর ৩টার সময় এক্কা করিয়া জলপ্রপাত দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। নর্ম্মদাতীরে পৌঁছিতে বেলা ৯টা বাজিল। খানিক জল ভাঙ্গিয়া প্রপাতের নিকট গেলাম। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সকলে স্নান করিলাম। প্রপাতের তীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তর খণ্ডে উপবেশন করিয়া উপাসনা আরম্ভ করা গেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু আমাদের অভিষিক্ত করিতে লাগিল। খুব উচ্চৈঃস্বরে আরাধনা করিলাম, কেন না প্রপাতের শব্দ অতি প্রবল, এমন কি পরস্পরের কথাও শুনা যায় না। মনে হইল আমার মোটা গলার আওয়াজও সকলে পান নাই। সুতরাং তুমি ছাড়া কেহ যোগ দিতে পারিলেন কিনা জানি না। এমন সুন্দর স্থানে উপাসনায় যোগ না দিতে

পারিলে আমাদের দুজনারই বড় ক্ষোভ থাকিত। সুন্দর উপাসনার পর ডাকবাঙ্গালার পার্শ্বে রন্ধন ও আহার হইল। তারপর নৌকা করিয়া শ্বেত প্রস্তরের পাহাড় দেখিতে গেলাম। নর্ম্মদা শ্বেত পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রবাহিত। আমরা প্রায় দুই মাইল সেই প্রবাহ বহিয়া গেলাম। এমন শ্বেত মর্ম্মরের পাহাড় আর কখনও দেখি নাই। শ্বেত প্রস্তরে জল পড়িয়া কেমন ছোট বড় পাথরের বাটী হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তুমি আনন্দিত হইলে, আমার সমুদয় শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে হইতে লাগিল।

এই বার দিনের ভ্রমণে যেন আমরা দুই বৎসরের শিক্ষা লাভ করিলাম। সন্তানদের বাড়ীতে রাখিয়া তুমি যে সন্ন্যাসিনীর মত পথে পথে বেড়াইলে, ইহাতে তোমার মন কত প্রশস্ত হইল, কত উন্নত হইল। বিদ্যালয়ের কার্য্যের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশভ্রমণের শিক্ষাও যে কত আবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারিলে। ফিরিবার সময় আর কোথাও থামা হইল না।

ফিরিয়া আসিবার পর নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমরা দুজনাই খুব বাঁধাবাঁধি শাসনের মধ্যে পড়িলাম। রাত্রি ৪টার সময় উঠিয়া জপ, চিন্তা, পাঠ আলোচনা করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে যখন আমি তোমার কোনও অপূর্ণতা দেখিয়া অসুখী হইতাম, তখন আমার সে অসুখ তোমার জ্বালা দ্বিগুণ করিয়া দিত। কত সংগ্রাম করিতে, কত চেষ্টা করিতে, ভালবাসার খাতিরে কত ক্লেশ বহন করিতে। একদিন দৈনিকে লিখিয়াছ, "অপূর্ণতা দেখাইয়া বড়ই ব্যস্ত করিতেছ। বেশ, দেখাও। না দেখিলে তো শীঘ্র কাজ করিতে পারিব না। বল দাও, যাহাতে অপূর্ণতা দূর করিতে পারি।" আর একদিন লিখিয়াছ, "মা, তোমার দেওয়া ভার আমার বড় ভার বোধ হয়; আমি ফেলিতে ইচ্ছা করি। আর যেন বৃথা এ ইচ্ছা না হয়; সব যেন বহন করিতে পারি।" সত্য সত্যই এ সময়ে তোমার পরিশ্রম আমার অপেক্ষা অধিক হইত; শুধু পরিশ্রম নয়, নানারূপ কার্য্যের মধ্য দিয়া তোমার

মনের উপরে অতিরিক্ত চাপ পড়িতেছিল। তাই ৫ই ডিসেম্বর প্রার্থনা করিয়াছিলে, "সেই চরিত্র দেও, যাহাতে তোমাকে সুখী করিতে পারি, ও পরিবারের সকলকে সুখী করিতে পারি। ৬ই প্রার্থনা করিলে,—"তোমার ভালবাসার মুখখানি যেন সর্ব্বদাই দেখিতে পাই।" একে তো পরিবারের সকলকেই সুখী করা কঠিন। তাতে এই সময়ে বিধবা শাশুড়ী পরিবারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিনী, রোগে শোকে জর্জ্জরিতা; সকল সময়ে তাঁহার কথা কোমল থাকে না; তাঁহাকে সুখী করা আরও কঠিন। ভাগ্যে তুমি প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছিলে, তাই পারিলে। ৮ই ডিসেম্বর দৈনিকে লিখিয়াছ,—"আজ বড় পরীক্ষা। মা-রা কাল আসিয়াছেন। উভয়ের কর্ত্তব্য মিলাইতে খুব কষ্ট করিতে হইল, ছয়বার প্রার্থনা করিয়া বল ভিক্ষা করিতে হইল, তবে কিছু পারিলাম। আমার প্রার্থনা এই,—আমি আসিয়াছি এই জন্য যে দুঃখকে কেমন করিয়া সুখে পরিণত করিতে হয়, তাই শিখিব, ও জগতকে শিখাইব। তবে কেন আমি সুখ চাই? মা, তাই কর, যেন সুখ না চাই।" একদিকে শাশুড়ীর কাছে অন্তঃপুরের কুলবধূ হইয়া তাঁহাকে সুখী করিতে, আবার নারীর উন্নতির ও মর্য্যাদার আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য সাধারণের সহিত সম্বন্ধও ঠিক রাখিতে। যেন অভিনয় করা; এই অন্তঃপুরে সকলের চক্ষের জলের সঙ্গে চক্ষের জল মিশ্রিত করা, ক্ষণকাল পরে একাকী রেল গাড়ীতে বাঢ় ষ্টেসনে গমন। বাঢ়ে তখন মিঃ কে এন রায় ছিলেন। তিনি পুরাতন বন্ধু, তাঁহার সহিত দেখা করিতে আমি পূর্ব্বেই গিয়াছিলাম। ৮ই তারিখে তুমি একাকী গেলে, একাকী গাড়ী হইতে নামিলে। সাহস ও বিশ্বাস বাড়িল। কয়েক দিন বাঢ়ে মিঃ রায়ের বাটীতে দেবী সৌদামিনীর ভস্মাবশেষের নিকটে বসিয়া উপাসনা করিলে, এবং তাঁহার আত্মার শ্রেষ্ঠত্বের অনেক সাক্ষ্য দিলে। তিনি দেহে থাকিতে তোমাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন, অদেহী হইয়া এই দুই দিনও

দিলেন। এবারকার খৃষ্টোৎসব বাঁকিপুরে গঙ্গার চড়ার উপরে হইল।

এইরূপে ১৮৯২ সাল আমাদিগকে পৃথিবীতে রাখিয়া চলিয়া গেল। এখন আত্মিক ব্যাপারও বাড়িতে লাগিল, কাজও বাড়িতে লাগিল। রাজগৃহের জন্য সকলে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। তোমার এবারকার প্রস্তুতির বিশেষ ভাব—"মুখ মলিন করিব না।" তুমি বলিতে, "বিরক্তিসূচক কথা মুখে তো বলিতে পারিবেই না, মুখের ভাবেও দেখাইতে পারিবে না।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রোগ ও অর্থচিন্তার ভার

১৮৯৩ সালের মাঘোৎসবের পর ৩রা ফেব্রুয়ারী বেহার হইতে রাজগৃহ গমন করিতেছিলে। যাইবার সময় পুরুষ মানুষের সহায়তা ত্যাগ করিয়া একাকিনী পরম জননীকে সহায় করিয়া গ্রাম্য পথে সামান্য বেশে প্রার্থনা পূর্ব্বক হরিনাম গান করিলে, ও কোন কোন বাটীতেও গমন করিয়া নাম গান করিলে। বঙ্গনারীর পক্ষে এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! রাজগৃহে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৩।০ কি ৪টার সময় উঠিয়া প্রাঙ্গণে নাম গান হইত।

৫ই ফেব্রুয়ারী তুমি দৈনিকে লিখিয়াছিলে, "স্বামীনের সহিত একতা ঘন হইতে ঘন হইতেছে। এবার এই ভাবপ্রবণ নারীকে বড় করিয়া জননীর সম্মান রক্ষা করিব। এ বিষয়ে স্বামীন্ সর্ব্বদাই সাহায্য করেন। এবার কেবল জানিতে ও শিখিতে ইচ্ছা প্রবল। প্রসঙ্গ খুব ভাল ভাবে, শুদ্ধভাবে চলিতেছে, মন ভাল।"

৯ই রাজগৃহ পরিত্যাগ করিলে। বাজারে মেয়েরা হরিনাম গান, করিলেন। সংসার অনিত্য, সেই নাম সত্য, এ বিষয়ে মেয়েদের বলিলে। শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন।

এই সময়ে তোমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। পরিশ্রম ও চিন্তা

দুইই খুব বেশী হইত। অত বড় বিদ্যালয়টী স্কন্ধে পড়িল, তাহার জন্য কত খরচ। যা অভাব হয় তোমাকেই দিতে হয়। টাকার বিষয় আর কেহ ভাবেন না বড় কেহ দেনও না। নিজের সংসারের খরচ, আত্মীয়দের সাহায্য করা, সমাজের যে ব্যয় হইত নীরবে তাহার অধিকাংশ নিজে বহন করা, ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ের গাড়ীর খরচ বহন করা, এ সকলই তোমাকে করিতে হইত। সুতরাং তোমার অর্থ ভাণ্ডার প্রায় শূন্য থাকিত। তারপর সেই যে লক্ষ্ণৌতে শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে অসুস্থতা সত্ত্বেও কাজ করিতে বাধ্য হইল। ঠাণ্ডা লাগিলে বাতের মতন হইয়া শরীর ফুলিয়া উঠিত, তখন শয্যা আশ্রয় করিতে হইত। রাজগৃহের পরিশ্রমের পর নয়াটোলার বাটীতে আসিয়া একটু বৃষ্টি লাগিয়া তোমার বিশেষ পীড়া হইলে। দাঁতের গোড়া ফুলিয়া গলা ফুলিল, মুখ বন্ধ হইল। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। একদিন এমন হইল যে তোমার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। অবশেষে গালের ভিতরের ফোঁড়া আপনি ফাটিয়া গেল। আমার মন একটু চঞ্চল হইয়াছিল, মনে হয় বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় করিতে পারি নাই। ক্রমশঃ তুমি সারিয়া উঠিলে। এবারকার পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। অনেক শিখিলাম, তুমিও অনেক শিখিলে। এই পীড়ার কথা তুমি নিজে এইরূপ লিখিয়া রাখিয়াছ,—"শয়ন করিয়াই এবার দুইমাস উপাসনা করিলাম। রোজ নিত্য নূতন ভাবে স্বামীন কখনও পাশে, কখনও নিকটে বসিয়া মার নাম করিতেন। চুপ করিয়া থাকিতে ভাল লাগিত, কিন্তু যন্ত্রণা চুপ করিয়া থাকিতে দিত না। সময় সময় ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া ফেলিত। অন্য কাহাকেও কিছু বলিতাম না, সময় সময় স্বামীনের উপর সন্তানবৎ আব্দার করিতাম; অভিমানও করিতাম, তিলেকের জন্য; কিন্তু তাঁহার মাতৃসম স্নেহে তখনই ভুলিয়া যাইতাম। এই সময় তাঁহাকে আমি মা বলিয়া সম্বোধন করিতাম, সন্তানের ন্যায় তাঁহার

কোলে কখনও কখনও মাথা রাখিয়া জননীর স্নেহ সম্ভোগ করিতাম। স্বামী যে মা হইতে পারেন তাহার প্রমাণ এইখানেই। কিছু খাইতে পারিতাম না বলিয়া রাজকর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় শেষ করিয়া বেলা ১১টার * সময় বাটী আসিয়া নিজে রন্ধন পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া দিতেন।"

তুমি ভাল হইয়া উঠিয়া কিছুকাল শয্যায় শয়ন করিয়াই কাজ করিতে লাগিল। আমার শরীর যদি ভাল থাকিত, তোমার অনেক সাহায্য করিতে পারিতাম। কিন্তু কলিক ও ডিস্‌পেপসিয়া আমার শরীর চূর্ণ করিয়াছিল সুতরাং আমার জন্যও তোমাকে চিন্তা করিতে ও পরিশ্রম করিতে হইত। মধ্যে স্কুলের কোনও ব্যবস্থা করিয়া নিজের বা আমার বা কোনও সন্তানের স্বাস্থ্যের অনুরোধে মফঃস্বলে কিম্বা গঙ্গার ধারে চলিয়া যাইতে হইত। ইহাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইতেন। মানুষের সহানুভূতি না পাইলে, যে কাজ করে তাহার মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা তুমি এই সময় খুব বুঝিতে লাগিলে, আর ভগবানের উপর নির্ভর বাড়িতে লাগিল। বড় ক্লেশ হইলে তুমি আমাকে এবং আমি তোমাকে মনের সকল দুঃখ তাপ বলিতাম।

কতরূপ টাকার ব্যবস্থা যে তোমাকে করিতে হইত, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্র হইতে কিছু পরিমাণে তাহা জানা যাইতে পারে। সেই পূর্ব্ব পরিচিত খৃষ্টান পরিবারটির সঙ্গে তোমার কিরূপ আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল, এ পত্রগুলি তাহারও নিদর্শন।

"Chandernagore 25th August 1893.

প্রিয় দিদিমণি!

আপনাকে দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমার স্বামী এই ১৭ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন আমি অত্যন্ত

* এই সময় কাছারী সকালবেলা হইত।

মনের কষ্টে আছি; আমার নিকট আমার ভগ্নী মিসেস চক্রবর্ত্তী ও আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ফুলকুমারী আছে। * * * আপনি অনুগ্রহ করিয়া—র জন্যে যে টাকা পাঠান তাহা এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার ঠিকানায় পাঠাইবেন। কারণ দিদি এখন আমার নিকটে আছেন। * * *—আপনার স্নেহের এলিস।"

"Chandernagore. 5-9-93.

প্রিয় ভগ্নি!

আপনার পত্র ও টাকা পাইয়াছি। আমি এখন এলিসের কাছে আছি ও এখানেই কিছুদিন থাকিব। এলিস ও খোকা এখন ভাল আছে। চারু ও তরুণ স্কুলে আছে। আপনি কেমন আছেন আমায় জানাইবেন। ছেলেরা সকলে কেমন আছে? দাদাকে আমার নমস্কার জানাইবেন, ও ছেলেদের ভালবাসা দিবেন।

আপনার ভগ্নী বিন্দুবাসিনী চক্রবর্ত্তী"

"Somerset House, Chandernagore.

প্রিয় দিদিমণি,

অনেক দিবস হইল আপনার অসুখের কথা শুনিয়াছি, এখন আপনি কেমন আছেন লিখিয়া জানাইবেন। আর আপনাকে আমার দুঃখের বিষয় কি লিখিব। এখন চারুর অত্যন্ত অসুখ করাতে আমি তাকে চন্দননগরে আনিয়া এখানে চিকিৎসা করাইতেছি। এ সময়ে যদি টাকা পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আপনার নিকট চিরকাল বাধিত থাকিব। আপনাকে বিরক্ত করি বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আমার বড় ইচ্ছা যে চারুকে একবার আপনাদের ওখানে চেঞ্জের জন্য নিয়ে যাই। আপনি কি বড়দিনের সময় ওখানে থাকিবেন? আমাদের ছোট বৌয়ের একটী মেয়ে হয়েছে। সকলে ভাল আছে। আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার সকলকে

দিবেন ও আপনি লইবেন।—আপনার অধম ভগিনী B. B. Chukerbutty."

তোমার গুণে সত্য সত্যই চারু তোমার ছেলেদের বড় ভালবাসেন। এখন ইনি একজন graduate এবং কলেজের প্রফেসার। তোমার সন্তানেরা ইহার চিরদিনের ভালবাসার অধিকারী হইয়াছেন; তোমার গুণে তাঁহারা একটী খৃষ্টান ভাই লাভ করিয়াছেন। ইহার মূলে তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা।

আর একখানি পত্র এই,—"৮ই জানুয়ারী ১৮৯৩। অদ্য আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র সহ পূরা দশ টাকার নোট পাইলাম। আমি বোধ হয় মাঘোৎসবের পরে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিতে একবার যাইব। * * *—বসন্ত।"

আর একখানি পত্র এই:—

"১০ই জানুয়ারী ১৮৯৩। আপনাকে পূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। বকুর মাহিনা ৪ মাসের বাকী পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে ২ মাসের বেতন আপনি দিয়াছিলেন, আর ২ মাসের বেতন বাকী আছে, এবং এই মাসের মাহিনা হইল। সুতরাং তিন মাসের বেতন আপনার কাছে পাইব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া দিতেছেন বলিয়া আমি পড়াইতে পারিতেছি।"

অনেক সময় কাহারও বিপদ আসিয়া পড়িলে তাহার সমুদয় ব্যয়ের ভার আপনার মস্তকে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইতে। লক্ষ্ণৌ কলেজের একটি কন্যার বিল্ এইরূপে তোমার উপর পড়িয়াছিল। সে সম্বন্ধে মিস্ থোবর্ণ তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ এই:—"লক্ষ্ণৌ, ১০-৩-৯৩। প্রিয় মিসেস্ রায়, তোমার কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম; তোমার প্রিয়জনের নিকট হইতে ও তোমার কার্য্যক্ষেত্র হইতে তুমি যে এখনই অপসারিত হইলে না, এজন্য কৃতজ্ঞ হইতেছি। আশা করি, তোমার স্বাস্থ্যের ক্রমিক উন্নতি হইতেছে, এবং শীঘ্রই

তুমি তোমার পূর্ব্বের স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইবে। আমি—র বিলের জন্য একটুও ব্যস্ত হই নাই; আমি নিশ্চিন্ত আছি যে সময় মত সে টাকা পাওয়া যাইবে; তুমি সে বিষয়ে চিন্তিত হও আমি তা ইচ্ছা করি না।—র শরীরটা ভাল ছিল না, বিশেষ গুরুতর কিছু নয়। তার একটা দাঁতের গোড়ায় ঘা হইয়াছিল, কিন্তু তোমার মতন তেমন খারাপ হয় নাই। এখন তো তাকে ভালই মনে হইতেছে। ঈশ্বর তোমাকে তাঁহার সেবা করিবার জন্য সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন দান করুন। আমার সমগ্র প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা, যে, আমি তাঁহাকে যেমন যীশুরূপে জানিয়াছি, তুমিও যেন তেমনি জানিতে পার। তাঁহার আশীর্ব্বাদ তুমি প্রাপ্ত হও, যদিও তাঁহাকে তুমি অন্য নামে সম্বোধন করিয়া থাক। ভালবাসা লও। তোমার বন্ধু আই থোবর্ণ।"*

---

* মূল পত্রখানি এই :—

My dear Mrs. Ray,

"Lucknow 10-3-93

I was very sorry to hear of your severe illness, and thankful that you were not taken now from your family and your work. I hope you have continued to improve and that you will ere long be in your useful health. I am not at all anxious about—'s bill. I am sure it will be settled in the course of time, and I do not wish you to be put out—has not been well, but nothing serious. She had an ulcerated tooth, but not so bad as yours. She seems well now. May God grant you many years of health in which to serve Him. With all my heart I wish you knew Him in the person of Jesus Christ as I do. May His grace be yours, although called by another name. With love, Your friend—I. Thoburn"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ হীরানন্দ

ব্রাহ্ম সমাজের প্রায় সকলেই ইঁহাকে জানেন। ইনি ১৮৯৩ সালের প্রথম ভাগে নিজের কন্যাদের শিক্ষা কোথায় ভাল হয় তাহা অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন। অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া তোমার আশ্রমে আসিয়া সেখানেই কন্যাদের রাখিবেন স্থির করিলেন। ইনি সিন্ধী, তুমি বাঙ্গালী, কিন্তু সরল মনে তুমি ইঁহাকে দাদা বলিতে; আমিও ইঁহাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখিতাম।

সে সময়ে তোমার পরিবারে দৈনিক জীবনের বিধি ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, এ বিষয়ে আমাদের কাহারও কিছু লেখা নাই। সুখের বিষয়, ভাই হীরানন্দ এ সময়ে তোমার পরিবার সম্বন্ধে কাগজে কিছু লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে তখনকার দৈনিক জীবন অনেকটা বুঝা যাইবে। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ এই ঃ—

"* * * কিন্তু বাঁকিপুরের সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় অনুষ্ঠান একটি সাদাসিদে রকমের বোর্ডিং; একটি ব্রাহ্ম মহিলা ও তাঁহার দুই কন্যা এটিকে চালাইতেছেন। মিসেস্ রায়ের স্বামী গভর্ণমেণ্টের একটী উচ্চ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁর আর্থিক অবস্থাও ভাল। ৩৫ বৎসর বয়সে ইঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন, এবং আজ পর্য্যন্ত উভয়ে তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন। স্বামীর পূর্ণ অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া মিসেস্ রায় কন্যা দুটীকে লইয়া লক্ষ্ণৌ নগরীতে মিস্ থোবর্ণের কলেজে পড়িতে গিয়াছিলেন। কন্যাদ্বয়ের মধ্যে একটির বয়স ২৪, অন্যটীর অনেক কম। জ্যেষ্ঠা কন্যাটী বিবাহিতা * * * কিন্তু তিনি এখনও পিতামাতার কাছেই থাকেন ও তাঁহাদের সকল মঙ্গল অনুষ্ঠানে সাহায্য করেন। কনিষ্ঠা কন্যাটী একটি মুক্তা বিশেষ। কুমারী হইয়াও তিনি ছোট একটী মায়ের মতন বোর্ডিঙের শিশুগুলিকে যত্ন করেন, আবার বোন্ হইয়া কেমন করিয়া ভাল

বাসিতে হয়, আত্মবলিদান করিতে হয়, তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। মিসেস্ রায় দ্রুত ইংরাজী বলিতে পারেন; তিনি বেশ সুশিক্ষিতা।

"প্রত্যূষে পরিবারের কন্যারা সরল ভাবে আপনার আপনার প্রার্থনা করে। বাঁধা প্রার্থনার ব্যবহার নাই; শিশুগুলির কোমল বিবেকের উপর একটুও চাপ দেওয়া হয় না। বড় বড় মেয়েদের প্রত্যেকের উপর ছোট একটি দুটি মেয়ের ভার দেওয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকের একখানি ছোট ডায়েরী আছে, তাহাতে সে প্রতিদিনের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি কিছু থাকিলে তাহা লিখে। মেয়েরা মিসেস্ রায়ের পরিদর্শনে পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়টিতেই পড়ে; বাড়ীতে মিসেস্ রায় ও তাঁহার কন্যাদ্বয় মেয়েদের পড়া বলিয়া দেন। পড়ার ও খাওয়া থাকার খরচ মাসে সাত টাকার কিছু বেশী পড়ে। শিশুগুলিকে দেখিয়া বেশ প্রফুল্ল ও আনন্দপূর্ণ মন হয়। উপদেশ ও দৃষ্টান্তে উহাদের যে পবিত্রতা, আত্মচেষ্টা ও আত্মত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা উহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়া বোধ হয়। লাভের জন্য এ বোর্ডিং খোলা হয় নাই। বস্তুতঃ বোর্ডারদের কাছে যা লওয়া হয়, তাতে খরচ কুলায় না। যেটা কম পড়ে তা মিঃ রায় পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁর পত্নী ও কন্যাদের কাজে তাঁহার গভীর সহানুভূতি আছে।"*

---

*মূল কথাগুলি এই ঃ—

(*The Indian spectator.*—April 2, 1893.)

"By far the most notable institution, however, at Bankipur, is an unpretentious Boarding house, managed by a Brahmo lady and her two daughters. Mrs. Prokash Chandra Rai is the wife of a gentleman who holds a respectable Govt. appointment. and who is in well to do circumstances. At the age of 35 she and her husband took the vow of Brahmacharya, and both have religiously observed it up to date. With her husband's full consent, Mrs. Rai (perhaps I should spell 'Ray') went with her two daughters to Lucknow to study at Miss Thoburn's Institution there. One

দেখিলে ? ৪ খানা ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া কি প্রশংসা পাইলে ! দু একটা কথা বুঝি একটু তাড়াতাড়ি বলিয়াছিলে বিদ্বান্ হীরানন্দ তাহাতেই ভুলিয়া গেলেন, ও বলিলেন, তুমি দ্রুত ইংরাজী বলিতে পার। কিন্তু কি জানি কোন্ মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, যে তুমি well read, অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছ ! যখন মানুষ মানুষকে ভালবাসে, তখন কোনও অপূর্ণতা দেখিতে পায় না ; তাহাই বুঝি হীরানন্দের ঘটিয়াছিল। তোমার ছাত্রী-নিবাসকে তুমি 'পরিবার' বলিতে, কারণ ছাত্রীদের দ্বারা পরিবার নির্ম্মাণ করিবে, এই সাধই ছিল। হীরানন্দ যে ৭৲ টাকার কথা লিখিয়াছেন, তাহাও সকলে

---

of the daughters is now 24. the other is much younger. The elder is married, but * * * continues to live with her parents, and to help them in their beneficent works. The younger girl is a pearl. She is unmarried, and looks after the children in the Boarding House with a little mother's care, and sets there the example of true sisterly love and self-sacrifice. Mrs. Ray speaks English fluently, and is well read.

Early in the morning the children in her home offer their prayers in their own simple way, for no set prayers are used, and no compulsion is put upon their tender consciences. Each of the elder boarders is in charge of one or two of the younger, and each keeps a small diary in which she notes down every day her failings and backslidings if any. The boarders attend the female school conducted under Mrs. Ray's supervision, and are helped in their studies at home by her and her daughters. The whole cost of education and boarding amounts to Rs. 7 and odd per month. The children look blithe and lively and the lessons of purity, self-help and self-sacrifice, taught to them by example and precept, are likely to have an enduring influence on their after life. The Boarding House is not kept for profit; indeed, the amount charged to the boarders is much less than the actual cost. The deficit is made up by Mr. Ray who takes the deepest interest in the work of his wife and daughters."

দিতেন না। কেহ অর্দ্ধেক, কেহ কেহ কিছুই দিতে পারিতেন না। যাহা অপূর্ণ থাকিত তাহা তুমিই পূর্ণ করিতে, আমার কাছেও আবেদন করিতে হইত না। খরচ পত্রের ভার তোমারই মস্তকে ছিল। কখনও দেখিতে, যে সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও কন্যাদের পিতা মাতা তাহাদের ব্যয়ের জন্য কিছু সাহায্য করিতেছেন না; তুমি কিন্তু কাহারও কাছে চাহিতে না, নারীর সকল ব্যয়ভার বহন করিতে। কখনও কখনও অচল হইয়া উঠিত; তবু কাহারও নিকট আপনাদের দুরবস্থার কথা জানাইতে না। একদিন আহার করিতে করিতে একজন বন্ধুর কাছে তোমার অর্থাভাবের কথা বলিতেছিলাম। আহারান্তে নির্জ্জন হইলে তুমি আমাকে অনুযোগ করিলে, এবং বলিলে, "কেন বন্ধুর নিকট অভাবের কথা জানাইলে? ইহাতে যে ভগবানের নিন্দা করা হয়।" আপনার সন্তানদের বঞ্চিত করিয়া, নিজে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইয়াও তুমি তোমার ছাত্রীনিবাসকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলে। ইহা দেখিয়াই হীরানন্দ তোমার পরিবারে মুগ্ধ হইলেন, এবং স্বদেশে গিয়া আপনার দুটী কন্যাই তোমার হাতে দিবার সঙ্কল্প করিলেন। যেমন সঙ্কল্প, তেমনি কার্য্য করা তাঁহার স্বভাব ছিল। কন্যা দুটী সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। কোথায় সিন্ধুপ্রদেশ, আর কোথায় বেহার, কন্যা দুটীকে এত দূরে পাঠাইতে হইবে বলিয়া সঙ্কুচিত হইলেন না। লক্ষ্ণৌ আসিয়া তাঁহার একটী কন্যা পীড়িতা হইলেন। হীরানন্দ যৎপরোনাস্তি সেবা করিলেন; কন্যা নীরোগ হইলেন, কিন্তু পথে আসিতে আসিতে তিনি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তোমার গৃহে আসিয়া যখন আশ্রয় লইলেন, আমি তখন বাটীতে উপস্থিত ছিলাম না। তুমি নিজেই চিকিৎসার ও সেবার আয়োজন করিলে, এবং যাহাতে হীরানন্দের কষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলে। নিজ গৃহের ঘরটী স্বাস্থ্যকর নয় মনে হইবামাত্র, পরেশের স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহার একটী ভাল ঘর চাহিয়া লইলে। হীরানন্দের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছিল; পরেশ

বাটী ছিলেন না। অন্য একজন ডাক্তারের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলে, "আপনি চিকিৎসার ভার লউন, যত ব্যয় হইবে আমার কাছে পাইবেন। ডাক্তার বাবু তোমাকে জানিতেন। তোমার উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। হীরানন্দ স্থানান্তরে রহিলেন বটে, কিন্তু তোমার পরিশ্রম বাড়িল। পরিবারের, বিদ্যালয়ের, ও হীরানন্দের সেবার কার্য্য অকাতরে করিতে লাগিলে। যখন রোগ বাড়িতে লাগিল তোমার সেবাও বাড়িতে লাগিল। আহার ঔষধ তোমার হাতে খাইতে ভালবাসিতেন। শেষ মুহূর্ত্ত যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই রোগী ঔষধ সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেষে দাঁত বন্ধ করিলেন। সকলে ঔষধ দিতে বিরত হইলেন। তুমি কোথায় গিয়াছিলে, গৃহে প্রবেশ মাত্র জিজ্ঞাসা করিলে, ঔষধ খাওয়ান হয় নাই কেন? উত্তরে জানিলে যে রোগী মুখ বন্ধ করিয়াছেন, বিশেষতঃ এখন আর ঔষধ খাওয়াইয়া বিরক্ত করা কেন? তুমি বলিলে, তাও কি হয়? যতক্ষণ শ্বাস আছে, ততক্ষণ আমাদের কর্ত্তব্য করা উচিত। ঔষধের পাত্র লইয়া হীরানন্দের মস্তকের নিকট গেলে আর "দাদা, দাদা, ঔষধ," বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলে। শ্রবণমাত্র তিনি মুখ খুলিলেন এবং ঔষধ পান করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি ১৪ই জুলাই ১৮৯৩ মহাপ্রয়াণ করিলেন। কন্যা দুটীর বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ হইল, তাঁহারা সিন্ধুপ্রদেশে ফিরিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ আরও ত্যাগ, আরও বিশ্বাস

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে তুমি অনেক সময় বাঁকিপুরে বাঁধা থাকিতে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আবার আমাকে অনেক সময় বাহিরে থাকিতে হইত। ইহাতে তোমার অনেক

সময় ক্লেশ হইত। ইহার উপরে ত্যাগের ধর্ম্ম পালন মনের সংগ্রামকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিত। এক এক বার তোমার অতিশয় কঠিন বোধ হইত। তোমার দৈনিকে সে সংগ্রামের চিহ্ন অনেক স্থানে আছে, কিন্তু পশ্চাৎপদ কখনও হও নাই। আমি যখন কোনও নূতন নিয়ম বা সাধন তোমার নিকটে ধরিতাম, কখনও কখনও তোমার তাহাতে ক্লেশ পাইতে হইত। কখনও বা তোমার মনে হইত, যে আমি ইচ্ছা করিলে আরও অধিক সময় তোমার কাছে থাকিতে পারি। ইহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না; কিন্তু আমার অভিপ্রায় কি? যে শরীর নিশ্চয়ই থাকিবে না, তাহার উপর যদি তোমার ও আমার যোগ স্থাপিত থাকিত, তাহা হইলে আজ কি হইত বল দেখি?

তোমার এই সকল সংগ্রামের ছবি তোমার দৈনিকে ও পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; প্রধানতঃ সে সকল হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

"৩০শে জুলাই ১৮৯৩। স্বর্গের সঙ্গী! তোমাকে নমস্কার করিতে বড় ইচ্ছা করিতেছে। তোমার মূল্য এখনও আমি বুঝিতে পারি নাই। তাই এত কষ্ট পাইতেছি। তা বেশ হইতেছে; এখনও দিন আছে। মার কৃপা হয় তো অবশ্যই বুঝিতে পারিব। তবে নমস্কার করি। তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার মূল্য বুঝিতে পারি। আজ বিদায়। তোমার ঘোরি।"

"আজ ৯ই জুন ১৮৯৩, 'মনের' নামক স্থানে আসিয়াছি। উপাসনা ভাল, মন ভাল। এই স্থানে অনেক মুসলমান পীরের গোর আছে। ১০ই জুন একটী বড় গোরস্থানে সন্ধ্যার সময় স্বামীসহ অনেকক্ষণ বসিয়া পরলোক চিন্তা করিলাম। একবার মন চঞ্চল হইয়াছিল। বাহিরে সিঁড়ির উপর গায়ের চাদর রাখিয়া আসিয়াছিলাম, খুব বাতাস হইতেছিল, মনে হইতেছিল, যদি উড়িয়া যায়! অমনি চেতনা হইল, আর সে চিন্তা রহিল না, নিরাপদে নাম করিয়া, পরলোক চিন্তা করিয়া ফিরিলাম।

এই শিক্ষা হইল যে সাধনের পূর্ব্বে সংসারকে এমন করিয়া দূরে রাখিয়া আসিতে হইবে, যেন ঐ সময় আমার মত কাহারও বিপদে পড়িতে না হয়। মনটা কিছু মুশড়ে গেল, পাপবোধে।

"১১ই আর একজন পীরের কথা শোনা গেল। তিনি কাপড় বুনিতেন, তাঁতের তুধারে কোরাণ রাখিতেন। যখন যে দিকে আসিতেন তখন একবার করিয়া কোরাণ পড়িয়া লইতেন। আজ উপাসনায় ঠিক হইল, শরীরের স্পর্শ সুখ পরিত্যাগ না করিলে সেই চিন্ময় সুখ, অনন্ত যোগ হইবে না। উপাসনা খুব ভাল হইল, কিন্তু আমার মনের উপর যেন একটা কি ভার পড়িল। এত চেষ্টা করিলাম কিছুতে সে ভার যেন কমে না। বুঝিলাম, স্বামীনের শরীর স্পর্শতেও আমার আসক্তি আছে, ছাড়িতে হইবে।

"১১ই জুন, উপাসনা ভাল। আজ হইতে আমরা উভয়ে ৯ বার করিয়া উপাসনার জন্য ব্রতী হইলাম। মন খারাপ। ১৩ই, উপাসনা ভাল। আমার মনে কয়বার নিরাশ ভাব আসিয়াছিল, কিন্তু স্থান পায় নাই। মনের ভার এখনও যায় নাই। ১৪ই, উপাসনা ভাল, মনকে ভাল করিবার জন্য উভয়ে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু পারিতেছি না। পাপ ও দোষ ছাড়িতে এত কষ্ট! ১৫ই উপাসনা ভাল, মন সেইরূপ ভার, একটু ভাল।

"১৬ই উপাসনা ভাল। রাত্রে স্বামীনের শয়নের পূর্ব্বে প্রার্থনা শুনিয়া মনের অন্ধকার দূর হইল। প্রাণে যেন কে আলো জ্বালিয়া দিল। এ কয়দিন যে একখান খুব বড় কাল মেঘ আমার মনের উপর রাখা ছিল। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন মন্দভাব ছিল না; কিন্তু মন যেন মেঘে ঢাকা ছিল। যেমন আলো জ্বলিল, অমনি স্বামীনের স্কন্ধে মাথা দিয়া অনেক চক্ষের জল পড়িল, ও কয়দিনের অনেক কথা ছিল, সকল বলিলাম। কেমনে জীবনের পূর্ণতা আসিবে, এ বিষয়ে অনেক কথা কহিয়া উভয়ে শয়ন করিলাম।

"আজ ১৭ই জুন ১৮৯৩, আজ দানাপুর আসিতেছি। পথে উপাসনা খুব ভাল, আমের গাছের তলায় বসিয়া। ঈশ্বর যেন রস-স্বরূপ হইয়া আম্রের মধ্যে বাস করিতেছেন। সকল আমেরই এক রস; আমাদের এই পরিবারের সকলেরই যেন এক চরিত্র হয়।

"২১শে জুন, সন্ধ্যায় সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, তাহার ভিতর ব্রহ্মদর্শন। শয়নের সময় একবার তর্ক করিলাম। একটু পরে বুঝিয়া অনুতাপ হইল, সেইজন্য রাত্রিতে ভাল ঘুম হইল না।

"২৩শে জুন রাত্রি ৩টায় শয্যায় উপাসনা, মন ভাল; অঃ প্রকাঃ, যিনি আমার, তাঁহাকে সমস্ত দিন প্রাণের ভিতর দেখিতেছি। এই যোগ যদি খাঁটি হয় তবেই সত্য মিলন। অভাব বোধ কম। আজ স্বামী বেহারে গিয়াছেন। ১২টার সময় বড় পুত্র সহ তাঁহারই জন্য ছোট উপাসনা আবার করিলাম। এখনও জননীর উপর পূর্ণ নির্ভর হয় নাই কারণ স্বামীন নাই বলিয়া রাত্রে চোরের ভয় আসিতেছে; কিন্তু কাহাকেও বলিতেছি না। এক একবার বোধ হইতেছে যেন স্বামীন আমার নিকটেই আছেন; ইহা ভ্রম নয় এমনি বোধ হইতেছে। এইরূপে বিশ্বাস বাড়ে। রাত্রে সুনিদ্রা হইল, কোন চিন্তা হইল না। মা কোল পাতিলেন, সেই কোলে সকলকে লইয়া শয়ন করিলাম।"

১লা জুলাই তোমার নয়াটোলার বাটীতে দোতালার নূতন ঘর উৎসর্গ করা হইল। এ গৃহে কোনও অশুদ্ধ আচরণ হইবে না, শারীরিক ভোগ লইয়া এ ঘরে বাস করা হইবে না, এই সঙ্কল্প লওয়া হইল। যত দিন দেহে ছিলে এ সঙ্কল্প পালন করা হইয়াছিল! তুমি ঐ নূতন গৃহকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলে। আজও এ ঘরটী আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

১১ই অক্টোবর, রাত্রি ১॥টার সময় বন্ধু খেলাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী পরলোক যাত্রা করিলেন। খেলাতচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী এত যত্ন করিলেন, তুমিও সাধ্যানুসারে

সেবা করিলে, কিন্তু প্রিয় কন্যা দেহে থাকিলেন না। মাতাপিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। যাঁহার ধন তিনি ফিরাইয়া লইলেন। তুমি সেই রাত্রে শোকাতুরা মাতার সঙ্গে ছিলে। সাধ্যমত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলে। সুকুমারীর যথেষ্ট যত্ন করিতে পার নাই বলিয়া তোমার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। বিশেষ তাঁহাকে লইয়া প্রথমে বিদ্যালয় আরম্ভ, তাঁহার লেখাপড়া হইতেছে না বলিয়া ঐ সুন্দর লক্ষ্ণৌ নগরীতে কালযাপন। সেই সুকুমারী চলিয়া গেলেন। শোকসন্তপ্ত পিতামাতার কথঞ্চিৎ শান্তি হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া বিদেশ ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। হরিদ্বার ও লক্ষ্ণৌ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে।

১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ডায়েরী পাইয়াছি। কয়েক দিনের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "৯ই ডিসেম্বর,—সাধু অঘোরনাথের বার্ষিক শ্রাদ্ধ। প্রার্থনা,—আমি অবস্থার দাস হইয়াছি, তাই তোমার দাসত্ব করিতে পারি না। অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তোমার দাসত্ব যাহাতে করিতে পারি, তুমি সেই বল দাও। ১০ই একবার বিধানের প্রতি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় অনেক গোলমালের ভিতর শান্তভাব রক্ষা হইয়াছিল। প্রার্থনা এই ছিল, যে চরিত্রে তোমাকে পাই, তোমার সন্তান হইতে পারি, সেই চরিত্র দাও। উপাসনা ভাল, কিন্তু মনটা একটু শুষ্ক ছিল। কেন এরূপ হইল তাহা ধরিতে পারি নাই। ঘরে তুলো ছিল, তাহাতে একটি মেয়ে আগুন লাগাইয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া একটু দৌড়ে আসিয়াছিলাম। আসিবার সময় যোগ ছিল না। পরে ভগবানকে স্মরণ হইল সেই মেয়েটীকে একটু মিষ্ট ক'রে বকিয়াছিলাম।

১১ই ডিসেম্বর। আজ মার বাৎসরিক ছিল। প্রার্থনা ছিল চিন্ময় যোগে আরও বাড়িতে দেও। আজ একটী অনাথ পরিবারের নিকট গিয়াছিলাম। এই স্ত্রীলোকটীর সন্তান হইয়াছে, ও এই

অবস্থায় জ্বর ও বিকার হইয়াছে। যথাসাধ্য তাঁহার কিছু কাজ করে সুখী হইলাম। কিছু ছিন্ন বস্ত্রাদি নানাস্থান হইতে সংগ্রহ ক'রে দিলাম। সন্ধ্যায় বাড়ী আসিয়া একটী ধনী পরিবারের নিকট গিয়া ঐ অনাথ পরিবারের গল্প করায় তাঁহারাও কিছু বস্ত্রাদি দিলেন। তাহা লইয়া ফটকে আসিয়া দেখি গাড়ী নাই, সুতরাং হাঁটিয়াই বাড়ী আসিতে হইল। একবার মনে হইল, ধনী পরিবার যদি জানিতে পারেন, কি বলিবেন। কিন্তু অমনি মনে হইল, আমার তো এই কাজ। সেই স্ত্রীলোকটীর একখানি লেপের জন্য দুইটী বন্ধুর বাটী গিয়াছিলাম, কিন্তু একজন গ্রাহ্য করিলেন না, অন্য ভগিনী একটি টাকা আনিয়া দিলেন। মনটা বড় গরম হইল। তখনই যেন ভিতর হইতে কে বলিল, ভিক্ষুকের আবার বিচার অভিমান কি ? তখনই সে ভাব চলিয়া গেল। টাকাটী লইয়া বাটী আসিলাম ; আসিয়া আহারে বসিয়াছি, একটী বন্ধু লেপের আর যাহা লাগিবে ততটুকু সাহায্য নিজেই করিলেন, আশ্চর্য্য হইলাম।"

এইরূপে রোগ, শোক, অর্থচিন্তা, কার্য্যভার ও ত্যাগের ক্লেশ বহন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলে। আপনি যে শুধু উঠিতেছিলে, তা নয়, আমাকেও উঠিবার সাহায্য করিতেছিলে। আমাকে ভালবাসিতে বটে, আসক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইত তাহাও সত্য, তথাপি স্বীকার করি, তোমার ভালবাসা অন্ধ ভালবাসা ছিল না। ৩০শে ডিসেম্বর আহার করিবার সময় আমার অহঙ্কার হইয়াছিল, তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলে। নির্জ্জনে এবং অত্যন্ত প্রিয় ভাষায় তুমি আমার অহঙ্কার দেখাইয়া দিলে। আমি পূর্ব্বে নিজের দোষ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার ভালবাসার গুণে এ সংশোধন কার্য্যও অত্যন্ত মিষ্ট মনে হইল। ভালবাসা দোষ দেখিলে চুপ করিয়া থাকে না, মিষ্ট ভাষায় উপযুক্ত সময়ে দোষ ধরিয়া দিয়া প্রেমাস্পদের চরিত্র সংশোধন করিয়া উন্নতির সহায়তা করে। দোষকে তুমি কখনই উপেক্ষা করিতে না, এ বিষয়ে আমি সাক্ষী।

এ বৎসর খ্রীষ্টোৎসবের সময় ভগবান্ তোমার বিশ্বাস পরীক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন করিলেন। খ্রীষ্টোৎসবের ব্যয়ভার তুমিই বহন করিতে। কিন্তু এখন পরিবারে এতগুলি কন্যা থাকেন, তাই পূর্ব্বের মতন আর সব সময় হাতে টাকা থাকে না। বরং অনেক সময়, বিশেষতঃ মাস শেষের সময় বিশেষ টানাটানি হয়। এবার খ্রীষ্টোৎসবে কি হইল, তাহা তোমার দৈনিকে লেখা আছে।

"২৫শে ডিসেম্বর, খ্রীষ্টমাস, বাগানে উপাসনা। প্রায় ৫৪ জন উপাসনায় উপস্থিত। তাহার ভিতর পাঁচ ছয়টি বালক বালিকা। এতগুলি লোক আহার করিবেন। আজ আর কিছু নাই আহারের। গত রজনীতে একবার মনে হইল কি হইবে? কিন্তু মার উপর নির্ভর করিয়া নিদ্রা গেলাম। সকালে ৭টা পর্য্যন্ত বিছানায়, শরীর অসুস্থ থাকায়। কন্যারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইবে? বলিলাম, সকল মেয়ে ছেলেদের নিকট ভিক্ষা কর। দু পয়সা, আড়াই পয়সা, এইরূপে এক টাকা হইল। এই পয়সা দ্বারা চাউল ইত্যাদি খরিদ করিয়া যাত্রা করা গেল। সেখানে গিয়া দেখি অনেক পরিবার হইতে পুরি, মিঠাই, রুটি, মুড়ি ইত্যাদি আসিয়াছে। লেবু কিছু লইয়াছিলাম, কিছু অন্যেরা আনিয়াছিলেন। এইরূপে খুব ভাল আহারাদি হইল। পায়েসও আসিয়াছিল। ৫৪ জন আহার করিয়া কিছু চাউল বাঁচিল এবং ৪ জনের ভাতও বাঁচিল। ঈশার কথা মনে পড়িল, তিনি দুটি মাছ ও দুইখানি রুটীতে কেমন করিয়া এত লোককে খাওয়াইয়াছিলেন, আর বাঁচিয়া ছিল। ফলে বিশ্বাসই মূল। সন্ধ্যায় অবশিষ্ট যাহা ছিল সকলে আহার করিলেন। যিনি ভাণ্ডারী তিনি বলিলেন, কালিকার জন্য জল ও লবণ ভিন্ন কিছু নাই। বলিলাম, আজকের তো হইয়া গেল, কালকার বিষয় আজ আর ভাবিব না। কাল যেমন হয় হইবে। তাঁহারাও তাই বলিয়া বিদায় লইলেন। ঘরে আসিবামাত্র স্বামী মহাশয় বলিলেন, তোমার বিশ্বাসের পুরস্কার লও। এই বলিয়া ৫৲ টাকা দিলেন। পাইয়া অবাক হইলাম;

কোথা হইতে আসিল, ভাবিয়া পাইলাম না। পরে বলিলেন, মোকামা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল এই টাকা পাঠাইয়াছেন, এই ক্ষুদ্র পরিবারের জন্য। মার দয়া দেখিয়া সকলের বিশ্বাস শতগুণ বাড়িল। আজ প্রার্থনা ছিল, বিশ্বাসরূপ শিশুকে যেন যত্নে রক্ষা করিতে পারি।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ আর্ত্তবন্ধু

১৮৯৪ সালের মাঘোৎসবের পর রাজগৃহ যাত্রা করা হইল। এবারও পথে পথে গান ও মার কথা বলা হইল।

বিদ্যালয়ের জন্য ও পরিবারের জন্য শ্রম নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। মার্চ্চ মাসে শ্রদ্ধেয় দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নির্ম্মলার সহিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণের বিবাহ হয়। এ বিবাহে তোমাকে অনেক খাটিতে হইয়াছিল। গোপাল বাবুরা তোমার বাটীতেই ছিলেন। তারপর লক্ষ্ণৌ নগরীতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষের কন্যা সরলার সহিত শ্রদ্ধেয় দীন বাবু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সেখানেও তুমি গমন করিয়াছিলে। তুমি সেখানে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী উভয়ই হইয়াছিলে। সেখানকার একটী ঘটনা মনে আছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন হিন্দু ভদ্রলোক একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। কারণ, সকল ব্রাহ্মের সঙ্গে তিনি আহার করিতে পারিবেন না। তুমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিলে, এবং আশ্বাস দিয়া তাঁহার ভিন্নস্থানে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলে। তিনি একথা এখনও ভুলেন নাই।

ইহার পর তোমার দ্বিতীয় কন্যা সরোজিনীর বিবাহ উপস্থিত হইল। বিবাহের জন্য আমরা চেষ্টা করি নাই, কারণ চেষ্টা করা তোমার ও আমার উভয়েরই বিশ্বাস বিরুদ্ধ ছিল। বিধাতা আপনি

এ সম্বন্ধ মিলাইয়া দিলেন। কন্যা সরোজিনীকে তুমি বৈরাগিণী করিয়া গঠন করিয়াছিলে। বেশ ভূষা সাজসজ্জা তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি ধর্ম্মকেই নিজের অলঙ্কার বলিয়া জানিতেন। বরপক্ষের অভিভাবকগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবার সময় শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু মহাশয়ের পত্নী কন্যার ছবি পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। একা তাঁহার ছবি তুলাইলে পাছে তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়, তাই সে সময়ে তোমার, আমার, সুবোধের ও সরোজিনীর ছবি তোলা হইল। ভাগ্যে সেদিন তোমার ছবি তোলা হইল, নতুবা তোমার একখানি ছবিও আমার কাছে থাকিত না। দেহ থাকিতে দায়ে পড়িয়া সেই একবার মাত্র কালীর ছবি লইতে দিয়াছিলে। ছবি তো তোলা হইবে, কিন্তু উপযুক্ত সাজ সজ্জা করিয়া যাওয়া হয় নাই। ফটোগ্রাফার বলিলেন, সাদা কাপড়ে ছবি ভাল উঠিবে না, তাই আমার গেরুয়া গায়ে দিয়া সকলে ছবি তুলিলে। এইরূপে অপ্রস্তুত অবস্থায় ছবি তুলিয়াছিলে বলিয়া, বিশেষতঃ কন্যাকে সাজাও নাই বলিয়া, তুমি বন্ধুজনের কাছে অনেক কথা শুনিয়াছিলে।

বরকন্যা পরস্পরকে পছন্দ করিলেন, তারপর বিবাহের আয়োজন হইল। একই বেদীতে বসিয়া শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু ও ভাই শিবনাথ বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর কন্যার শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট হইতে সংবাদ পাইতে লাগিলাম যে তাঁহারা পুত্রবধূ পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছেন। ইহাতে আমাদের সুখের সীমা রহিল না।

কন্যার বিবাহের পর তুমি তোমার সেবার কার্য্যে আরও প্রাণ মন ঢালিয়া দিলে। বিদ্যালয়ের ও পরিবারের নিয়মিত কাজ ব্যতীত দরিদ্র ও বিপন্নের সেবা করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে। দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক দেখিলে তুমি আর স্থির থাকিতে পারিতে না। এক এক সময়ে আহার নিদ্রার অবসর থাকিত না তবু নিজে খাটিতে ও সকলের উৎসাহিত করিতে অবহেলা কর নাই। যতই শরীর ভাঙ্গিতে লাগিল, ততই যেন তোমার নিষ্কাম সেবা ও নির্লিপ্ত ভাব

বাড়িতে লাগিল। একটা কোন বস্তুতে প্রেম আবদ্ধ না থাকিলে যা হয়, তাই তোমারই হইতে লাগিল। এদেশে নারীজীবনে যে সেবা নাই তা নয়। কিন্তু তাহা প্রায়ই স্বামী ও পরিবারের সীমার মধ্যেই বদ্ধ থাকে। তুমি যতই আসক্তির প্রাচীর ভাঙ্গিতে লাগিলে, ততই পরের জন্য ভাবিবার ও খাটিবার শক্তি বাড়িতে লাগিল। তোমার কাছে এ সময় যেমন বড় মানুষের বাটী, তেমনি দুঃখিনী বিধবার পর্ণকুটীর। সংবাদ পাইলেই দুঃখ দূর করিবার জন্য দৌড়িতে। শেষে যখন এই সেবার কাজ অনেক বাড়িতে চলিল, আমার কাছে সব সময় জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পাইতে না। কতদিন আমার অজ্ঞাতসারে কত রোগীর সেবা করিতে চলিয়া গিয়াছ।

একদিন রাত্রি দুইটার সময় আমার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলে, "আমি যাই।" চক্ষু খুলিয়া দেখি, তুমি আপনার মোটা সজ্জায় সজ্জিত। আমি বলিলাম, "এই শীতকালের রাত্রিতে কোথায় যাইবে?" তুমি—"বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র বড়ই পীড়িত, দেখিতে যাইব।" ব্রাহ্মণীর আর কেহই নাই, একমাত্র পুত্র এফ. এ পাশ করিয়াছিল; সেই পুত্র জ্বর রোগে এখন তখন, যায় যায়। সন্ধ্যার সময় তুমি সেবা করিতে গিয়াছিলে। চিকিৎসার্থে পরেশ বাবুকে ডাকাইয়াছিলে। আমি এ সব কিছুই জানিতাম না। আমি নিদ্রিত হওয়ার পর, রাত্রি দশটার সময় বাটী আসিয়া আহার এবং শয়ন করিয়াছিলে। তার পর এই আমাকে প্রথম জাগাইলে। আমি—"এত রাত্রে কেন যাইবে? প্রাতঃকালে যাইও।" তুমি—"বলিয়া আসিয়াছি, ডাকিলেই যাইব। অবস্থা মন্দ না হইলে ডাকিতে আসিত না।" আমি—"ঘরের গাড়ী আছে, প্রস্তুত করিয়া, তাহাতেই যাও।" তুমি—"ঘোড়া পরিশ্রম করিয়াছে, কোচোয়ান নিদ্রা যাইতেছে, গাড়ী প্রস্তুত করিতে অনেক বিলম্ব হইবে। ততক্ষণে হাঁটিয়া রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারিব।" আমি—"তবে যাও।" অনুমতি পাইবামাত্র তুমি অক্লেশে সেই ঘোর নিশাকালে পদব্রজে রোগীর সেবায়

চলিয়া গেলে। সঙ্গে রোগীর বাটীর চাকর, তার হাতে লণ্ঠন। শেষ রাত্রি ৪টার সময় রোগীর দেহান্ত হয়। শব গঙ্গাতীরে পাঠান, বহনের জন্য ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করা, এ সব তোমাকেই করিতে হইল। বিধুরা মাতার শোকে সন্তপ্ত হইয়া তুমি তাঁহাকে স্নান করাইলে, শয্যা প্রস্তুত করাইয়া দিলে, একটু সরবৎ পান করাইয়া বাটী আসিলে। তখন বেলা ৯টা, বিদ্যালয়ে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী। উপাসনা করিয়া, একটু দুধ খাইয়া বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলে। আহারের সময় পাইলে না।

একদিন বিদ্যালয়ে কাজ করিতেছ, এমন সময় তোমার পুত্রসম স্নেহভাজন ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া সংবাদ দিলেন, নিকটেই একজন অসহায়া নারী প্রসবের পর রুগ্না হইয়া কষ্ট পাইতেছেন, সাহায্য প্রয়োজন। কামাখ্যানাথের সঙ্গে তোমার বন্দোবস্ত ছিল যে, এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে তিনি তোমায় সংবাদ দিবেন ও সেবার জন্য লইয়া যাইবেন। প্রিয় কামাখ্যানাথ নিজেই লিখিতেছেন, "একদিন একটী ছাত্র মেডিকেল স্কুলে আমায় বলিল যে এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত ধনীর কোন আত্মীয়া রোগে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছেন। স্ত্রীলোকটীর একমাস কি দেড় মাসের একটী শিশু কন্যা আছে, তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবার কোনও লোক নাই, এবং পথ্যাদি কিনিবারও কোন সম্বল নাই। তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহ তাঁহার সংবাদ লন নাই। ছাত্রটীর মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। দুঃখ নিবারণের কি উপায় হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমি গিয়া মাতাঠাকুরাণীকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি আমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ চাকরকে গাড়ী ডাকিতে বলিলেন, এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই অনাথিনী নারীর ভগ্ন কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে আসিয়াই মলমূত্রবিশিষ্ট কতকগুলি ন্যাকড়া, যাহা গৃহের একধারে জড় করা ছিল, তাহা লইয়া

কাচিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তো অবাক হইয়া গেলাম। তিনি যতক্ষণ নেকড়া গুলি কাচিতে লাগিলেন, আমি গৃহ পরিষ্কারের জন্য ঝাঁটা লইয়া ঝাঁট দিতে লাগিলাম। তিনি চকিতের মধ্যে নেকড়া গুলি কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া আমার হাত হইতে ঝাঁটা লইয়া গৃহের সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।" গৃহটী অপরিষ্কার একদিকে কয়লার গুঁড়া অন্যদিকে আবর্জ্জনা। বাবুটী কয়লার ব্যবসা করিতেন, তখন নিঃস্ব। প্রসূতি সন্তান লইয়া কয়লার মধ্যে পড়িয়া আছেন। দেখিবামাত্র আপন গৃহে সংবাদ পাঠাইয়া দিলে। সেখান হইতে পরিষ্কার বস্ত্র, শয্যা উপাধান চাহিয়া পাঠাইলে। যখন তুমি সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া গৃহ পরিষ্কারে নিযুক্ত হইলে, বাবুটী আসিয়া আপত্তি করিলেন। সত্য সত্যই দেবি, তোমার হস্ত সেবার জন্যই আসিয়াছিল; তুমিও তাহা বুঝিয়াছিলে। অল্পক্ষণ মধ্যে গৃহ পরিষ্কার হইল, শয্যা প্রস্তুত হইল, মাতা ও শিশুর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা হইল। একখানি খাটে শায়িতা হইয়া সেই নারী বলিলেন, "মা তুমি প্রাণ দান করিলে।" গৃহে গিয়া দুধ সাগু প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলে, ও কামাখ্যানাথকে প্রতিদিন আসিয়া চিকিৎসা করিবার ভার দিলে। সুপরিষ্কৃত সন্তানটী যখন মাতার কোলে দিলে, তখন মাতা যে হাসি হাসিলেন, তাহাই তোমার পুরস্কার। যতদিন ইনি অসুস্থ ছিলেন, প্রতিদিন দেখিতে যাইতে।

একটী বালিকা পূর্ব্বে তোমার বিদ্যালয়ে পড়িতেন। তিনি এখন বিবাহিতা। সম্প্রতি একটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। বিদ্যা-লয়ের ঝি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল। সে প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করিল যে ঐ কন্যার পিতামাতা তীর্থে গিয়াছেন। বাটীতে কেবল কন্যার স্বামী আছেন। এদিকে কন্যাটীর সূতিকাজ্বর হইয়াছে। গৃহে দ্বিতীয় নারী নাই যে সেবা করেন। শুনিবামাত্র তুমি সেবা করিতে গমন করিলে। সূতিকাগৃহের দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার

বড় কষ্ট হইল। তুমি সেই দুর্গন্ধময় স্থান পরিষ্কৃত করিলে প্রসূতি ও সন্তান যাহাতে আরামে থাকেন, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলে। কন্যার স্বামী দেখিয়া অবাক হইলেন। গৃহ পরিষ্কার করা, সন্তান পরিষ্কার করা, শয্যা প্রস্তুত করা এ সকল কার্য্য যেন মুহূর্ত্তমধ্যে হইয়া গেল। ডাক্তার ডাকাইলে। যত্নের সহিত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। সেদিন তুমি অনেক রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলে। তুমি অনেক যত্ন করিতে লাগিলে, কিন্তু রোগ অতি কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। প্রতিদিন তোমায় কতবার যাইতে হইত, ঠিক নাই। এত সেবা করিলে, তবু কন্যা তিন চারিদিনের বেশী জীবিত রহিলেন না। শেষ সময়ে আমিও উপস্থিত ছিলাম। রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কন্যা বলিলেন, "মা, আমাকে বাঁচাইতে পারিলেন না।" তুমি বলিলে, "এখন ভগবানকে স্মরণ কর।" আহাহা! বালিকা তিনি, ভগবানের বিষয় কি জানেন! জিজ্ঞাসিলেন, "কাহাকে ডাকিব? কি বলিব?" তুমি বলিলে, "দয়াময় হরি, এই নাম কর।" সেই নাম করিতে করিতে কন্যা সন্ধ্যার পর দেহত্যাগ করিলেন। তখন তুমি স্বামীকে ডাকিয়া বলিলে, এখন ইঁহাদের সদ্গতির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা করা হউক। তার পর গঙ্গাতীরের সুব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া গৃহে ফিরিলে।

—বাবু মুন্সেফ। তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তানের ডবল নিউমোনিয়া হইল। পুত্রের জননী তখন পূর্ণগর্ভা ছিলেন, তিনি সেবা করিতে অক্ষম। বন্ধুরা তোমাকে সংবাদ দিলেন। আমি তখন বাহিরে কাজ করিতে গিয়াছি। কিন্তু আমার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা তখন সম্ভব নয়, তাই আমাকে না বলিয়াই যাইতে প্রস্তুত হইলে। ইত্যবসরে আমি ফিরিয়া আসিলাম। আমি তোমার সঙ্গে মুন্সেফ বাবুর বাটীতে গেলাম। সন্তান একটী ছোট ঘরে রহিয়াছে, দেখিবামাত্র তুমি বলিলে, ইহাকে বড় দালানে লইয়া যাইতে হইবে।

তাহাই হইল। বাজার হইতে ফ্লানেল আনাইলে, আপন বাটী হইতে ভাজা তিষি চূর্ণ করাইয়া আনাইলে। পুলটিশ দিতে লাগিলে। বেলা নয়টা কি দশটার সময় বসিলে, বেলা ছুইটা বাজিয়া গেল তবুও তুমি একাসনে সন্তান কোলে লইয়া সেবা করিতে লাগিলে। তারপর কন্যা সুসার এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ফিরিয়া আসিলে তোমার আধ ঘণ্টার জন্য ছুটি হইল। বাটী আসিয়া আহার করিয়া আবার পূর্ব্বের মত সেবায় নিযুক্ত হইলে। সন্তানের মাতা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অবাক হইয়া তোমার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। বাবুদের সঙ্গে আমিও অনেকবার দেখিতে গিয়াছিলাম। মনে হইল যেন তুমি আপনার সন্তান কোলে লইয়া বসিয়া আছ। তোমার পরিশ্রম দেখিয়া তোমার স্বাস্থ্যের জন্য আমি একটু চিন্তিত হইতেছিলাম। কিন্তু হায়, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তোমার কোল শূন্য করিয়া এবং পিতামাতাকে কাঁদাইয়া সন্তান পলায়ন করিলেন। জননী যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, তুমি সান্ত্বনা দিয়া বলিলে, "অধিক কাঁদিলে গর্ভস্থ শিশুর অকল্যাণ হইবে, এখন ভগবানের শরণাপন্ন হও।" ইহার পর হইতে সেই জননী গাড়ী করিয়া তোমার নিকট উপদেশ ও সান্ত্বনার জন্য ব্যস্ত হইয়া আসিতেন। তিনি যেন ঐ দিন তোমার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত হইয়া গেলেন।

এদিকে এইরূপ সেবা করিতে, আবার মাসিক আয়ের টাকা পরার্থে এত ব্যয় করিতে যে অনেক সময় নিজের বস্ত্র ক্রয় করিবার সঙ্গতি থাকিত না। অতি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া লোকের বাড়ী সেবা করিতেই বা কিরূপে যাইবে, এই সঙ্কটে অনেকবার পড়িতে হইয়াছে। তোমার দৈনিকে একদিন লেখা আছে, "আজ রাত্রিতে—র ভাইর পেটের খুব পীড়া থাকায় ১২টা রাত্রিতে ডাকিতে আইসে। তখন গেলাম না। ১॥টায় আবার ডাকিতে আইসে। তখন আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। খুব ছেঁড়া একখানি বস্ত্র পরিয়াছিলাম। সেইখানি পরিয়াই তাহাদের চাকরের সহিত

তাহাদের বাটীতে গেলাম। খুব ভাল ঈশ্বরদর্শন হইল। মুমূর্ষু সন্তানকে একাকী লইয়া বসিয়া রহিলাম। ৪॥টার সময় চক্ষের সাম্‌নে আস্তে আস্তে শিশু চিরনিদ্রিত হইল। পরদিন বেলা ৯টার সময় বাটী আসিয়া একাকী উপাসনা করিলাম। বড় মিষ্ট উপাসনা হইল। প্রার্থনা,—মা, সর্ব্বদা নিত্যতা অনুভব করিতে শিখাও।

কখনও কখনও কেহ কেহ মনে করিতেন, দেখাইবার জন্য তুমি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান কর। কিন্তু তাহা নয়। সেই যে প্রথম ত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলে, সেই হইতে কখনও ভাল বস্ত্র ভাল অলঙ্কার পরিধান কর নাই। আর তা ছাড়া, কাহারও অভাব জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ নিজের যা কিছু থাকিত এমন কি আমার ও সন্তানদের যা কিছু থাকিত, সবই অকাতরে দান করিতে। কাজেই কিছু থাকিত না। আমি তোমায় কিছু অলঙ্কার করিয়া দিই নাই। পিত্রালয়ের যে ক'খানি গহনা ছিল, তাও সব বিক্রয় করিয়া দান করিয়াছিলে। একবার একজন লোক বেনারসী সাড়ী বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বসন্ত বলিলেন, "কাকীমা, একখানি সাড়ী কেন না? নিজে না পর, সরোজিনীকে একখানা ক্রয় করিয়া দেও।" তুমি সকল বস্ত্রগুলি দেখিলে, কিন্তু সকলগুলিই ফিরাইয়া দিলে। বসন্ত জিদ্ করিতে লাগিলেন, উত্তরে তুমি বলিলে, "একখানা কিনিলে তো হবে না, আমার দশটী মেয়ে, দশখানা কিনিতে হয়।" সত্য সত্যই পরিবারের সব মেয়েদের তোমার আপনার কন্যা মনে করিতে, তাই অসঙ্গতি নিবন্ধন আপনার কন্যাদেরও বসন ভূষণ করিয়া দিতে পার নাই। পূর্ব্বে যখন পরের কন্যাদের আপন করিতে শিক্ষা কর নাই, তখন উৎসবের সময় নূতন বস্ত্র আনিতে, এবং আপনার সন্তানদিগকে পরাইয়া সুখী হইতে। কিন্তু যখন আপনাকে ভুলিয়া পরের মঙ্গলে নিযুক্ত হইলে, তখন উৎসবের সময় সকলের বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতে না বলিয়া নিজের সন্তানগুলিকেও বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইতে। মেয়েদেরই ভাল বস্ত্র

নাই, তখন তোমার আর কোথা হইতে হইবে? তুমি তাই বেহারের দুঃখিনীদের মত "মুটিয়া" বস্ত্র যত্ন করিয়া পরিধান করিতে, এবং বড় মানুষের মেয়েদের সঙ্গেও তাহাই পরিয়া দেখা করিতে যাইতে। সেই মোটা, রং করা, মাঝখানে সেলাই করা দীর্ঘ বস্ত্র পরিয়া একদিন একজন শিক্ষিতা রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে। তিনি বিলাতফেরতদের ঘরের মেয়ে। বস্ত্র দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "এ বস্ত্র কোথায় পাইলেন?" তুমি দমিবার মেয়ে নও, অমনি বলিয়া উঠিলে, "কেন? পরিবে? বল তো ক্রয় করিয়া দিতে পারি। অমুক জায়গায় পাওয়া যায়।"

এই বৎসরের আর একটী ঘটনা মনে পড়িল। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। এখান হইতে ডাক গাড়ীতে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিবেন। ডাকগাড়ী সকাল ৭টায় আইসে। তুমি স্বীকার করিলে, সকালে ৬টার সময় আহার প্রস্তুত করিয়া দিবে। তিনি আনন্দিত হইলেন। আহার হইবে, উপাসনা হইবে না, ইহা তোমার প্রাণে সহিল না। লজ্জা ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসিলে, "৬টায় আহার, তবে উপাসনা কখন হইবে?" শ্রদ্ধেয় মহাশয় বলিলেন, "অত সকালে কেহ কি আসিতে পারিবেন?" তুমি বলিলে, "আপনি বলিলেই আসিবেন," যেন তুমিই সকলের কর্ত্তা। হইলও তাহাই। প্রায় সকল বাটীর স্ত্রী পুরুষেরা ৫টার সময় তোমার দেবালয়ে উপস্থিত। গরম জল প্রস্তুত হইল; শ্রদ্ধেয় মহাশয় ৫টার পূর্ব্বে স্নান করিলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উপাসনা গৃহ পূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, উষা উপাসনা কখনই করেন নাই; তোমার চেষ্টায় তাহাও হইল। ৬টার সময় আহার করিলেন, ও ৬৷৷টার সময় যাত্রা করিলেন।

এই বৎসর গাজীপুরে গিয়া খ্রীষ্টোৎসব করা হইবে এই স্থির হইয়াছিল। গাজীপুরের উকীল ভাই নিত্যগোপাল রায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তোমরা প্রস্তুত হইলে। ছোট বড় সব যাত্রীই

নারী। আমি ও ব্রজগোপাল তোমাদের সেবার্থে চলিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা আরা উপস্থিত হইলাম। সেখানকার ষ্টেসনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া গেল না। তুমি অদম্য উৎসাহে সব মেয়েদের সঙ্গে লইয়া হাঁটিয়াই চলিতে লাগিলে। পথ অন্ধকারে আবৃত হওয়ায় একটু সাবধানে চলিতে হইল। অল্প রাত্রি হইতে না হইতে সকলে গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী অনেক আদর ও যত্ন করিলেন। সেই রাত্রেই তোমরা শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্রের বাটীতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকেও সঙ্গিনী করিলে। পরদিন অতি প্রত্যূষে উপাসনা ও আহার করিয়া আরা হইতে গাজীপুর যাত্রা হইল। তাড়ীঘাট হইতে দুইখানি নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইয়া গাজীপুর পেঁাছিলাম। ভাই নিত্যগোপালের কতই যত্ন! খুব বড় বাড়ী, খুব বড় মন, তোমাদের আদরের সীমা রহিল না। ২৩শে রবিবার সন্ধ্যায় উপাসনা ব্রজগোপাল করিলেন। সোমবারে পওহারি বাবার দর্শনার্থে গমন। তিনি পূর্ব্বদিন বাহির হইয়াছিলেন। তোমরা তাঁহার কুটীরের সম্মুখে বৃক্ষতলে বসিয়া অনেক কথা কহিলে। তাহার পর গৃহে ফিরিলে। ২৫শে তাঁবুর মধ্যে ভাই নিত্যগোপাল উপাসনা করিলেন। বড়ই ভাল লাগিল। পরদিন কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের সমাধি দর্শন করিয়া তার পর নিত্য বাবুর পত্নীর পিত্রালয়ে বেড়াইতে গেলে। সেদিন তুমি থান ধুতি পরিয়াছিলে। ভগিনীর ইচ্ছা যে সধবার মত পাড়ওয়ালা কাপড় পরিধান করিয়া যাও। তুমি বলিলে যে তাহা হইলে যাওয়াই হইবে না। অবশেষে তোমার কথাই রহিল। বিধবার বেশে গেলে, কিন্তু ভগিনীর বাটীর সকলেই তোমাকে আদর করিলেন। তুমি বলিলে, বস্ত্রে কি সধবা বিধবা হয়? তোমায় থানের ধুতি পরিলে বেশ দেখাইত।

১৮৯৪ সালে তোমার বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা আরো বাড়িল; কাযেই খাটুনিও বাড়িল; তার উপর বিপন্নের সেবার জন্য কত আহ্বান আসিতে লাগিল তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ সকলের মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও সেই চিরবাঞ্ছিত ধন চিন্ময় যোগের জন্য মন পড়িয়া থাকিত। মায়াশূন্য আসক্তি শূন্য হইয়া কিরূপে মার কাজ করিবে তারই জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিতে। মার কাজের খাতিরে তোমাকে অনেক সময় আমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে হইত; আমি মফঃস্বলে গেলে আর তো সঙ্গে যাইতে পারিতে না। তাই আসক্তির সহিত সংগ্রাম আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল, চিন্ময় যোগের পিপাসা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক এক দিন বলিতে, "আমার ভালবাসা শেখা এখনও হয় নাই।" আপনার প্রতি নির্ভর কখনই করিতে না; আপনার গুণ কখনই দেখিতে না, তাই তোমার দৈনিক তোমার নিত্য নব নব কাতর প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। একদিন লিখিয়াছ, "এখনও ভালবাসা শিখি নাই। দয়াময়ী মা, তোমার ভালবাসা শিখাও। আমার ভাল রক্ত, ভাল মাংস, হাড়ের শক্তি, সকলই দিয়া সংসারের সেবা করিলাম, ভাল বাসিলাম। কিন্তু তাহার ফল এখনও দেখি শূন্য। এখন কাল রক্ত, পচা মাংস, দুর্ব্বল হাড় কয়খানা দিয়া শেষ কয়টা দিন যাহা করিব, তাহা যেন তুমি গ্রাহ্য কর, ও তোমার ছেলে মেয়েরা গ্রাহ্য করেন, এই ভিক্ষা। আজি রাগ হয় নাই।" তোমার এই লেখা হইতে মনে হয়, তুমি যেন আভাস পাইতেছিলে, যে শরীর দিয়া মায়ের সেবা করিবার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। আর তাই চিন্ময় যোগের জন্য এত লালায়িত হইতেছিলে।

এই বৎসর একবার আমি পাটনা জেলার অন্তর্গত মিরচাইগঞ্জ

নামক স্থানে গিয়াছিলাম। তখন তুমি পত্রে লিখিয়াছিলে, "কাযের স্রোত খুব বাড়িয়া চলিতেছে, এই সঙ্গে ক্রসও বাড়িতেছে, ভয় পাইও না। মা আমাদের প্রাণ আরও প্রশস্ত করুন। শরীর তফাৎ হইলেও যে যোগ কমে না, বরং পরলোকচিন্তা সহজ হয়, তবু আমার পাগল মন কেন শরীর ভালবাসে কি জানি ? অবশ্যই কোন অভিপ্রায় আছে, বুঝি। তা না হ'লে কেন ক্ষণিকের জন্য আমাকে এত ফেলে দেয় ? পরে আর তো সে ভাব থাকে না ; মন খুব ভাল হয়, যোগ নিকট হয়। আজ ৪টার সময় এই কথাই মনকে ব্যাকুল করিতেছিল। কে যেন বলিল, এক সময় এইরূপ শরীর আর থাকিবে না। সেই চিন্তায় মনকে কি করিল, আত্মার যোগের জন্য প্রাণ যেন পাগল হইল ; সে যোগ এখনও হয় নাই, যাহাতে শরীর দেখিলে যেমন সুখ হয় শরীর না দেখিলেও তেমনি হইবে। আজ কাল সেই যোগের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছি। তোমাকে নিকটে উপস্থিত দেখিলে সকল বিষয় বলিব। এখন মায়ের কৃপাকে শুভক্ষণে ধরিতে পারিলেই হয়। কত কথা আর লিখিব, শেষ তো নাই। যোগ বাড়ুক, মা তাই করুন ; কারণ এ লেখাও তো আর থাকিবে না। মন চ'লে যাউক, সকল কথা বলে আসুক, এই ভাল। তুমি আর এখন মিরচাইগঞ্জে নও, এই যে আমার পাশে সত্যই আমি অনুভব করিতেছি। মা, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর, সেই যোগ দাও।"

এই সময় কোনও শ্রদ্ধেয়া ভগিনীকে লিখিয়াছিলে, "কয়দিন নেওরায় খগোলের ভাই বোন সহ খুব ভাল কাটাইলাম। কাল এখানে আসিয়াছি। আর শেষ ক'টা দিন নিস্তব্ধ থাকিবেন না। একবার আগুনটা খুব ভাল ক'রে জ্বেলে দিন। আর যে বিলম্ব সয় না ; কবে কি হইবে ? খুব ধুমধাম লাগান না ! দিন যে গেল। মা এবার চরিত্র ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছেন। কে তাঁহার সেই সাধ পূর্ণ করিবে ? মাতা ও পৃথিবী ও ভক্তগণ

আমাদের উপর বড় বেশী আশা করিয়াছেন। এবার শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু মহাশয় একই কথা বলিলেন যে, এইখানেই সেই দল হইবে, যে দলের ছায়ায় লোক শান্তি পাইবে। দিদি, এ কথা শুনিলে ভয় হয়, কিন্তু মাও ছাড়িতেছেন না। আর এক কথা শুনিলাম যে, নারীর ধর্ম্ম না হইলে ধর্ম্ম থাকিবে না। তবে উঠুন, আর বিলম্ব করিবেন না। আমরাই যদি প্রতিবন্ধক তবে আর দেরী করা উচিত নয়।"

আর একবার আমি মফঃস্বলে গেলে আমাকে লিখিয়াছিলে, "পিকু! তুমি এবার আশ্চর্য্যরূপে নিকটে বাস করিতেছ। এইরূপ নিকটে দেখিতে পাইলে আমার আর কিছু বলিবার নাই। মন খুব ভাল। কাজ বেশ করিতে পারিতেছি। লিখে আর এখন কথা শেষ হয় না। চিন্ময় কথাই ভাল। এখন তুমি জলে আমি স্থলে। —র মা ভক্তিকে বলিয়াছেন, সুবোধের বাবা, মা যখন একত্র যান, কেমন বেশ দেখায়, যেন ভাই বোনের মত। যাকে যে ভালবাসে, তার সকলই তার ভাল লাগে।" যোগেই এ প্রফুল্লতা হয়। দুঃখের বিষয় এ চিন্ময় যোগ সর্ব্বক্ষণ থাকে না। দুর্ব্বল মানুষ, জড় শরীর না পাইলে তাহার মন ওঠে না। জড়েই ভুলিয়া থাকিতে চায়। তুমিও তো মানুষ ছিলে, তোমারও ঐ দশা হইত। যোগে বঞ্চিত হইলে তোমার কি কষ্ট হইত, নিম্নোক্ত পত্র পড়িলে বুঝা যায়। এখন ৪টা বাজিয়া ১৪ মিনিট, এই স্কুল হইতে আসিলাম। সভার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। আজ একটী গুরুভার মাথায় লইতে যাইতেছি। কি হইবে জানি না। ফল মায়ের হাতে। তুমি এ সময় প্রার্থনা করিও; মা আশীর্ব্বাদ করুন। কাল গাড়ী যখন বাড়ী মুখে ফিরিল, অমনি চক্ষু দিয়া অনেকখানি জল পড়িল। আর বাধা দিলাম না। ফটকের বাহিরে আসিতে আসিতে পরলোকের ছবিখানি মা হাতে লইয়া দেখা দিলেন, আর সেই ছবি দেখিতে দেখিতে সমস্ত পথ বেশ এলাম। কাল সমস্ত

সময় আজ এ পর্য্যন্ত সেই ছবিখানি আমার সাম্‌নে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেশ দিন কাটিল। আশা করি তোমারও তাই। আর আমার শরীরের জন্য ব্যাকুলতা নাই। এখন দর্শনে পৌঁছিয়াছি। এখন প্রাণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়, এইতো এবার বুঝিতেছি।

একবার আমি গঙ্গাতীরে সুন্দর শোভাময় স্থানে একটী বাঙ্গালাতে ছিলাম। ইচ্ছা হইল, তুমিও আসিয়া সে শোভা দর্শন কর। তোমাকে লিখিলাম। উত্তরে তুমি লিখিলে, "চিরমুক্ত! এবার বেশ আছি। কোনও রূপে মন উদাস নয়। এ কাজ আমার পরিত্রাণের জন্য। এই কয়দিনে শরীরের আসক্তি বিষয়ে অনেক উপকার দেখিতেছি। মার কৃপায় আশা করি মুক্ত হইব। এমন মন আর কখনও ছিল কি না মনে নাই। যে নির্ভর করে, তার এইরূপই হয়। আমি গেলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাইতে হয়। তাই ভাবিতেছি, দেখি কি হয়। যদি যাই সন্ধ্যার সময়। আহারাদির কোন জোগাড় করিও না। যাওয়ার ঠিক নাই। যদি যাই, আহার করিয়া যাইব। আশা করি মার কোলে তুমি ভাল আছ। এবার তুমি বড় নিকট। তবে বিদায়।" পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে যদি একটা বিস্তৃত সমতল ভূমি পাওয়া যায়, তাহা হইলে মনে হয়, বুঝি এই শেষ, বুঝি আর উঠিতে হইবে না। যোগ-রাজ্যের সেইরূপ এক ভূমিতে তুমি এই সময় উঠিয়াছিলে; সুতরাং তোমার দুঃখ নাই। তখন তুমি প্রিয়জনকে নিকটেই দেখিতেছিলে, আর কাঁদিবে কেন? কিন্তু অনন্তের রাজ্যে তো কাহারও কখনও নিস্তার নাই। "হইল না" একথা বলিতেই হইবে, নইলে অনন্ত উন্নতি একটা কথার কথা মাত্র যখন ঈশ্বর যোগ-ভূমিতে লইয়া যাইতেছেন, তখনও কত তর্ক, কত আশঙ্কা! মন তখনও কত তোলপাড় হইত তাহা এই পত্রে বুঝা যায়। "কাল গাড়ীতে আসিতে আসিতে ভাবিতেছিলাম, অসুস্থ পিকুর সেবা করিতে কে দিতেছে না? আমার হাত পা কে বন্ধ করিয়া

ফেলিয়াছেন? উত্তর আসিল, 'মালিক এই হুকুম দিয়াছেন।' কোথাও কেহ নাই, অথচ এই শব্দ আসিল, অমনি মাথা হেঁট করিয়া 'বস্' বলিলাম। স্কুলে আসিয়া অনেকবার স্মরণ হইল। স্মরণের বেড়ার ভিতর তুমি খুব উজ্জ্বল ভাবে ছিলে। সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিয়া একবার চুপ করিয়া একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিল। নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শয়ন করিলাম, এবং তোমাকে খুব নিকটে দেখিয়া দূরতা যেন ভুলিয়া গেলাম। অনেক আলাপ করিলাম। ঐ যাহা গাড়ীতে হইয়াছিল তাহা তোমার কাছে বলিলাম, ও আরো বলিলাম, আমার যে তোমার সেবা করিতে ইচ্ছা করিতেছে! এইরূপে অনেক আলাপে খুব আরাম পেলাম। কিন্তু তোমার নূতন স্থানে হয় তো কষ্ট হইতেছে ইত্যাদি ভাবিয়া মনটা আবার একটু কেমন করিল; কিন্তু আমার ইচ্ছা তো কিছু নয় এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম। পিকু! এইরূপে আমার যে তপস্যা হইতেছে, মনে হয় তাহা কিছু কম নয়। এতেই আমার জীবনকে লইয়া যাইতেছে।"

আর একবারের পত্র এই, "কাল যেরূপ দেখিলাম তাহাতে আশা বাড়িল। যেমন কাপড় পরিলাম, অমনি যেন কর্ত্তব্যের ভিতর পড়িলাম আর আসক্তি মায়া কোথায় চলিয়া গেল। বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিলে। যেমন করিয়া তুমি আমার মায়া পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হও, তেমনি করিয়া তোমার মায়া ভুলিয়া আমি অগ্রসর হই ত কাল পারিয়াছিলাম। আশা হইতেছে যে আমিও মায়ামুক্ত হইতে পারিব। আর কি বলিব। আমার মন সুখী। আমার আর কি সুখ! মার এবং তোমার ইচ্ছা পালনই আমার সুখ। তবে এখন বিদায়।

২০শে অক্টোবর তোমাকে আমার সঙ্গে মফঃস্বলে চলিতে বলিলাম। কর্ত্তব্যের জন্য এবারও তুমি যাইতে পারিলে না। আমার মনে হইল, তবে একাকীই যাইতে হইবে। ওদিকে তুমি

লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছ, "আমাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করায় আমি ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইব না বলিলাম। কারণ, আমার সুখের জন্য অনেক কর্ত্তব্য নষ্ট হয়, অতএব কি করিয়া যাইব? গেলাম না বটে, কিন্তু মন আমার তাঁহারই সহিত চলিয়া গেল। আমি বেশ বুঝিলাম আমার মনও গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেলে উপরে আসিয়া ডায়েরী লিখিলাম। প্রায় ১৯ ঘণ্টা আমি জাগিয়া থাকি। এ সময়ের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশুদ্ধ দুই কি তিন ঘণ্টা অঃ প্রঃ আমার মনে থাকেন না। আজ বড়ই মনটা কেমন করিতেছে, কি জানি! মা, তুমি তাঁহাকে কোলে কর।"

৯ই নভেম্বর লিখিয়াছ, "কাল সন্ধ্যার সময় উপাসনার ঘরে একাকী বসিয়া পরলোকের কথা ভাবিতেছিলাম। তুমি অবশ্যই ছিলে। মনে হইল যেন তুমি অনেক দূর দেশে গিয়া পড়িয়াছ। তাহাই সত্য। কারণ নিকটে থাকিলে সংবাদ পেতাম। নিজ দেশে গেলে আর তো কাগজে সংবাদ আসিবে না। তখন তার ভিন্ন আর সংবাদের উপায় থাকিবে না তারটা পরিষ্কার চাই। ব্রহ্মরূপ তার সাফ না করিলে সংবাদ দেওয়া কড় কঠিন। সেই তার কিসে পরিষ্কার রাখি এই কথাই আজ উঠিল। এই ভাবেই উপাসনা হইল। ইচ্ছা করিতেছে, জিজ্ঞাসা করি কবে আসিবে। কিন্তু করিব না, কেন না সে দেশে গেলে তো আর ঐরূপ কথা ব্যবহার হইবে না যাক্ আর না, বিদায়। তোমার অঘোর।"

১২ই ডিসেম্বর লিখিয়াছ, "আজ স্বামী মহাশয় বাহিরে গেলেন। ৪টার সময় আমি আবার শয়ন করিয়া ঘরের দিকে চেয়ে দেখি সব খালি। সহজেই মনে হইল, মানুষ নাই। একে তো মৃত বলি না, বলি অনুপস্থিত। মৃতকে তবে আর মৃত বলিব না, অনুপস্থিত বলিব। উপাসনায় গেলাম। যোগ যে বাড়িতেছে বেশ বুঝিতে পারিলাম। প্রার্থনা ছিল, আত্মা দূরে গেলে যেন অনুপস্থিত বলি,

আত্মা মার নিকট গেলেও যেন অনুপস্থিত বলিতে পারি। মা তাই আজ ভিক্ষা যে, অদর্শনে যেন বলিতে পারি, অনুপস্থিতের দর্শন দাও।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পতাকা বহনের শক্তি

অনেকদিন পরে সঙ্গীতে শুনিলাম, "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।" ১৮৯৫ সালে তোমাকে নারীজাতির সম্মানের পতাকা অনেক বিরোধ ও বিসম্বাদের মধ্যে বহন করিতে হইয়াছিল, এবং দেখিলাম সত্য সত্যই তুমি সে পতাকা বহনের জন্য বলও লাভ করিয়াছিলে। শুধু এই পতাকাই নয়, এই বৎসরের মধ্যে তোমাকে শোকের ক্রসও বহন করিতে হইয়াছিল।

১৮৯৪ সাল হইতেই তুমি মাঝে মাঝে পরলোকগত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাটীতে যাইতে। এইরূপে তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হইতেছিল। তুমি তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদে যখন তোমার সেই বেহারের সাড়ী পরিয়া যাইতে, তোমায় বেশ দেখিতে লাগিত। প্রথম প্রথম উঁহারা কেহ তোমার সঙ্গে দেখা করিতে তোমার বাড়ী আসিতেন না। কিন্তু তুমি তাহাতে কিছুই দুঃখিত হইতে না। কারণ তুমি সাংসারিক ভদ্রতায় চলিতে না, বা অহঙ্কারমূলক আত্মসম্মানবোধেরও ধার ধারিতে না। পরে যখন উঁহাদের বাড়ীর মহিলারা তোমার পরিবারকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন, ও যখন তোমার বিদ্যালয়ের সংস্রবে মাঘোৎসবের সময় *tableau vivent* (ট্যাবলো অভিনয়) করিবার কথা হইল, তখন উঁহারাও ঘন ঘন তোমার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপে উঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়া গেল।

এত বড় একটি ব্যাপার সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প করিলে, কিন্তু তোমার নিজের তো সব জানা ছিল না যে, কি করিয়া কাকে

সাজাইতে হইবে ও শিখাইতে হইবে। পরলোকগত গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ তোমার প্রধান সহায় হইলেন। শেখান, সাজান, সব সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। ক্রমে তোমাদের উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। যাহারা শিখিতে লাগিল তাহাদেরও খুব উৎসাহ হইল। দেখা গেল, সাজ সজ্জা, গান ও আবৃত্তি অতি সুন্দর হইবে। অবশেষে অভিনয় দেখাইবার দিন আসিল। সে দিন তোমাদের কি ব্যস্ততা, কতই উৎসাহ, কতই আনন্দ! শুধু আনন্দ নয়, ইহার সঙ্গে কিছু কিছু মানসিক উত্তেজনাও ছিল, কারণ এক শ্রেণীর লোকে ইহা পছন্দ করিতেছিলেন না। তাঁহারা তোমার উচ্চ উদ্দেশ্য বুঝিলেন না; এ সব করা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

প্রথমে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গান করা হইল। তারপর স্বর্ণমুকুটভূষিতা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা পদ্মবনে দেখা দিলেন। নেপথ্যে লক্ষ্মীর স্তব গান হইতে লাগিল। ইহার পর আবৃত্তি; তারপর আবার শ্বেতপদ্মবনে শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা বীণাপুস্তকহস্তে সরস্বতী দেখা দিলেন, ওদিকে নেপথ্যে সরস্বতীর স্তুতিগান হইতে লাগিল। তারপর আবৃত্তি; তারপর ব্যাঘ্র ও সর্পময় বনে লুণ্ঠিত অঞ্চলে ঊর্দ্ধনেত্রে যোড়করে ধ্রুব দেখা দিলেন। নেপথ্যে সঙ্গীত হইতে লাগিল, "বিজন কাননে সুনীতি তনয় কাঁদে কোথা হরি ব'লে, দু নয়নে ধারা বয়।" তারপর ফুলের বাগানে আসিয়া দুটী বোন, প্রকৃতির রচয়িতা কে? এই প্রশ্ন বিস্ময়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল। তারপর বৃক্ষমূলে পাশবদ্ধ রাজকুমার প্রহ্লাদ ঊর্দ্ধমুখে নতজানু হইয়া দেখা দিলেন। নেপথ্য প্রহ্লাদের উক্তিসূচক সঙ্গীত হইতে লাগিল। তারপর সঙ্গীত, "There is a happy land, far far away." তারপর কমণ্ডলু রুদ্রাক্ষমালা গৈরিক ও জটা চিহ্নিত "ধর্ম্ম", ঊর্দ্ধনয়না কৃতাঞ্জলি পুষ্পমুকুটধারিণী "ভক্তি", ও ক্রোড়ে পুস্তকধারিণী বাম হস্তে ন্যস্তশীর্ষা চিন্তানিমগ্না "বিদ্যা" দর্শন

দিলেন। তারপর ক্রমশঃ অভিমানিনী বালিকার আবৃত্তি, বিচিত্র বেশে ছয় ঋতুর আবির্ভাব ও এক বালিকাকে সান্ত্বনা প্রদান, এ সকল হইয়া গেল। সর্ব্বশেষে সঙ্গীত হইল, "না জাগিলে সব ভারতললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

এই দিন সকালে ব্রাহ্মিকা সমাজ ছিল। সেখানে তোমাকে উপাসনা করিতে হইয়াছিল। তারপর সারাদিন তোমরা ট্যাব্লোর জন্য খাটিলে। বাহিরের অনেকে তো তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেনই, অবশেষে তোমার স্বমণ্ডলীভুক্ত এক ভাই বলিলেন, তোমার সকল কাজেই বাড়াবাড়ি ও তোমার আচরণ বাজারের স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনীয়। সেদিন তুমি রাত্রিতে আসিয়া আমার বক্ষে মাথা রাখিয়া অনেক ক্রন্দন করিলে। আমরা উভয়ে প্রার্থনা করিলাম, তারপর মনের ভার চলিয়া গেল।

শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেবার বিদেশ হইতে প্রচার করিয়া কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। উৎসবের দিনই তাঁর বাঁকিপুর ষ্টেসন দিয়া মেলট্রেণে চলিয়া যাইবার কথা। তুমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলে। বিকাল ৪টার ট্রেণে সদলবলে দানাপুরে উপস্থিত হইলে। সেখান হইতে একখানি গাড়ী মেলট্রেণের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইবে, তাহাতে তোমরা সকলে বাঁকিপুর পর্য্যন্ত আসিবে, এই বন্দোবস্ত করা গেল। মেলট্রেণ দানাপুর ষ্টেসনে আসিবামাত্র সকলে মিলিয়া শ্রদ্ধেয় মহাশয়কে সেই গাড়ী খানিতে লইয়া আসিলেন। তাঁহার গলায় পুষ্পমাল্য দেওয়া হইল, পুষ্প ও সুগন্ধ বৃষ্টি করা হইল, অভ্যর্থনাসূচক একটী কবিতা আবৃত্তি করা হইল। পরে প্রার্থনা হইল। বাঁকিপুর ষ্টেসনে গাড়ীখানি কাটিয়া দেওয়া হইল। শ্রদ্ধেয় মহাশয়কে লইয়া মেলট্রেণ চলিয়া গেল, আমরাও ষ্টেসন হইতে উপাসনা মন্দিরে আসিলাম।

এই যে আমরা শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিতে গেলাম, ইহাতে অনেকে মন্দ বলিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন,

উৎসবের দিনে মানুষকে বড় করা কেন? মানুষকে, বিশেষতঃ যে ব্রহ্মসন্তান বিদেশ হইতে ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন তাঁহাকে, আদর করিলে যে উৎসব করা হয়, একথা ভক্তিহীন ব্রাহ্মসমাজ অনেক বিলম্বে বুঝিবেন। যাহা হউক, এবার বেশ ধুমধামের সহিত উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। ট্যাবলো অভিনয়ের পরের দিন (২৭শে জানুয়ারী) আমাদের তুজনের আধ্যাত্মিক বিবাহোৎসবও হইয়া গেল।

এ বৎসর তোমার জন্য নিন্দা ও সমালোচনা প্রচুর পরিমাণে অপেক্ষা করিতেছিল। এই সকল ব্যাপারের পরই রাজগৃহ যাত্রা করিলে। পথে একখানি গাড়ী উল্টিয়া গিয়া কয়েক জন আঘাত প্রাপ্ত হন, তাই প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আর যাওয়া হইবে না। কিন্তু যাওয়া তো হইলই, অন্যান্য বারের মত এবারও মেয়েরা পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গেলেন। ইহার জন্য চিরপ্রচলিত যা নিন্দা তা হইল। তারপর বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিয়া স্কুলের প্রাইজ দিবার সময়, মেয়েরা কোথায় বসিবে, কি ভাবে প্রাইজ আনিতে যাইবে, ও পর্দ্দা হইবে কি না, এ সব বিষয়ে লইয়া অনেক আলোচনা ও সমালোচনা হইল। মাঝে মাঝে তোমাকে একটু উত্তেজিতও দেখিতেছিলাম।

যাহা হউক, এ সব ব্যাপার শেষ হইয়া গেল, তারপর তোমার বিদ্যালয়ের কায, পরিবারের কায, ও পরসেবার কায আবার নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল। কিন্তু এ বৎসর তোমার শরীর বড়ই ভাঙ্গিতে লাগিল। তুমি বলিতে, "ভাঙ্গা শরীর আর বসাইয়া রাখিয়া কি হইবে?" একদিনও বসাইয়া রাখিতে চাহিতে না, একদিনও নিয়মিত কাযগুলি ছাড়িতে চাহিতে না। এই ভাবে কায করিতেছ, এমন সময় মার্চ্চমাসে আর একটী ঘটনা ঘটিল। সন্ন্যাসীচরণ রায় নামক একটী যুবক আসামে চা বাগানে কায করিতেন। তাঁর নামে মিথ্যা চুরীর মোকদ্দমা লাগান হওয়াতে তিনি হঠাৎ ভীত হইয়া চা বাগান হইতে পালাইয়া দানাপুরে চলিয়া আসেন। এখানে তাঁহার

নামে ওয়ারাণ্ট আসে, ধৃত হইয়া তিনি এখানকার জেলে প্রেরিত হন তুমি জেলে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলে। তাঁহার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া তোমার বিশ্বাস হইল যে তিনি নির্দ্দোষ। তখন হইতেই তুমি তাঁর মুক্তির জন্য উদ্যোগী হইয়া পড়িলে। তুমি তাঁর জন্য এত ব্যস্ত হইলে যে মানুষ আপন সন্তানের জন্যও এত হয় কি না সন্দেহ। তাঁর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলে। যখন তাঁহাকে কয়েদ অবস্থায় আসাম লইয়া যাওয়া হইল, তখন ব্রজগোপালকে তাঁহার সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দিলে। ব্রজগোপাল নওগাঁতে গিয়া উকীল শ্রীযুক্ত রামদুর্লভ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে উঠিলেন। তিনি অনেক যত্ন ও সাহায্য করিলেন। অবশেষে সন্ন্যাসীচরণ দণ্ডমুক্ত হইলেন। যতদিন না তাঁহার মুক্তি হইল, তুমি প্রতিদিন তাঁর জন্য কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতে। প্রথমে নিম্নতর বিচারালয়ে তাঁর দেড় বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। যখন এ সংবাদ তারযোগে এখানে পৌঁছিল তখন বাগানে উপাসনা হইতেছিল। তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা কখনই ভুলিব না। পরে যখন আবার তারযোগে মুক্তি সংবাদ আসিল, তখন তোমার আনন্দ আর ধরে না। সন্ন্যাসীচরণ এই সূত্রে তোমার চিরদিনের আপনার হইয়া গেলেন। সুবোধের ন্যায় তিনিও যেন তোমার এক পুত্র হইয়াছেন।

এদিকে তোমার পরিবার বাড়িতে লাগিল। আয় কিন্তু বাড়িল না। যাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা সে মাসের মধ্যেই দিতে, বাজারে ঋণ করিতে না। এ অবস্থায় সংসার চলে কিরূপে? একবার অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া মেয়েদের কাছ হইতে তাহাদের হাতখরচের টাকা হইতে ধার লইয়াছিলে। সে টাকাও তুমি নিজেই তাঁহাদের দিয়াছিলে, কিন্তু সেই নিজের প্রদত্ত টাকা ধার লইয়াও তোমার মনে পরে অত্যন্ত অনুতাপের যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল। একবার মাত্র এরূপ করিয়াছিলে, আর কখনই কর নাই। এ বৎসর তোমার

বিশ্বাস আরও উজ্জ্বল হইয়াছিল। একদিন তুমি লিখিয়াছ, "আমি যেন এই পরিবারের জন্য ভাবি না। আমার সকল ভার তুমি লও। আমার ভাই বোন আমার এই পরিবারের জন্য ভাবিতেছেন। আজ আমার পরিবারে একটা পয়সাও ছিল না। সকালে একটী ভগিনী পুরাণ কাগজ বিক্রয় করিয়া ১৷৴০ আনা দিলেন। বৈকালে আবার একটী কন্যার বাবা ১১৲ টাকা নিজে আনিয়া দিলেন। তিন জোড়া বস্ত্রের ও অন্যান্য খরচের বড় দরকার হইয়া ছিল। এ ১২৷৴০ দান পাইয়া ধন্যবাদ করিলাম মাকে। এইরূপে এই বৎসর মা নিজে আমার সকল অভাব পূর্ণ করিতেছেন।" এ তো নূতন কথা নয়। মানুষের বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায় না, বিশ্বাসী তাহা সরল বিশ্বাসে বুঝেন। যখন পরিবার বাড়িতে লাগিল, আমি একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তুমি বলিলে, "তাহাও কি হয়? মেয়ে আসিলে ফিরাইয়া দিব কিরূপে?" আমি আর কিছু বলিতাম না। তোমার সহকারিণীগণ অনেক সময় পারিয়া উঠিতেন না। একদিন তুমি লিখিয়াছ, "আজকাল অত্যন্ত সাংসারিক অভাব। কর্ম্মকারিণীরা অনেকে বকেন। সব হাসিয়া উড়াই, কখনও চুপ করিয়া থাকি। আশ্চর্য্য, একদিন কিছুই ছিল না। ঐরূপ বকুনি ও হাসির পর একজন কর্ম্মকারিণী নীচে হইতে হাসিতে হাসিতে ৫টা দানের টাকা পাইয়া লইয়া আসিলেন। ঐ টাকা পাইবার সে দিন কোন কথা ছিল না। ঐ টাকা দেখিয়া মাকে ধন্যবাদ দিলাম। পরিবারে বিশ্বাস বাড়িল।"

২৩শে আগষ্ট রাত্রিতে তোমার কন্যা সরোজিনীর একটি পুত্র সন্তান হইল। এই প্রথম দৌহিত্র; তাহার সুন্দর মুখখানি তোমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কন্যার সেবা করিতে গিয়া তুমি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িলে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল।

এই বৎসর আসানসোলে একজন নারীর প্রতি অত্যাচার হয়।

তুমি সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলে না। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে এ বিষয়ে লিখিয়াছিলে। অবশেষে ছোটলাটপত্নীকেও পত্র লিখিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলে। লেডী ঈলিয়ট মনোযোগী হওয়ায় অত্যাচারীর ৫ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল।

এই বৎসর হইতে তোমার বাটীতে একটী অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিলে। তোমার অবর্ত্তমানে তোমার পরিবারের কন্যারা এখনও ইহা পালন করিয়া থাকেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সব ভাইদের নামের প্রথম অক্ষর এক এক খানি রুমালের কোণে লেখা হইল। একদিকে ভাইয়েরা সমাদর লাভ করিবার জন্য বসিলেন, অপর দিকে ভগিনীরা সমাদর করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ভগিনীদের পক্ষ হইতে একটী ছোট মেয়ে সকলকে ফোঁটা দিলেন। সঙ্গীত হইল, তুমি প্রার্থনা করিলে। তারপর সকলকে জলযোগ করান ও নামাঙ্কিত রুমাল উপহার দেওয়া হইল। এ অনুষ্ঠানটী আমার অতি সুন্দর লাগিয়াছিল। এখনও বাঁকিপুরস্থ মণ্ডলীর এটি একটী বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান।

নবেম্বর মাসে তোমার স্বাস্থ্য আবার ভগ্ন হইয়া পড়িল, কিন্তু কায কিছুই কমাইলে না। এই সংগ্রামের মধ্যে তোমার জন্য ভগবান আর একটী গুরু ভার ক্রস্ পাঠাইলেন। তাহা বহন করিতে গিয়া তুমি তোমার বিশ্বাসের শক্তির পরিচয় আশ্চর্য্যরূপে দান করিলে। ডিসেম্বর মাসে তোমার আদরের দৌহিত্র পীড়িত হইল। কন্যা সরোজিনী কখনও এত শক্ত সেবা করেন নাই, কাজেই তোমার পরিশ্রম বাড়িতে লাগিল। বন্ধুরাও ব্যস্ত হইলেন, ও সাহায্য করিতে লাগিলেন, ও শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ দান করিতেন। রোগ বাড়িয়া চলিল, ইহার মধ্যে মাস শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, অর্থের গুরুতর টানাটানি পড়িয়া গেল। রোজ ৪।৫ টাকা ব্যয় হইতেছিল, আয়ের ও অন্য কোনও পথ ছিল না। ২৩শে ডিসেম্বর

আমার অত্যন্ত চিন্তা হইল। তুমি প্রায়ই খোকার কাছে উপরের ঘরে থাকিতে। সেদিন সকাল বেলা একটু অবকাশ পাইয়া ভাঁড়ার ঘরে গেলে, অবসর বুঝিয়া আমিও ভাঁড়ার দেখিতে গেলাম। সেখানে তোমাতে আমাতে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

আমি—এত খরচ হইতেছে, এখন তোমার অর্থের সম্বল কিরূপ?

তুমি—আছে। (পাছে চিন্তিত হই, তাই অভাব থাকিলেও আমাকে জানাইতে না।)

আমি—ও আমি বুঝি না। আজ তোমার হাতে কত আছে?

তুমি (একটু হাসিয়া)—এক টাকা।

আমি—কি বলিলে? ৪।৫ টাকা নিত্য ব্যয়, আর আজ সকালে তোমার হাতে একটাকা মাত্র?

তুমি আবার বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলে—ভাবিও না, হইয়া যাইবে।

আমি—আমি বুঝিতে পারি না, তুমি কিরূপে স্থির আছ।

এই বলিতে বলিতে ঘরের বাহির হইলাম, ও চিন্তাকুল হইয়া বারান্দায় পাইচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় বড় রাস্তায় কেহ ডাকিল "বাবুজী, বাবুজী।" বাহিরে গিয়া দেখি একজন পোষ্ট পিয়ন মণি অর্ডার লইয়া আসিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, পরিবারের তিনটী মেয়ের জন্য কোন অপরিচিত বন্ধু খরচ পাঠাইয়াছেন। তাহাদের জন্য আর কখনই খরচ আসে নাই, পূর্ব্বেও নহে, পরেও নহে। যেদিন বিশেষ অভাব সেইদিনই ৩০টী টাকা আসিয়া উপস্থিত। টাকা লইয়া তোমার হাতে দিলাম। তুমি তখন বিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কি বলিলে তাহা কি তোমার মনে আছে? তোমার না থাকিতে পারে, কিন্তু আমি কেমনে ভুলিব? তুমি এই মাত্র বলিলে, "দেখলে?" বিশ্বাসের জয় হইল, আমি হার মানিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আমারও অবিশ্বাস ও সঙ্কোচ দূর হইল।

২৪শে ও ২৫শে খোকার রোগ খুব বাড়িল। ঘরেই আমাদের খ্রীষ্টোৎসব হইতে লাগিল। ২৫শে খোকাকে ফেলিয়া উপাসনার গৃহে আসিতে পারিলে না। ২৬শে উপাসনা উপরের ঘরেই হইল। তুমি খোকাকে কোলে করিয়া উপাসনা করিলে। ২৯শে এই প্রার্থনা করিলে, আমরা যেন শিশুর রোগের মধ্যে সকলেই ক্রুশ বহন করিতে পারি। তুমিও এখন বুঝিলে, খোকা থাকিতে আসে নাই। বেশ প্রস্তুতি হইতে লাগিল। জামাতা জ্ঞান আসিলেন, খুব চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না। ৪ঠা জানুয়ারী (১৮৯৬) অমর যাত্রী অমর ধামে চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে ১লা জানুয়ারী পরেশের বাটীতে নববর্ষের উপাসনা হইয়াছিল। সেদিন বন্দোবস্ত করিয়া তুমিও গিয়াছিলে।

৫ই জানুয়ারী অনেক বড় বড় গোলাপ ফুলে খোকাকে সাজাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। গোলাপ ফুলের মধ্যে খোকার মুখ খানিও একটি গোলাপের মত দেখাইতেছিল। অনেকদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, তোমাকে শ্মশান দেখাইব। তোমার খোকা আগুনে পুড়িবে, তুমি তাই দেখিতে চাহিলে। গাড়ী করিয়া তুমি ঘাটে গেলে। যখন দাহ কার্য্য হইতেছিল, তাহার মধ্যে তুমি একবার বলিয়াছিলে, "সুবোধ, অত নিষ্ঠুর কেন হও?"

এইরূপে ১৮৯৫ সাল চলিয়া গেল। তোমার জন্য এ বৎসরটা ভগবানের অর্পিত ক্রস ক্রমশঃ ভারী হইয়াছিল। তুমি তাহা নিরাপত্তিতে বহনও করিতেছিলে। বাহিরের জীবনে এই ক্রস, অন্তরের জীবনেও দেহের সঙ্গে সংগ্রাম, ও আমার সঙ্গে মিলনের জন্য আপনাকে বলিদান, এ সকল অন্তরকে শ্রান্ত করিতেছিল। তুমি সে সকলকে কেমন করিয়া "মায়ের হাতের বেদনার দান" বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলে, কেমন করিয়া "জীবনে মৃত্যু বহন" করিয়া মৃত্যুকে জীবন বলিয়া আদর করিতে পারিয়াছিলে, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ "তোমার হাতের বেদনার দান"

তোমাকে নিজে মীমাংসা করিয়া অনেক সময় কায করিতে হইত। কায করিতে হইলেই তো ভুলও হইয়া থাকে। ভুলও হইতে লাগিল। জ্ঞানের তারতম্য ছিল বলিয়া তোমাতে আমাতে একটু অমিলও হইতে লাগিল। তখন মনে হইত, দুজনার মধ্যে একজনার আমিত্ব একেবারে চলিয়া গেল তবে সামঞ্জস্য হইবে। তোমার ২৯শে মে ১৮৯৫ তারিখের দৈনিক ইহার প্রমাণ। "আজ সকাল হইতে মনটা বড় চিন্তাযুক্ত। এই প্রশ্ন হইতেছিল, আমি কি খারাপ হইয়া গিয়াছি? আজ কয় সপ্তাহ হইতে মনে বড় ঝড় চলিতেছে। আজ তাই এই কথা মনে হইল। দয়াময়ী মা উপাসনায় বলিয়া দিলেন, 'তোমাকে ১০ বৎসর বয়সের সময় যে ধন দিয়াছিলাম, সেই ধন হারাইয়াছ। আমিত্ব হারাইয়া চির অধীন থাকিবে বলিয়াছিলে,—এখন তুমি স্বাধীন হইয়া সকল কায কর। মত হইয়াছে তোমার, বিচার কর তুমি, এই জন্য এত ঝড় বহিতেছে।' বুঝিলাম কারণ। প্রার্থনা আজ এই হইল, 'আমিত্বের ধূঁয়ায় আমাকে ঘিরিয়াছে। মা আমাকে আমিত্ব হ'তে বাঁচাও, আবার আমাকে অধীন কর। মনে বড় বিচার উঠিতেছে। সদাই যেন সকল বিষয়ে বিচার আসে, আর মন অশান্ত হয়।" ৩০শে মে লিখিয়াছ, "আমার মনে বড়ই ঝড় চলিতেছে; কিছুই পরিষ্কার হইতেছে না। আমি কি কাহারও ধর্ম্মের বাধা হইতেছি? কেন আমার মন এমন ব্যাকুল? চিন্তা এত প্রবল যে শরীর সুস্থ হইতে পারিতেছে না। কি করি মা, বল।"

তোমারও যে অবস্থা আমারও তাই হইয়াছিল। আমার ডায়েরী দেখ। "ঘোরীর সঙ্গে এত অমিল হয় কেন? আমিত্ব যায় নাই বলিয়া। মনে কেন এত অশান্তি হয়? ইহার কারণ কি বুঝিতে

পারি না। সেই বুঝিবার ক্ষমতা দাও। ঘোরীর সঙ্গে বৈরাগ্য বিষয়ে অনেক কথা হইল। একেবারে সমুদয় অর্পণ করিতে না পারিলে নির্ব্বাণ হয় না। নির্ব্বাণ না হইলে মিলন কিরূপে হইবে? যেন সর্ব্বস্ব দিতে পারি। সন্ধ্যার সময় মিলনের বিষয় অনেক কথা হইল। শরীরের মিলন তো আমি চাই না। তাহা সহজ। আত্মার মিলন দাও।" ছু'জনার একই মত, একই সুর, একই অভাব। ভালবাসা ছিল, মিলন ছিল, কিন্তু কি যেন একটা অভাব, যেন এক বাজনা বাজিতেছে না, একটু একটু বেসুর হইতেছে, বেতাল বাজিতেছে। লোকে বলিত, খুব মিলন ইহাদের মধ্যে। আমি যখন বিহটা রাজকার্য্যে চলিলাম, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে আসিলে। এত নিকটে, কিন্তু মাঝখানে যেন এক একটা পাহাড় রহিয়া গেল।

তোমার ১লা জুনের দৈনিকে লেখা আছে, "কাল সন্ধ্যার সময় উভয়ে মিলন বিষয়ে অনেক কথা হইল। আজ সকালে ৩া৽টার সময় উপাসনা হইল। খুব ভাল উপাসনা, প্রার্থনা মিলন বিষয়ে। আত্মার মিলন যাহাতে হয় সেই পথ দেখাইয়া দেও।" আমার ডায়েরীও তাই বলিতেছে, "অতি মিষ্ট উপাসনা। রিপু বর্ত্তমান অথচ এমন ভাল উপাসনা। আমার প্রার্থনা, ঘোরীর সঙ্গে মিল অত্যাবশ্যক। ইহাতে যদি জ্ঞান ভুলিয়া যাইতে হয়, প্রেম লুকাইতে যদি হয়, তাহাও করা আবশ্যক। মা! তুমি আমার সকল কাড়িয়া লও।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ছু'জনে মতভেদ হওয়াতেই বড় কষ্ট পাইতাম। তখন তুমি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছ; স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে গেলে মতভেদ অনিবার্য্য। কিন্তু তখন এরূপ হইলে দুইজনেরই মনে বড় তীব্র যন্ত্রণা উপস্থিত হইত সত্য। সত্যই মনে হয়, এই সময়ে আমাদের যতটা আমিত্ববিহীন হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমরা হইতে পারি নাই। পরস্পরকে স্বাধীনতা দিতে হইলে আমিত্ববিনাশ ভিন্ন আর পথ নাই।

জুলাই মাসে মসৌঢ়ি গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া ছু'জন

বেশ ভাল ছিলাম। দু'জনে একত্র মিলিয়া সামান্য কোনও কায করিতে পারিলেও কেমন পবিত্র আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা সেখানে গিয়া দেখিলাম। মসৌঢ়ির আমবাগানে দু'জনে একত্রে আম পাড়িলাম। আমি বলিলাম, "তুমি গাছে চড়িতে পার?" তুমি বলিলে, "হাঁ পারি। কিন্তু কিছু মন্দ নয় তো?" আমি বলিলাম, "না; চড়'।" তার পর তুমি গাছে চড়িলে। আমার বড় আমোদ হইল।

এইরূপে কখনও মতভেদের জন্য কষ্ট, কখনও বা একত্র কায করিয়া আনন্দ, এই ভাবে এই বৎসর চলিতে লাগিল। দু'জনের মধ্যে কষ্টের কয়েকটা স্থায়ী কারণও ছিল। তোমার জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ তুমি সব সময় মনের ক্লেশে থাকিতে। যদি আমি কখনও কোনও বন্ধুর সঙ্গে ইংরাজিতে আলাপ করিয়া সুখী হইতাম, অমনি তুমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে ও বলিতে, "দু'জনের বিদ্যা সমান না হইলে বিবাহ হওয়া উচিত নয়।" আমি যদি কাহারও সহিত আলাপে বা প্রসঙ্গে অনেক সময় কাটাইতাম, ও যদি তোমার মনে হইত যে, তোমার প্রাপ্য সময় বা মনোযোগ আমি অপরকে দিতেছি, তাহাতে তোমার মনে বড় কষ্ট উপস্থিত হইত। একবার পঞ্জাব হইতে আগত একটি ধর্ম্মপ্রাণ ভাইকে (মঙ্গল দেওজীকে) পাইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে কয়েক দিন অনেক সময় কাটাইয়াছিলাম। ইহাতে তুমি অসুখী হইয়াছিলে। শরীরের সম্বন্ধ ত্যাগের সংগ্রামও তোমার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইতেছিল। আমার ইচ্ছা হইত যে, আমার শরীরের প্রতি তোমার কিছুই টান না থাকে; তাই প্রস্তাব করিলাম যে, একেবারে পরস্পরের শরীর স্পর্শ করিব না। তুমি ইহাতে অসুখী হইয়াছিলে। যখনই মনে করিতে যে, আমার শরীরের জন্য তোমার যতটা টান আছে, তোমার শরীরের জন্য আমার ততটা নাই, তখন তোমার মনে অতিশয় যন্ত্রণা উপস্থিত হইত।

এসকল সংগ্রাম অন্তরেই থাকিত; এ সকলের জন্য বাহিরের কোনও কাযে বাধা উপস্থিত হইত না। কিন্তু এ সকলের জন্য তোমার ভগ্ন শরীর আরও ভগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। লোকে আমাকে কত মন্দ বলিতে লাগিল যে আমি তোমাকে অতিরিক্ত খাটাইয়া তোমার শরীর নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি, কিন্তু তুমি কোনও কায ছাড়িতে চাহিতে না। কারণ, যতক্ষণ মায়ের সেবার জন্য উৎসাহ প্রজ্জ্বলিত থাকিত ততক্ষণ এ সকল সংগ্রাম মনকে অধিকার করিতে পাইত না। যখনই বাড়ীতে কোনও অতিথি আসিতেন, কিংবা তোমাকে পরসেবার জন্য অন্যের বাড়ীতে যাইতে হইত, তখনই তোমার মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইত।

এ বৎসর তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণার দিন গিয়াছে ৪ঠা আগষ্ট। এই দিনের দৈনিকে লিখিয়াছ, "মা, আমি জানিতাম, আমায় কখনও পরীক্ষায় ধরিবে না, সুখ ভিন্ন দুঃখ কখনও আমাকে ছুঁইবে না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, মানুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব। আমাকে পরীক্ষায় ঘিরেছে। আমি ভয় পাইব না। চিরদিন এ পরীক্ষা থাকিবে না। আশীর্ব্বাদ কর, তোমার হাতের পরীক্ষা যাহা আমার মঙ্গলের জন্য এসেছে, আমি যেন আদর করিতে পারি। আমাকে ধৈর্য্য দাও, আশীর্ব্বাদ কর। আজ রবিবার, সকালের উপাসনা দামুর বাটীতে ছিল। বিকালবেলা প্রায় ৩টার সময় স্বামীনের সঙ্গে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটু বিশ্রামের পর ভাল কথা বলিতে বলিলাম। আজ কয়দিন কয়মাস, বিশেষ আজ সকাল হইতে মনটা যেন কেমন করিতেছিলে। আজ ৩।৪ বার তাহা স্বামীনকে জানাইয়াছি। এবারও তাই জানাইয়া ভাল কথা বলিতে বলায় তিনি বলিলেন, 'পরের বিচার করা উচিত নয়।' আমি অন্যের বিচার না করিয়া এই পরিবার কেমন করিয়া চালাইতে পারি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক কথা হইল। পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার উপাসনা, জীবন, কি নীচ হইয়াছে?"

উত্তর—"বুঝিতে পারি না; কিন্তু দৌড়ে যাইতে চাহিতেছি, কিন্তু বাধা পাইতেছি। আমার আর তোমার সহিত চলে না দেখিতেছি।" এই কথা শুনিয়া আমার যে কি অবস্থা হইল ঈশ্বর ভিন্ন নিশ্চয় কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না। একটু পরে ক্ষমা চাহিলাম। স্বামী হাসিয়া বলিলেন, "কোনও দোষ তো মনে হয় না।" বড়ই যাতনা হইতে লাগিল। একটু পরে আবার বলিলাম, "আমি কি তোমার প্রেমের পথের বাধা হইতেছি?" উত্তর—'একটু বই কি?' তখন মাথাটা যেন ঘুরিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। উভয়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে বলিলাম, 'তুমি সমাজে যাও।' তিনি গেলেন, আমি গেলাম না। আজ যে কথাটা স্বামীনের মুখে শুনিলাম, এই ভাবটি আজ কয়মাস হইতে একটু বুঝিতেছিলাম। যাহাই হউক, আজ আমার কি ভয়ানক ঘন পরীক্ষা! আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর একত্র বাস। যাঁহার সঙ্গে চলিব বলিয়া মা, বাপ, ভাই, বোন, দেশ, আহার, পরিচ্ছেদ, পৃথিবীর সকল বিষয় হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছি, আজ সেই মুখে আমার এই অবনতির কথা শুনিয়া মনে হয় সেই সময় একটু জ্ঞানহারা হইয়াছিলাম। আর তো কোনও উপায় নাই। সকল দুঃখের কথা যাঁহার নিকট বলিয়া শান্তি পাইতাম, তাঁহার মুখে যখন এই কথা শুনিলাম, তখন সেই অগতির গতির নিকট গিয়া একঘণ্টা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিলাম। বুঝিলাম, তিনি বলেন নাই; মা আমায় শাসন করিলেন। এখন রাত্রি ১১টা, আজ ঘুম নাই। মন ব্রহ্মে বাস করিতেছে। তবে বিছানায় যাই।"

৬ই আগষ্ট তারিখে "মুনের" নামক গ্রাম হইতে তোমাকে লিখিয়াছিলাম, "মাতৃকন্যা, মায়ের ভালবাসা লইয়া ভবের হাটে, মেলার গোলমালে স্বর্গীয় প্রেম দ্বারা সামান্য মোটা জিনিষ ক্রয় করিয়া আসিতেছ। তাহার মধ্যে অধিকাংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে,

আর আসিবে না। স্বর্গের প্রেম দ্বারা আমার শরীর ও মন ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছ, কিন্তু আত্মা কিনিতে পার নাই। আত্মা তবে কিরূপে ক্রয় করা যাইবে? তাহার একমাত্র উপায়,—ব্রহ্মকে লাভ কর, আমার চিরস্থায়ী আত্মাকে লাভ করিবে। এত দিন যে আত্মা ক্রয় করা হয় নাই সে দোষ তোমার নয়, আমারই দোষ। পূর্ব্বেই যদি তোমাকে বলিতাম, তাহা হইলে এ বয়সে তোমার এত ক্লেশ হইত না। যাহা হউক, এখনও অনেক প্রেম অবশিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে লাভ করা আশ্চর্য্য নয়। এস, তাহারই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকি। অনেক সময় যাহাতে তাঁহাকে স্মরণ হয় এমন কথা বলিব। তাঁহারই কথায়, তাঁহারই সেবায়, দিবানিশি ভুলে থাকি। "মুনের" এবিষয়ে খুব সহায়। নির্জ্জন মন্দির মসজিদ্ সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবে বাড়ী গেলে এইরূপ ভাব মনে উদয় হইবে! এখানকার মনের অবস্থা খুব ভাল। ভগবান তোমাকে এই সুখ শীঘ্রই দান করুন, এই আমার দুই প্রহরের ও সন্ধ্যার প্রার্থনা। তোমার উপর অনেক নির্ভর করিতেছে।" তুমি উত্তরে লিখিলে, "ব্রহ্মপুত্র, তোমার আশীর্ব্বাদপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। কারণ আমি অনুপযুক্ত। তোমার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হউক, মাকে আমি পাই তোমার আত্মাকে ক্রয় করি, মা শীঘ্র এই করুন। কারণ, আমার যে আর কোন কাজ হবে না যদি তোমার আত্মাকে ক্রয় করিতে না পারি। আমার জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিও। আশা করি তুমি মার কোলে ভালই আছ। তোমার মন ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। দুঃখ হয়, আমি অনেক সময় তোমার এই সুখের ব্যাঘাত হই, নিজের স্বার্থের জন্য। মা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার এই রোগ যেন না থাকে। কেমন করিয়া গৃহে ব্রহ্মকে রাখি, তুমি বাহির হইতে আসিয়া গৃহে ব্রহ্মদর্শন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পার, এ বিষয়েও কিছু বলিও। আমার শরীর মন ভাল; আর সব ভাল। এখন আমি জীবব্রহ্মে

বেষ্টিত হইয়া এই দুকলম লিখিলাম। আমার চারিদিকে ৪খান বেঞ্চ। তাহাতে আমার মায়ের আদরের ২৫টী ছোট জীবন-ধন, মধ্যে আমি। যাহা করি প্রতিদিন তাহা সত্য হউক; ব্রহ্মে নিয়োজিত হউক।”

ইহার পর তোমার শরীর খারাপ হইতে লাগিল। তখন পত্রে লিখিয়াছিলে, “তোমার সুখ হইলেই আমার সুখ। মা চিন্ময় যোগে যুক্ত করুন, আর কিছু চাই না। আমার জন্য ভাবিও না। যতদিন থাকিবার ও কায করিবার দরকার ততদিন আমি নিশ্চয় এদেশে থাকিব। আর সকলে ভাল। মন বেশ আছে। সর্ব্বদাই তোমার নিকট থাকি। অনেক আলাপ করি, সুখী হই। কষ্ট নাই। মা অতি নিকটে সর্ব্বদা থাকেন।”

আর একদিন লিখিলে, “যখন কায আসে তখন যেন কোথা হইতে বলও আসে। আমি আশ্চর্য্য হই যে আমি কেমন করিয়া এত পারি। আমার জন্য প্রার্থনা করিও, আরও তোমার উপযুক্ত হইয়া যেন মরিতে পারি। তোমার সহিত এমন একটা যোগ হইয়াছে, সে যোগে এমন একটা স্মরণ আছে, যাহা কোন সময় মনকে পরিত্যাগ করে না। আশীর্ব্বাদ কর, ব্রহ্মের সহিত সেইরূপ যোগ হউক। ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা লও। তোমার সুন্দর পত্রখানি পাইয়া ভাবিলাম, একদিন আর আমার জন্য এ পত্রও আসিবে না। বেশ, মন প্রস্তুত।” আর একদিন লিখিয়াছ, “এখন শয়ান অবস্থাতেই তোমার কথা ভাবিতেছিলাম, শরীর না থাকায় মনের কি অবস্থা হয়, যখন শরীর আর আমার নিকট আসিবে না তখন কি অবস্থা হইবে। শরীরে বা কত মিষ্টতা, আত্মাতেই বা কত মিষ্টতা, তাই অনুভব করিতেছিলাম। আত্মাকে শরীরের মত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম; সেই সুখ অনুভব করিতেছিলাম। একটা না থাকিলে আর একটার জন্য মনটা বড় টানে, তাই ভাবছিলাম। তারপর তুমি এখন কি করিতেছ তাই ভাবিলাম।” ২২শে আগষ্ট লিখিয়াছ, “বেশ হইয়াছে। শরীরটা

অসুস্থ বলিয়া তোমার সহিত এত বেশী থাকিতে পারিতেছি; শরীর ভাল থাকিলে এ সুখটা আর হইত না। শয়ন করিয়া তোমার বিষয় কতই ভাবি। মা খুব ভালবাসেন বলিয়া চারটী দেওয়ালযুক্ত স্থানেও এ অবসর দিয়াছেন। তুমি গঙ্গার কূলে বসিয়া কত সুখী হইতেছে, আমি পাছে বঞ্চিত হই, তাই আমাকেও শয়ান অবস্থায় রাখিয়া খুব সুখী করিতেছেন! চিন্তা ফেলে উঠিতে ভাল লাগে না। আজ ৮টার সময় তোমার পত্র পাইলাম। একবার মন পত্র চাহিতেছিল, অমনি ধমক দিতেই চুপ করিল। তুমি সুখে দিন কাটাইতেছ, এতে আমার মন কত সুখী ও কত নিশ্চিন্ত, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। অবশ্যই জান। তোমার ধন হইলেই আমার ঐশ্বর্য্য বাড়িবে। সত্য না? আমার মন ভাল। অনেক সহিয়া আসিয়াছে। এবার কি আমি যাইবার সময় মুখ ভার করিয়াছি? বোধ হয় না। এইরূপে তো হইবে? আমার ভালবাসাপূর্ণ ভক্তি লও।" আর একদিন লিখিয়াছ, "পিকু, আমার জন্য ভাবিও না। আমি ভাল আছি। এই দেশে থাকিয়াই পরলোক যে কিরূপ হইবে তাহার পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। মার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক: তবে আজ বিদায়।" ২৯শে আগষ্ট লিখিয়াছিলে, "স্কুলে আসিবার সময় তোমার মিষ্ট সত্যমাখা পত্রখানি পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর ও মন ভাল। স্মরণের বেড়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ঘন হইয়া আসিয়াছে। আমার দুর্ব্বলতার জন্য তুমি প্রার্থনা করিও। শেষ নিঃশ্বাস যেন মার নামে ফেলিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।" আর একদিন লিখিয়াছ, "আশীর্ব্বাদ কর, চিরকাল যেন তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া সঙ্গে চলিতে পারি। তোমার সহিত চলিতে চলিতে যদি এই লোক ছাড়িতে হয়, আমার স্বর্গ হইবে। ১০ বৎসর বয়সে যে ব্রত মা জননী অজানিত রূপে আমাকে দিয়াছিলেন, সে ব্রত যেন আমার উদ্‌যাপন হয়। পিকু, তুমি অবশ্যই জান, আমি আর কোন আশা রাখি না। একটী লোক আপনাকে হারাইয়া কেমন করিয়া অন্যের সহিত মার

নামে মিশিতে পারে, এই আমার কায। মা কবে সেদিন দেবেন! তাহারই জন্য এত বহন করা। যখন উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই, তখন শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন আর চলে না। আবার যিনি চিরদিন আশা দেন তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া আমি বল পাই। যাক, তুমি যে এত সুখে দিন কাটাইতেছ, শুনে বড়ই সুখ হইতেছে। তোমার সুখে আমার সুখ। মা বুঝি চান না যে তোমার শারীরিক সুখ হয়, তোমার সঙ্গে আমার শারীরিক সম্বন্ধ থাকে, তাই হয়তো এইরূপ ঘটনা করিতেছেন। একঘণ্টার পথে থাকিয়াও তুমি আমার শারীরিক কোন অবস্থা বুঝিতেছ না। মন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে, চিন্ময় যোগের জন্য। একটা কিছু না হইলে মন শান্ত হইতেছে না। কাল ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই প্রাণ কেমন করিতেছিল, কেন তা জানি না। পত্র পাইলে বুঝিলাম, ঐ সময় তুমিও আমাকে স্মরণ করিতেছিলে। অজানিত রূপে দুটী আত্মা দুটী আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাই ওরূপ হইতেছিল বুঝি।"

দেবি, আমার জন্য তোমার মুখাপেক্ষা চিরকালই ছিল, এখনও আছে। আমার সঙ্গে চলিবার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল ছিল। সত্য সত্যই আমার সঙ্গে চলিবার জন্য দৌড়িতে। প্রথম জীবনে অনেক কাল বৃথা গিয়াছে বলিয়া শেষ জীবনে এত দৌড়িতে হইত। ১০ বৎসরের সময় হইতে এই মিলন ব্রত লইয়াছিলে, একদিনও সে ব্রত ভঙ্গ কর নাই। আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। ক্ষণেকের জন্য উদ্দেশ্য ভুলিলে মিলন ভাঙ্গিত, আবার স্বর্গের সুধাপান করিয়া আপনার ব্রত রক্ষা করিতে। শরীরের যোগ পূর্ব্বেই কমিয়াছিল, এখন শান্ত মনে তাহার স্থানে আত্মার যোগ স্থাপন করিতে লাগিল।

২৪শে অক্টোবর লিখিয়াছ, "কাল তুমি গাড়ীতে কি বিষয় ভাবিলে, এবং ওখানে গিয়াই বা কি বিষয় ভাবিলে, শুনিতে ইচ্ছা

করি। আমি সমস্ত গাড়ী তোমার অনাসক্তির কথাই ভাবিলাম। বাটী আসিয়া শয়ন করিয়া ঐ কথা ভাবিলাম। যদি তোমার শরীর ছাড়িয়া এ দেশে থাকিতে হয়, কি ভাবে কিরূপে থাকিব তাই ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা গেলাম।”

৬ই নভেম্বর তোমার শরীর বড়ই ভাঙ্গিয়া পড়িল। তোমাকে লইয়া দানাপুরে আসিলাম। তার পরদিন মকস্থদপুরের গঙ্গাতীরের বাটীর বাগানে দুইজনা উপাসনা করিলাম। অবশ্যই তোমার মনে আছে। কেমন বিভূতি শূন্য উপাসনা। চক্ষের জলের সঙ্গে কেবলমাত্র স্বরূপগুলি উচ্চারণ করা। এ উপাসনা তোমারও খুব ভাল লাগিল। এমন উপাসনা কখনও শুন নাই। সন্ধ্যার সময় আবার তোমার সঙ্গে সদালাপ। ৮ই নভেম্বর জ্বর লইয়া আবার উপাসনায় গেলে। বিভূতিশূন্য উপাসনা হইয়াছিল, তুমিও খুব সুখী হইয়াছিলে।

সরোজিনীর খোকা তোমার কাছে পরলোক আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া গেলেন। তোমার দৈনিকে লেখা আছে, “আজ প্রিয় খোকার শেষ উপাসনা হইল। প্রার্থনা হইল, শিশু আমার গুরু হইয়াছেন। পরলোকের নিকট করিয়া দিয়া গেলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে স্থায়ী সম্বন্ধ হয় নাই তাহাও বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। আমি তাঁহার নিকট ঋণী হইলাম।” আর একদিন প্রার্থনা করিয়াছিলে, “খোকা যেমন সূর্য্য দেখিয়া এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন, আমার তো সেরূপ তোমাকে দেখে হয় না। সেইরূপ যাহাতে হয়, তাই কর।” সরোজিনীকে কলিকাতায় পাঠাইবার সময় প্রার্থনা করিলে, “মা তুমি সরোর ছেলে হ’য়ে কোলে উঠে যাও। চিন্ময় খোকাকে যেন আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই।”

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ঃ "আপন আলয় মুখে"

১৮৯৬ সালের মাঘোৎসবের জন্য কিরূপে প্রস্তুত হইতেছিলে, তাহা তোমার ২২শে জানুয়ারীর দৈনিক পড়িলে বুঝিতে পারা যায়। তুমি লিখিয়াছ, "ভাই বোনের নিকট পাপ স্বীকার না করিলে, তাঁহারা এক বৎসরের অপরাধ ক্ষমা না করিলে, উৎসবে মা দেখা দিবেন না। কিন্তু ছোট বড় সকলের নিকট পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বড় কঠিন, তাই বল ভিক্ষা করিলাম। উপাসনা হইতে উঠিয়া সকলকে পায় ধরিয়া ক্ষমা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল।" উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতেছ, এমন সময় সংবাদ পাইলে যে, কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ খগোলের ভাইবোনেরা উৎসবে আসিতে পারিবেন না। তুমি লিখিলে, "খগোল ছাড়িয়া উৎসব করিতে কি ক্লেশ, তুমি জান। যাহারা প্রতিবন্ধক তাহাদের অনুতাপ দেও।" ২৬শে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। স্থান—সমাজ মন্দিরের প্রাঙ্গণ। এবার হাতে পয়সা ছিল না, তাই সকালের উপাসনার পর তুমি ভিক্ষা করিলে। দুটী ছোট ছোট মেয়ে আর নিজে তুমি গৈরিক বস্ত্রে আবৃত হইয়া উৎসব-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া একটি প্রার্থনা করিলে। হৃদয়-স্পর্শী প্রার্থনা। অমন প্রার্থনা আর তোমার মুখে শুনিয়াছি কি না সন্দেহ। অমন রূপ ২।৩ বার দেখিয়াছি মাত্র। ভিক্ষুণী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সুতরাং তোমার সেই বেশ অতি সুন্দর মনে হইতে লাগিল। শরীরের রূপ তো বিশেষ কিছু ছিল না, স্বর্গের ভাব তোমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছিল। সেই ভাব তখন ফুটিয়া পড়িতেছিল, সুন্দর ব্রহ্মরূপে তুমি নিমগ্ন হইয়াছিলে। নারী যদি এই রূপ লইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, পৃথিবীতে আর পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। হাতে ভিক্ষার ঝুলিও সেইরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল। কেহ বা সিধা, কেহ বা পয়সা দান করিলেন। উপাসনার পর প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে আমাকে ডাকিয়া হাতে সোনার বালা দেখাইলে। যখন তুমি অলঙ্কার ও কেশত্যাগ

করিয়া সন্ন্যাসিনী হও, তার পর একদিন আমি বলিয়াছিলাম, "সকলই তো হইল, এখন আবার কেশ রাখ।" তুমি বলিয়াছিলে, "আর কেশ বড় করিতে পারিব না, বড় ভার বোধ হয়।" আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, "তবে অলঙ্কার পর।" তুমি তখন বলিয়াছিলে, "আচ্ছা, একদিন পরিব।" আজ উপযুক্ত সময়ে, ভিখারিণী বেশধারণের অব্যবহিত পরে তোমার সে অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে। ভিক্ষান্ন প্রস্তুত হইল, আনন্দে সকলে আহার করিলেন। তারপর তোমার শেষ আনন্দবাজার করিলে। দোকানগুলি বেশ চলিল। নিয়ম করিয়াছিলে যে প্রত্যেক বস্তুর মূল্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; পরস্পর কেনা-বেচা করিবে কিন্তু মূল্য চাহিতে পারিবে না। পান ও সরবৎ বেচিয়া অনেক লাভ হইয়াছিল, তাহা হইতে সব খরচ কুলাইয়া যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছিল তারও শোধ হইল। ২৭শে জানুয়ারী আত্মিক বিবাহের উৎসব। এই দিনে রাজগৃহে তোমার আর আমার আত্মার বিবাহ হইয়াছিল। বাৎসরিক ব্যাপার মনের মানুষদের সঙ্গে একত্রে করিবে, তাই খগোল গেলে। সমস্ত রাত্রি ভাল কথাবার্ত্তায় কাটিয়া গেল।

ইহার পর রাজগৃহ যাত্রা হইল। তুমি বলিলে, "যাত্রীর সুখের জন্য প্রাণ, মন, অর্থ সব যেন দিতে পারি, পশ্চাতে থাকিয়া।" রাজগৃহে গিয়া ত্নই প্রহরে বেড়াইতে যাইতে। রাত্রিতে একাকী ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান তোমার বড়ই ভাল লাগিল। পরে আমিও গিয়া স্নান করিলাম। যেন এই শেষ স্নান। সেই নির্ম্মল জল, পূর্ণিমার পর চতুর্থীর চন্দ্রের কিরণ বিশুদ্ধ জলে পড়িয়াছে; পাহাড় নীরব; এমন স্থানে মানুষের বাদ-বিসম্বাদ হইতে বিদায় লইয়া ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ হইয়া শীতকালের রাত্রে স্নান,—ইহা সম্ভোগের বিষয়। তাই তুমি লিখিয়াছিলে, "উপযুক্ত ভালবাসায় নির্জ্জন সম্ভোগ।" সেই জলেই তুমি প্রার্থনা করিলে, "যাঁহাদ্বারা তোমাকে পাইয়াছি, কিছু কিছু শিখিয়াছি, তাঁকে যেন ভক্তি করিতে পারি।" ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধেয়

অমৃত বাবু মহাশয় সকালের উপাসনা তোমাকেই করিতে বলিলেন। তুমি অপ্রস্তুত, তবুও হুকুম মাথা পাতিয়া লইলে। তুমি অধিকার পাইয়া আবার আমাদের সকলকে এক এক স্বরূপে আরাধনা করিতে বলিলে। আমরা তিন জন তিন স্বরূপে আরাধনা করিলাম, বাকি সকল স্বরূপ তুমিই করিলে। খুব ভাল হইল।

রাজগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ফেব্রুয়ারী মাসে আমার সঙ্গে একবার বিহটায় গিয়াছিলে। বিহটা হইতে শরীর ও মন ভাল করিয়া ফিরিলে। তোমার দৈনিকে লিখিয়াছ, "আজ বিহটা হইতে আসিলাম। দুইবার উপাসনা আজও হইয়াছে। খুব ভাল হইল। শ্বাশুড়ী পুত্রের কাছে অনেক দুঃখ করিলেন,—আমি তাঁর কিছু করিতে পারি না। তাঁহার ধর্ম্মও এক প্রতিবন্ধক। আমি পারি না বলিয়া স্বামীনের একটু ক্লেশ হয়।" তবু তুমি তাঁহার সকল আবদার সহ্য করিতে। অন্যত্র যাইতে চাহিলে তুমি বাধা দিতে, ও বলিতে, "হাজার হউক, আমাদের মত মায়ের আর কেহ করিতে পারিবে না।" তোমার অন্তর্ধানের পর তিনি এই কথাগুলি উল্লেখ করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ৩।৪বার উপাসনা হইল। আমার শরীরটা ভাল ছিল না, তুমি সামাজিক-উপাসনা গৃহেই করিলে। ২০ জন ছোট বড় মেয়ে যোগ দিলেন। খুব ভাল উপাসনা। রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া উপাসনা করিলে রোগীর বিশেষ সেবা করা হয়। এ সেবায় যেন কেহ বঞ্চিত না হয়।

এই সময়ে তোমাকে যেমন নিয়মিত গুরুতর শ্রম করিতে হইতেছিল, তেমনি মানসিক অনেক সংগ্রামও বহন করিতে হইতেছিল। সে কথা আগামী পরিচ্ছেদে বলিব। আমার মনে হয়, তোমার শরীর এ সময়ে এত অপটু হইয়া গিয়াছিল যে, এত শ্রম ও এত সংগ্রাম বহন তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত। অনন্তের সংগ্রাম সহিবার জন্যও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। বাহিরের কার্য্যভার বহনের জন্যও স্বাস্থ্যের

প্রয়োজন। তোমার স্বাস্থ্য ইহার পূর্ব্বেই ভিতরে ভিতরে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

মার্চ্চ মাসে বোল্টন সাহেব চীফ সেক্রেটারী হইয়া কলিকাতায় যাইতে ছিলেন। যাইবার পূর্ব্বে তোমার প্রিয় মেয়েদের বিদ্যালয় দেখিতে আসিলেন। এক ঘণ্টা ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী পরীক্ষা করিলেন। মিঃ ডি, এন্ মল্লিক ছিলেন, আমিও ছিলাম, এক কোণে তুমি ও তোমার অপূর্ব্ব গোয়ালিনীর সাড়ী পরিয়া দাঁড়াইয়াছিলে। সাহেব আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিলেন না; তোমার কাছে গিয়া বলিলেন, "বিদ্যালয় দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বিলাতে এবং ভারতবর্ষে এ সকল কায কুমারী কিংবা বিধবারাই করিয়া থাকেন। স্বামী পুত্র লইয়া এত কায হাতে লইয়াছেন এমন আর দেখিতে পাই না।" তুমি বলিলে, "মহারাণীর প্রতিনিধি হইয়া আপনি যে আমাদের এই সামান্য বিদ্যালয় পরীক্ষার জন্য এত সময় দিলেন ও সন্তুষ্ট হইলেন, ইহাতেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।" এই কথা বলিয়াই এক প্রণাম করিলে। সেই পাদরী সাহেবের শেক-হ্যাণ্ড করার পর হইতে সাবধান হইয়াছিলে বলিয়া দূর হইতেই প্রণাম করিলে; সাহেবও নমস্কার করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

৮ই মার্চ্চ মেয়েদের স্কুলের প্রাইজ হইল। সকলের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। যাঁহাদের চরিত্র খুব ভাল নয়, তাঁহারাও আসিয়াছিলেন, এই জন্য অনেকে চটিলেন। একটী বালিকা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেও অনেকের আপত্তি। তুমি কিন্তু ইহাতে দমিলে না। তুমি লিখিলে, "যতই বকুন কায কিন্তু ছাড়িব না, এই প্রতিজ্ঞা।" এই দুই ব্যাপারে তোমাকে যে পরিশ্রম করিতে হইল, তাহাতে শরীর আরও ভাঙ্গিয়া গেল।

৩১শে মার্চ্চের দৈনিকে লিখিয়াছ, "আজ স্কুল কমিটিতে কথা হইল, গবর্ণমেণ্টকে বলা হইবে স্কুল হাতে লইতে। আজ গাড়ীর খরচের জন্য গবর্ণমেণ্ট (special grant) ১৬৮৲ টাকা দিলেন।

স্কুল যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন লিষ্টে ৫টী মেয়ে। কেবল প্রার্থনা ভরসা ছিল। আজ সেই প্রার্থনার ফলে স্কুলে প্রায় ৪০টী মেয়ে। অপরিচিত বাবুরা আসিয়া কার্য্যভার লইয়াছেন; আমাদের অবসর দিতে চান; টাকা অনেক; এখন স্কুল ধনী। এ সকলই প্রার্থনার ফল। তাই বলি, মা আমায় আরও প্রার্থনাশীল কর, আরও বিশ্বাসী কর। এই ভিক্ষা চাই, পরিবারকেও বিশ্বাসী কর।"

৫ই এপ্রিল ১৮৯৬ আমাদের প্রিয় ব্রজগোপাল সংসার ত্যাগ ও প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিলেন। তোমার উপাসনা গৃহে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। তুমি ও আমি আশীর্ব্বাদ করিলাম।

২০শে এপ্রিল কথায় কথায় শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্রের বিবাহের কথা উঠিল। তুমি বলিলে, বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে যদি সুবোধ বিবাহ করিতে চাহেন তাহা হইলে বারণ করিবে। কি আশ্চর্য্য! কোথাও কিছু নাই, টাকার সঙ্গতি নাই, অথচ মনে মনে তুমি ঠিক করিয়াছ, সুবোধ বিলাত যাইবে। বিশ্বাসী লোক আস্‌মানেতে বানায় ঘর! দেবি, তোমার সে সাধও পূর্ণ হইয়াছে।

২৭শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেনের কন্যার কলেরা হইল। সকলে সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। তুমিও সেবা করিতে লাগিলে। একদিকে উমাচরণ বাবুর কন্যার পীড়া, অন্যদিকে ভাই বিহারীলাল ঘোষের কন্যা হেমের সহিত মিঃ ডি, এন মল্লিকের বিবাহ স্থির হইল। এ কন্যার বিবাহের ভার তুমিই গ্রহণ করিয়াছিলে। ১৫ই মে কন্যার আইবুড়ভাত ও বর ও কন্যার দীক্ষা সম্পন্ন হইল। তা'র পরদিন বিবাহ। সেদিন সন্ধ্যার সময় ময়রা আসিয়া বলিল, তাহার পীড়া হইয়াছে, সে লুচি প্রস্তুত করিতে পারিবে না। তখন অন্য বন্দোবস্ত করার আর সময় নাই। আমার চির দিনের মন্ত্রীর কাছে মন্ত্রণা চাহিলাম। মন্ত্রী বলিলেন, "ভাবিও না, আমরাই করিব।" উপস্থিত মেয়েদের সাধ্য সাধনা করিলে; কিন্তু বিবাহ সভা ত্যাগ করিয়া কে লুচি ভাজিতে আগুনের নিকট দুই

ঘণ্টা বসিয়া থাকে ? অবশেষে কি করিবে, ভৃত্যকে উনুন প্রস্তুত করিতে বলিলে, এবং নিজেই ভাজিতে আরম্ভ করিলে। দুই শত লোকের জন্য লুচি প্রস্তুত করা সহজ নয়, কিন্তু তোমার উৎসাহ অদম্য। বিবাহ শেষ হইতে না হইতে লুচি প্রস্তুত হইল, কেহ জানিতেও পারিল না কেমনে কোথা হইতে অথবা কে প্রস্তুত করিল।

রেজিষ্ট্রেশন শেষ হইতে না হইতে একটু কষ্টের ব্যাপার ঘটিল। সে বিষয় তোমার দৈনিক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ডাক্তার বাবুর বাটীতে আজ (১৬ই মে) হেমের বিবাহ। মেয়েদের আমোদের জন্য সাহেব জামাতার হাতে সিন্দুর দিয়া কন্যাকে পরাতে যাওয়া হয়। শ্রদ্ধেয়—বাবু—বাবুর উত্তেজনায় অধীর হইয়া নারীদের অপমানসূচক ধমক দিয়া জামাতাকে বাহিরে লইয়া যান। বলেন, সিন্দুর পরান কুসংস্কার। আমার শান্তিভঙ্গ হইল। আমি রাগ করিলাম, কারণ আমার জীবনে নারীকে নিজস্থানে স্থান দিবার জন্য প্রাণপণ। বলিলাম, আপনারা আমার সিন্দুরের মত অনেক কুসংস্কার করিলেন। এই ঘটনায় বুঝিলাম, এখনও নারীর স্থানের অনেক দেরী। এই বিষয়—বাবুকে বলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু মন গরম ছিল বলিয়া স্বামীন বারণ করিলেন ; আর বলা হইল না।" সে দিনকার কথা আজিও আমার মনে জাগিতেছে। যখন সভায় সকল কথা বলিবে বলিয়া আমার অনুমতি চাহিলে, তখন তোমার মুখ লাল এবং উত্তেজিত। যদি তুমি সভায় কিছু বলিতে তাহা হইলে তার ফল ভাল হইত না। তাই আমি বলিলাম, 'গোলা খা ডালো', আর তুমি সেই তপ্তগোলা হজম করিয়া ফেলিলে। তখনি কথা উঠিল বৌ-ভাত কবে হইবে। বিবাহের পরদিনই বৌ-ভাত হইলে উপর্যুপরি পরিশ্রমে তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে, আমি তাই আপত্তি করিলাম। তুমি বলিলে, বিলম্ব করিলে মল্লিক সাহেবের অনেক খরচ বাড়িবে। পরদিনেই করা উচিত। আপনাকে হারাইয়া পরের

মঙ্গলে জীবন দেওয়া তোমার পক্ষে সহজ হইয়া গিয়াছিল। তোমারই জয় হইল, স্থির হইল পরদিন বৌ-ভাত হইবে।

বিবাহ রাত্রির সকল ব্যাপারের বর্ণনা এখনও ফুরায় নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আহারের পর তুমি জানিতে পারিলে যে, উমাচরণ বাবু কিংবা তাঁহার স্ত্রী বিবাহে আসেন নাই। তৎক্ষণাৎ থালায় খাবার সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলে। কিন্তু গাড়ী পাঠান হয় নাই বলিয়া তিনি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং খাদ্যাদি ফেরত পাঠাইলেন ও পত্র লিখিলেন, যতক্ষণ এ অপমানের পূর্ণ কৈফিয়ত না পান, বিবাহের সামগ্রী লইবেন না। কোন বাটীতে গাড়ী পাঠান হয় নাই, সুতরাং এ বিষয়ে তোমার কোন অপরাধ ছিল না। যাহা হউক, রাত্রি ১১টার সময় তোমাকে লইয়া হাঁটিয়া নিজ বাটীতে চলিলাম। পথিমধ্যে উমাচরণ বাবুর বাটী; তখনও তাঁহারা শয়ন করেন নাই। দেখিবামাত্র তুমি বলিয়া উঠিলে, "দাঁড়াও, আমি একটা মজা করিয়া আসি।" এই বলিয়াই আর অপেক্ষা না করিয়া উমাচরণ বাবুর গৃহে প্রবেশ করিলে। অপমানের কোনও কথা উল্লেখ করিলে না। পীড়িত কন্যার জন্য রাত্রি জাগরণের কি ব্যবস্থা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে। তিনি বলিলেন, "আজ তো আর কোনও বন্দোবস্ত নাই, খোকার মাতা ও আমি রাত্রি জাগরণ করিব। যাঁরা অন্যদিন রাত্রি জাগরণের জন্য আসিতেন, তাঁরা আজ সকলেই বিবাহে গিয়াছেন। যদি দু'ঘণ্টার জন্য কেহ থাকিতেন, তাহা হইলে সহজ হইত।" তুমি—"আমাকে বিশ্বাস করিয়া দুঘণ্টা সেবা করিতে দিন।" তিনি—"আপনাকে পাইলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।" তুমি বলিলে, "খোকার মাকে শয়ন করিতে বলুন, কন্যার নিকট আমি জাগিতেছি।" বাহিরে আসিয়া আমাকে গৃহে যাইতে বলিলে। তুমি ধূলা পায়েই রোগীর শয্যাপার্শ্বে সেবা করিতে বসিলে। সারাদিনের এত পরিশ্রমের পরও সে রাত্রিতে দুইটার পূর্ব্বে বাটী গিয়া শয়ন করিতে পারিলে না।

১৭ই মে বৌ-ভাত হইল। তোমার দৈনিকে লেখা আছে, "আজ হেমের বাটীতে সকলের নিমন্ত্রণ। আমি, হেম, জামাতা, প্রকাশ এক গাড়ীতে যাইতেছিলাম। জামাতা গত রজনীর কথা তুলিয়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আমার ভুল হইয়াছে। আগে সকল তত্ত্ব জানিলে আমি সিন্দুর দিতাম। আজ দিব।" আমি বলিলাম, "আর দিতে হইবে না; কারণ কাল মেয়েদের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য বলিয়াছিলাম। আমি নিজে প্রায় ৩০ বৎসর সিন্দুর ছাড়িয়া দিয়াছি, বিধবা সাজিয়া থাকি। এ অবস্থায় যখন আমাকে কুসংস্কারাপন্ন মনে করা হইল, তখন আমি আর সে বিষয়ে আলোচনা করিব না। কিন্তু নারীর অপমানের জন্য এখনও আমার মন অপমানিত। যদি একজন ইউরোপীয়ান নারী হইতেন তবে কখনও এ ব্যবহার হইত না। যাক্।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে মল্লিক সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলে। মেয়েরা পূর্ব্বেই গিয়াছিলেন। কথা ছিল, ৯টায় উপাসনা আরম্ভ হইবে ও ১১টায় আহার হইবে। বাবুরা সন্দেহ করিতেছিলেন যে ইহা হইয়া উঠিবে কি না। তুমি কিন্তু নির্ভয়। ৮টা উনুন জ্বালিলে একেবারে ৮ স্থানে রান্না আরম্ভ হইল। সকাল ৭টা হইতে ৯টার মধ্যে সমুদয় রান্না প্রস্তুত করিয়া উপাসনা বসিবামাত্র তুমি যোগ দিলে। ১১টার কিঞ্চিৎ পরেই গরম পোলাও সকলের পাতে পড়িল। ধরাধামে তোমার এই শেষ রন্ধন, এই শেষ বৌ-ভাত খাওয়ান হইয়া গেল।

এই পরিশ্রমের পর তোমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তোমাকে লইয়া খগোল যাত্রা করিলাম। সেখানে কেবল উপাসনা ও ভাল কথা হইবে, বিশুদ্ধ বায়ুতে তোমার শরীর সুস্থ হইবে, এই আশা। Canal-এর ধারে একটি বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতে লাগিলে। সকালে সন্ধ্যায় বেড়ান হইত, যখন অবকাশ হইত ভাল কথা বলিতে। ২১ ও ২২মে ষষ্ঠীবাবুর ও খেলাত বাবুর বাটীতে উপাসনা করিয়া ২৩শে বাঁকিপুর ফিরিলে। ২৪শে মে বাঁকিপুরে

ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক হইল। ২৫শে মে মোকামার ভাই বোনেদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে। আর দেহে খগোল ও মোকামায় যাওয়া হইল না। এবারকার সাক্ষাৎ কিছু ব্যস্তভাবের পরিচয় দিয়াছিল। যখন কেহ অনেক দূরদেশে যাত্রার উদ্যোগ করে, তখনকার দেখা সাক্ষাৎ ব্যস্ততারই পরিচয় দেয়।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যুচ্ছায়াময় উপত্যকা

খোকা যেন তোমার জীবনের উপর পরলোকের ছায়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিল। ১৮৯৬ সালের যে কয়েক মাস তুমি দেহে ছিলে, দেহের সহিত সংগ্রাম কিরূপে করিয়াছিলে, তাহা এই পরিচ্ছেদে বলিতেছি। শরীর তোমাকে মুক্তি দিবার পূর্ব্বে আর একবার যেন শেষ দেখা দিয়া গেল; আর একবার তোমার দৃষ্টির সম্মুখে নিবিড় অন্ধকার রচনা করিল।

১৫ই জানুয়ারী আমার সঙ্গে তুমি নাসরীগঞ্জে গিয়াছিলে। সে সময়ে দেখিয়াছিলাম, একত্র অবস্থান সত্ত্বেও শরীরের অধিকার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আমার দৈনিকে লিখিয়াছিলাম, "আজি বাগানে উপাসনা খুব ভাল হইল। নির্ব্বাণ এখনও লাভ হয় নাই। শরীরের অভাব এখনও আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরের ভোগের জন্য এখনও মন ব্যাকুল হয়। কেন তাহা হইবে? "রী" নামে অঘোরকে ডাকিলাম, বড় মিষ্ট লাগিল। পবিত্র ভাব রক্ষা বিষয়ে 'রী' সাহায্য করিলেন।" ১৯শে ফেব্রুয়ারী তুমি আমার সঙ্গে ফতুহা গেলে। সে-দিনকার দৈনিকে এইরূপ লিখিয়াছিলে—"আজও ২ বার উপাসনা চলিতেছে। প্রার্থনা, আরও দর্শন উজ্জ্বল কর। তোমার সন্তানকে দেখি, তোমাকে আরও ভাল করিয়া দেখি, এই সংসারেই তুমি দেখা দেও।" ঐ দিন সন্ধ্যার সময় তোমাকে লইয়া বেড়াইতে গেলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক কথা হইল। অনেক সময়

নির্জ্জন পাইলে এইরূপ বেড়াইতে ভালবাসিতে ও অনেক কথা বলিতে ও শুনিতে। তোমার কোন দোষ থাকিলে তাহাও তখন বলিতাম। তাই দৈনিকে লিখিয়াছ, "শরীরে এখনও মায়া আছে। এ দোষ গেলে স্বামীন্ সুখী হন।"

ইহার পর ২৫শে ফেব্রুয়ারী আমি এই ব্রত লইয়াছিলাম যে কোনও কারণেই তোমার শরীর স্পর্শ করিব না। তাহাতেও যদি ভালবাসা থাকে তবেই বুঝিব যে স্থায়ী ভালবাসা হইয়াছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে তোমার শরীর এমন ভগ্ন হইয়াছে যে এখন এ ব্রত রক্ষা করা কঠিন হইবে! ২৬শে ফেব্রুয়ারী তোমার পেটে একটা ব্যথা হইল। সে দিনের বিষয় তোমার দৈনিকে লিখিয়াছ, "আজ পেটে বড় বেদনা উঠিয়াছিল। স্বামীন সন্তানদের ডাকিয়া সাহায্য করিতে বলিলেন, তাহা নিলাম না। কারণ সংসারে সুখে দুঃখে একজনের সাহায্যই নেব বলেছিলাম। তাই যদি ভগবান মানা করিলেন তবে তিনি ছাড়া আর কাহারও সাহায্য নেব না। ১১টা পর্য্যন্ত যন্ত্রণার পর নিদ্রা আসিল। মায়ায় পড়িবার ভয়ে স্বামীন্ জিজ্ঞাসা করিলেন না।" কেহ যদি আমার দৈনিক পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন, সচেতন হইয়াও সে রাত্রিতে আমি অচেতন পাথরের মত পড়িয়াছিলাম। যে ব্রত লইয়াছিলাম, যদি তোমার সেবা ও আদর করিতাম, তাহা হইলে সে ব্রত ভাঙ্গিয়া যাইত। স্পর্শ করিব না অথচ নিকটে থাকিব, আমার কপালে সেই সাধন পড়িয়াছিল। তুমিও ক্ষুণ্ণ হইলে, আমিও নিরাশ্রয়ের মত চারিদিকে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সন্তানদের সাহায্য ভিন্ন সে-দিন অন্য উপায় ছিল না। তোমার মুখ মলিন হইতে লাগিল, তাই ২৯শে এই ব্রত ত্যাগ করিতে হইল। তোমার নিজের কথাও নিজে লিখিয়া গিয়াছ। "২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬। মা, আরও ভাল করিয়া আপনার দোষগুলি দেখাও। দোষ না গেলে তো আমি কাহারও পুণ্যের জন্য সহায় হইতে পারিব না।

অন্যের পুণ্যের জন্য বিশেষ স্বামীনের পুণ্যের জন্য আমাকে শুদ্ধ কর। সমস্তদিন মন উদাস। আজও মন উদাস। স্বামীনের সহিত এক হইতে পারিতেছি না, কেন এমন হইল? কোন খারাপ ভাব নাই কিন্তু মন যেন ভারাক্রান্ত। নির্জ্জন ভাল লাগিতেছে। প্রার্থনা ছিল, যাঁহার জন্য আমি সব ছাড়িলাম, ৩০ বৎসর পরে তাঁহার আত্মার জন্য অবশিষ্ট কিছু আরাম ছাড়িতে পারিব না? আমার জীবন কি করিতে? তুমি আশীর্ব্বাদ কর, শেষ কয়েকটা দিন যেন স্বামীনের আত্মার সেবা করিতে পারি।"

এইরূপে কিছুকাল হইতে তোমার জীর্ণ ভগ্ন দেহ আত্মাকে ক্লেশ দিতে ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দীর্ঘ চারি বৎসরের গুরুতর শ্রমে ও মানসিক সংগ্রামে তোমার স্বাস্থ্য চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিবাহের পরিশ্রমের পর শরীর আরও অপটু হইয়া পড়িল। আর যেন আত্মার সহিত চলিতে সমর্থ হইত না। অবশেষে সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা ঘন অন্ধকারের দিন আসিল।

২৭শে মে ১৮৯৬ প্রত্যূষে তুমি, আমি, সুবোধ একত্রে উপাসনা করিয়া আমি বিহার যাত্রা করিলাম। আমার মনে হইল যেন তোমার উপাসনা ভাল হইল না। কিন্তু আর কিছু বুঝিতে পারি নাই। তুমি বিধানের একখানা পুরাতন খাতায় তোমার মনের ভাব লিখিয়াছিলে; কোনও তারিখ নাই, কিন্তু মনে হয় ২৭ মে তারিখেরই লেখা। "আজ সকালে স্বামীনের সহিত প্রসঙ্গ হইতে হইতে বুঝিলাম, তিনি পূর্ণমাত্রায় শরীর অতিক্রম করিয়াছেন কিন্তু আমার এখনও বার আনা শরীরে আসক্তি আছে। আমি এতদিন ভাবিতাম উভয়েরই শরীরে অল্পাধিক আসক্তি আছে। সে ভ্রম আজ ঘুচিল। একটু পরে তিনি অন্যস্থানে গমন করিলেন; তাহাতেও তাঁহার অনাসক্তি ও আমার আসক্তির পরিচয় পাইলাম। শয়ন করিয়া প্রার্থনা করিলাম। কি জানি মনের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। যত মনে হইতে লাগিল, আমার শরীরে আর পৃথিবীতে কাহারও কাজ নাই, একে আর কেহ

চাহে না, মনে মনে যেন ঝড় বহিতে লাগিল, তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। যাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের জানিতাম তিনিও এ যুদ্ধ দেখিতে পান না। মা মনকে যে কি দিয়ে গঠন করিয়াছেন কি জানি? অবশ্যই নিজ শক্তি দিয়া, নইলে মন এত সয় কিরূপে? মন কত সয় তাহা বলিতে পারি না। পৃথিবীর কোন বস্তু দিয়া যদি গড়ান হইত তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইত। আজ আমার জীবনের একটা বিশেষ প্রাতঃকাল, আজ অনেক দিনের পাপ পূর্ণরূপে বুঝিলাম।”

দেবি, চিরজীবন আমার পার্শ্বে থাকিয়া বীরনারীর মত মায়ের আহ্বান শুনিয়া চলিয়াছিলে। এ সংগ্রামে কত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছ, কেমনে দেহের শোণিত শুষ্ক করিয়া, সুখ ও আরাম বলিদান দিয়া, বিশ্বাসের সেবায় ও চিন্ময় যোগের পতাকা ধরিয়া রহিয়াছ, চিরজীবন পাশে পাশে থাকিয়া আমি তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু দেহের সহিত এই শেষ সংগ্রাম তোমাকে একাকী করিতে হইল! এ ঘন আঁধারে আমাকেও নিকটে দেখিতে পাইলে না। সকল বিশ্বাসীর জীবনেই মায়ের লীলা এইরূপ। এই ঘোর যাতনা, এই ঘন অন্ধকার, ইহাই বুঝি মৃত্যুর ছায়াময় উপত্যকা (Valley of the Shadow of Death), যার কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। এ অন্ধকার অতিক্রম করিয়া তবে আনন্দধামে বিশ্রামনগরীতে প্রবেশ করিতে হয়। দেবনন্দন শ্রীঈশাকেও শেষ সময়ে একাকী এ আঁধারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। তখন কেহই সঙ্গে ছিল না; একাকী পিতার চরণে মৃত্যুযাতনার অশ্রু ফেলিতে হইতেছিল।

তুমি দৈনিকে আরও লিখিয়াছ, “মনে হইতেছে, আমার এখানকার কায শেষ হইয়াছে। আজকার প্রার্থনা ছিল, আর এদেশের কিছু ভাল লাগিতেছে না। ঐ দেশে যাইতে হইবে, ঐখানকার জন্য মন ব্যস্ত হইয়াছে, ঐ দেশের আচার ব্যবহার, ঐ দেশের সকল আজ হইতে আমাকে শেখাও। এ দেশের মায়া কাট, ঐ দেশের মায়া বাড়াও, এই ভিক্ষা পূর্ণ কর।”

২৯শে মে আমি বিহার হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, তোমার জ্বর হইয়াছে। ৩০শে জ্বর বেশ ফুটিল, সেদিন হইতেই শয্যাগত হইলে। ঐ তারিখে তোমার শেষ লেখা তুমি লিখিলে, "আজ বাটীতে উপাসনা, খাঁটি বিশ্বাসী কর। কাল রাত্রিতে জ্বর হইয়াছে। আমার মন শুষ্ক কেন? এ প্রশ্ন সদাই আসিতেছে।"

এ শুষ্কতাও ঐ অন্ধকারের শেষ অংশ। প্রতিদিন আলোকের জন্য, বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলে। প্রতিদিন উপাসনায় যোগ দিতে। যতই বুঝিতে লাগিলে, মার কাছে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী, ততই মার কোলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলে। মা-ও কোল পাতিয়া হাসিমুখে তোমাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ঃ আনন্দধাম

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ২৭শে মে আমি বিহারে যাই, ও ২৯শে ফিরিয়া আসিয়া দেখি তোমার একটু জ্বর হইয়াছে। আসিবার পরেই ছোট উপাসনা হইল। ছোট হইল বটে, কিন্তু তোমার মিষ্ট লাগিল। দিনের বেলায় বিশ্রাম করিলে, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর স্থির থাকিতে পারিলে না। সেবাই তোমার নিকট বিশ্রাম বোধ হইত। সন্ধ্যার পর করুণার মাতার সঙ্গে দেখা করিলে। শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্রের মেয়ে পীড়িত, তাহাকে দেখিয়া আসিলে। অসুস্থ শরীরেও আপনার নিত্য কর্ম্ম করিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলে। রাত্রে বেশ জ্বর ফুটিল। ৩০শে মে প্রাতঃকালে জ্বর গায়ে নীচের ঘরে উপাসনা করিতে গেলে। খাঁটি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিলে। সেই দিন বুঝিলাম তোমার মহাপ্রয়াণ অত্যন্ত নিকটে। আমি প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। তুমি আমি বোম্বাই বেড়াইতে যাইব, স্থির ছিল; পাথেয় সংগ্রহ হইয়াছিল; বোম্বাই সহরে একটি ছোট বাড়ীও ঠিক হইয়াছিল, ছুটিও পাইয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার বিধান ভিন্ন প্রকার।

১লা জুন তোমার বড় ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। ঐ ঘোড়া বিদ্যালয়ের জন্য ক্রয় করিয়াছিলে। নিজের অর্থে ঘোড়া কিনিয়া তিন বৎসর ধরিয়া স্কুলের গাড়ী চালাইলে। তোমার রোগ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমার বাহিরে কাযে যাওয়া হইল না। ২রা জুন রাত্রিতে একাকী সেবা করিলাম। আমারও শরীর অপটু; দুইবার পড়িয়া গেলাম। মোকামা হইতে কন্যা সুসারকে আনান হইল।

৩রা জুন দুই প্রহরে তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রথমে পায়ের আঙ্গুলে বাতের ব্যথার মত ব্যথা হইয়াছিল। তারপর ঐ ব্যথা বুক পর্য্যন্ত আসিয়া শ্বাস বন্ধ হইতে আরম্ভ হইল। সকলে বলিতে লাগিল Endocarditis হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডের নিম্নাংশ নাকি ফুলিয়াছিল। নিঃশ্বাস ফেলিতে মাঝে মাঝে এত কষ্ট বোধ হইতেছিল, যে প্রত্যেক আক্রমণে আমাদের মনে হইতেছিল বুঝি এইবার প্রাণ যায়। দুই প্রহরের পর একবার প্রবল প্রকোপ হওয়াতে তুমিও মনে করিলে, এই শেষ। দেহত্যাগে পাছে কাহারও ক্ষতি হয়, এই ভয়ে সেই কষ্টের সময়ও আমার পানে তাকাইয়া বলিলে, "নসরূর হিসাবে গোল, আর কোথাও গোল নাই,—বস্।" সংসারের হিসাবপত্রের বিষয়ে এই শেষ কথা বলিলে। পরে যখন উহাঁদের বিল আসিল হিসাব পরিষ্কার করিতে গিয়া বুঝিলাম, তোমার কথাই ঠিক। বিলের হিসাব কাটিতে হইল। "বস্" কথাটীর কত অর্থ! পৃথিবীর দেনা পাওনা ফুরাইল। আর টাকা কড়ির হিসাব রাখিতে হইবে না; এই শেষ হইল।

প্রথম হইতেই বন্ধুরা সাহায্য করিতে লাগিলেন, রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয় প্রধান ভার লইলেন। সেই বিবাহের রাত্রিতে তোমার ব্যবহার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। দুজনা পুরুষ ও একজনা নারী দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর ধনীরাও এত যত্ন পান কি না সন্দেহ। পীড়ার সময় কত লীলা হইল, তাহা বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছিল।

উমাচরণ বাবুর সঙ্গে তোমার বিশেষ সম্বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার লেখাগুলি পীড়ার ইতিহাসের একটী বিশেষ অঙ্গ। নিঃশ্বাস বন্ধ হইলে তোমাকে ধরিয়া উঠাইতে হইতেছিল। পরিচারিকাগণ একবার কার্য্যান্তরে অন্য ঘরে গিয়াছেন, এমন সময় নিঃশ্বাস বন্ধের ফিট্ উপস্থিত। তুমি "উঠাও, উঠাও," বলিতে লাগিলে। তুমি নারী, উমাচরণ বাবু একমাত্র পুরুষ গৃহে। কিরূপে ধরিয়া উঠাইবেন, ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তুমি তখনই তাঁহার সঙ্কট বুঝিতে পারিলে, এবং বলিলে, "এইরূপে কি সেবা করিবেন? আপনি যে আমার বাবা।" যেমন বলা, অমনি তিনি ধরিয়া উঠাইলেন। কি আশ্চর্য্য! এমন যন্ত্রণার সময়ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গেল না। যা বলিলে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহাই বলিলে।

৫ই জুন রোগ পরীক্ষার জন্য ডাক্তার সূর্য্য বাবুকে ডাকা হইল। তিনি বলিলেন, "রিউম্যাটিজম্ অব দি হার্ট"। কাহার চিকিৎসা হইবে এ কথা উঠিলে তুমি পরেশের উপর ভার দিলে; আমিও তোমার মতে মত দিলাম। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করিতে লাগিলেন। তুমি দৃঢ়ভাবে বলিলে, "যদি বাঁচিতে হয় দাদার হাতে বাঁচিব, যদি মরিতে হয় দাদার হাতে মরিব।" চিকিৎসকের হাতে কিরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক স্থির করিয়াছিলে। যখন একবার স্থির হইল, যখন একবার "ডাক্তার ভাই" বলিয়া স্বীকার করিলে, বিশ্বাসীর মত শেষ পর্য্যন্ত অটল রহিলে। একবারও চিকিৎসার প্রণালী কিংবা ঔষধ অস্বীকার কর নাই। ধর্ম্মনিষ্ঠ চিকিৎসক যখন ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন তখন তাহার অপূর্ব্ব শ্রী হয়। তুমি পরেশের মধ্যে এই ধর্ম্মভাবের অবতারণা বুঝিতে পারিতে, তাই তাঁহার প্রতি এত অচলা ভক্তি। সুতরাং তাঁহারই চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

জুন মাসের গরম, তার উপর আমাদের বাড়ীর উপরের একহারা

ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ দিকে তোমার হৃদ্‌রোগ, কাযেই তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইতে লাগিল। পরেশ তোমাকে তাঁহার বাঙ্গলায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। এই প্রস্তাবে তোমার সম্মতি হইল না। আপনার বাটীর স্মৃতি তোমার ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে জড়িত, সহসা সে স্থান ছাড়িতে চাহিলে না। যদি মরিতে হয় তাহা হইলে আপনার গৃহে দেহ ত্যাগ করাই ভাল, এই তোমার মনের ভাব।

তোমার আসন্ন তিরোভাব তুমি বুঝিতে পারিতেছিলে, নহিলে ৭ই জুন রাত্রি দুই প্রহরে কেন বলিলে, "সব গোপন কচ্চেন, আমি কিন্তু ভাল নাই।" সহরের লোকেরা তোমার পীড়ার কথা জানিলেন। ৯ই জুন গুরুপ্রসাদ বাবু ও লোকনাথ বাবু তোমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ১০ই জুন রোগ খুব বাড়িল। পরেশ সমস্ত রাত্রি জাগিলেন। রোগের লক্ষণ দেখিয়া তিনি গৃহান্তরে বসিয়া বলিতেছিলেন, "যদি এবার উদ্ধার হন, অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিতে হইবে।" তোমার কাণে একটু আওয়াজ গিয়াছিল; তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, "দাদা কি বলিতেছেন?" অগত্যা আমি বলিলাম। শুনিয়া তুমি বলিলে, "তবে বাঁচিয়া থাকার আবশ্যক কি?" তোমার চক্ষে জীবন ও সেবা এক হইয়াছিল। পঙ্গু হইয়া থাকা তোমার পক্ষে অসম্ভব মনে হইত।

১১ই জুনের ভোরবেলা পরেশ তোমার কষ্ট দেখিয়া আবার তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরাগে এইবার তুমি পরাস্ত হইলে। যখন যাইতেই হইবে তখন অসার গৃহানুরাগ রাখিয়া ফল কি? তুমি স্বীকার করিলে। তোমার সম্মতি পাইবামাত্র আমি গৃহান্তরে পরেশকে বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় তুমি আমাকে ডাকিয়া বলিলে, "রোস, রোস, তোমার মত কি? এমন যন্ত্রণার সময়ও আমার মত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিলে না। অতি প্রত্যুষে পাল্‌কী করিয়া তোমাকে পরেশের বাটীতে লইয়া গেলাম

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মল্লিক ছিলেন, অন্যান্য বন্ধুরাও ছিলেন। গুরুপ্রসাদ বাবু তাঁহার বাটীও দিতে চাহিয়াছিলেন। পরেশের বাড়ীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পশ্চিমের ঘরে তোমার স্থান হইল। নূতন নূতন সেবক উপস্থিত হইতে লাগিলেন ; তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার নিজ বাটীতে সেবকদিগের আহার হইত, আর তাঁহারা পালা করিয়া দিবানিশি তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন।

১১ই সমস্ত দিন ভালই গেল। রোগের কষ্ট ছিল না। ছটফটানি, বুকের ব্যথা, পিটের ব্যথা কিছুই ছিল না। এত নিদ্রা হইল যে সেবকদিগের অধিক ক্লেশ হইল না। আমিও নিদ্রা যাইতে পারিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে হাতমুখ ধুইয়া তোমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া উপাসনা করিলাম। অল্পক্ষণস্থায়ী উপাসনা ; যাহাতে তোমার কষ্ট না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিল, তুমিও শান্ত ছিলে। ১২ই জুনও তুমি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলে। রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল, জ্বর ১০২ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, শেষ রাত্রে ছটফট করিয়াছিলে। অপরাহ্নে বন্ধু ডাক্তার নৃত্যগোপাল বাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, রোগীর অবস্থা মন্দ নয়।

১৩ই জুন প্রাতে তোমার শয্যার পার্শ্বে উপাসনা করিলাম, তুমি আবার বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করিলে। সন্ধ্যার সময় শ্রীমান সুন্দর সিং সেবার্থী হইয়া তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন ; তুমি আমাকে ডাকিলে ও বলিলে, "যদি তাঁহাকে সেবা করিতে না দেও, তাঁহার ক্লেশ হইবে। একটা কিছু কর।" তোমার রোগের ক্লেশ ভুলিয়া গেলে ; সুন্দর সিংহের ক্লেশ না হয় এই চিন্তা প্রবল হইল। শুশ্রূষার জন্য আর অধিক লোকের প্রয়োজন ছিল না, তাই তাঁহাকে বেদানা আনিতে মিঠাপুর পাঠাইলাম। শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্রের সন্তানের জ্বর ছাড়িতেছে না ; আমাকে ডাকিয়া বলিলে, "আমাদের উপরের ঘর তাহাকে ছাড়িয়া দাও।" ইহার পূর্ব্বেই তাঁহারা আমাদের উপরের ঘরে আসিয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলে। যেন হৃদয় হইতে

একটা মহা বোঝা নামিয়া গেল। শেষরাত্রে তোমার রোগ বৃদ্ধি পাইল। আমার পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইতে লাগিল। কত চক্ষের জল পড়িল!

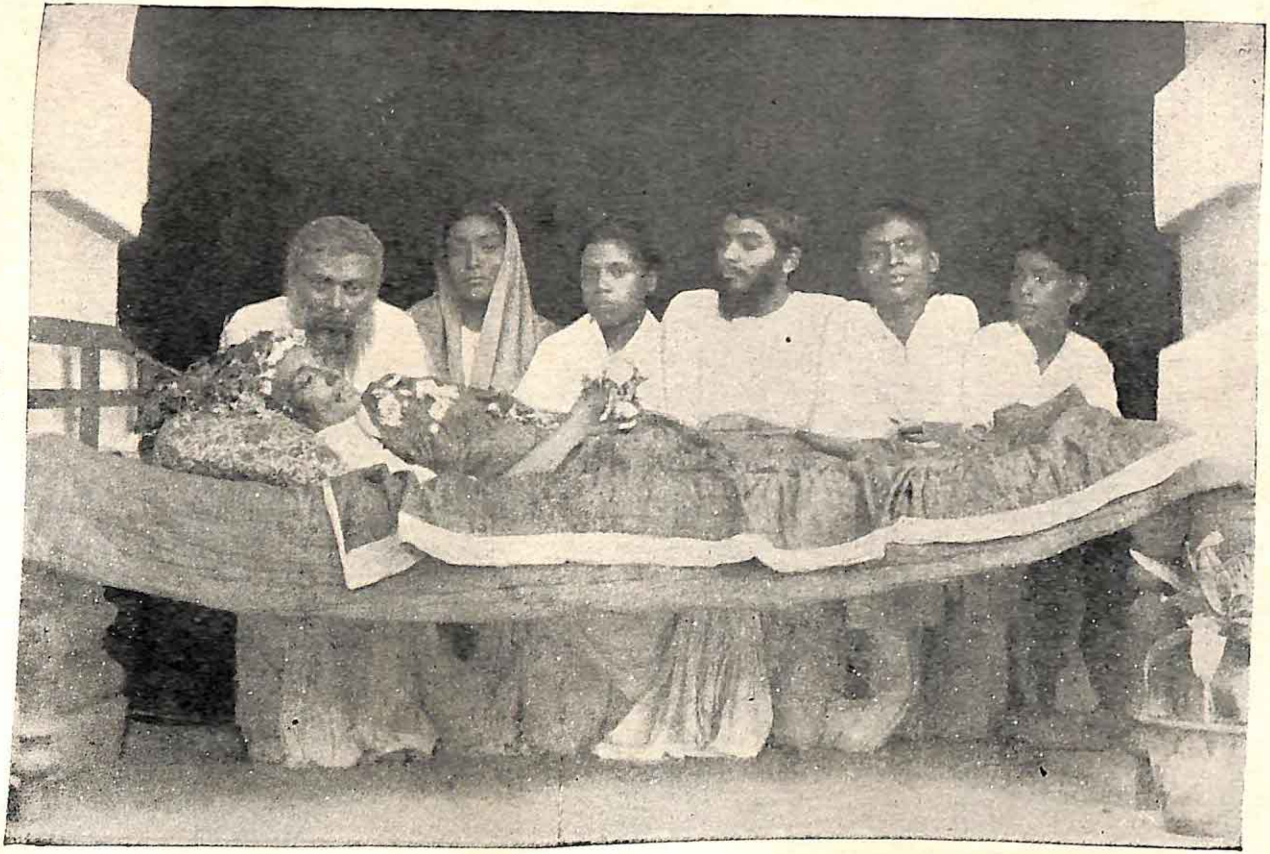
১৩ জুন রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটের সময় তুমি বলিলে, "মায়ের কাছে যাব, আর দেরী করতে পারছি না। সুবোধ, অসত্য পথে যেও না। তোমাদের জন্য কিছু রেখে গেলাম না; এই সত্য নিও। আমার জন্য কেঁদ না। দেখ আমি কাঁদছি না। সেদিন চোখে জল এসেছিল বলে এ কয়দিন দেরী হ'ল।"

১৪ই রবিবার আবার উপাসনায় যোগ দিলে, কিন্তু আজ যন্ত্রণা তোমায় শান্ত থাকিতে দিল না। প্রার্থনা যেমন তেমনিই করিলে। যতই তোমার কষ্ট বাড়িতে লাগিল, ততই যেন আমার কাঁটার মুকুট বড় বড় কাঁটাযুক্ত হইয়া বিদ্ধ হইতে লাগিল; যেন আর সহ্য করা যায় না। রবিবারে সমাজের উপাসনা করিতে যাইতে হইবে; তোমার নিকট অনুমতি চাহিলাম, তুমি বিদায় দিলে, আর বলিলে, "অবশ্যই যাইবে।" শুধু আমাকে নয়, মোকামার দিদিকেও সমাজে যাইতে বলিলে। বলিলে, "যদি আপনি সমাজে না যান তাহা হইলে আপনার হাতে ঔষধ খাইব না।"

১৫ই জুন তোমার যাত্রার দিন। ঐ দিনের প্রভাত হইবার পূর্ব্বে (রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের সময়) তুমি বলিলে, "ষষ্ঠীবাবু! কে তুমি, সুবোধ? জিজ্ঞাসা কর ষষ্ঠীবাবুকে, ৪টার গাড়ী চলে গেছে? আমার অসুখ আর সারবে না। আমি তো কোথাও যাব না। কোথায় যাব? সংসার আমার যত্নের জিনিস। ও মেনীর বাবা (ষষ্ঠীবাবু) ও সুকুমারীর বাবা (খেলাত বাবু), তোমরা নহি সুন্‌তে হো কি চার বজেকে গাড়িতে যাব। কে তুমি? মণি?" ১৫ই প্রত্যূষে যখন ভাই খেলাতচন্দ্র আসিলেন, তাঁহার আগমনের কথা বলিবামাত্র তুমি বলিলে, "কেন? আমি তো এই মাত্র খগোলে গিয়াছিলাম। এই তো দেখা করিয়া আসিলাম।"

বেলা ৭টার সময় উপাসনা করিতে তোমার শয্যার পার্শ্বে সকলে একত্রিত হইলেন। তুমি তোমাকে ঘুরাইয়া দিতে বলিলে, যাহাতে সকলকে দেখিতে পাও। তোমার ইচ্ছামত তোমাকে শোয়ান হইল। তুমি পৃথিবীতে শেষ প্রার্থনা করিলে, "যেন বিশ্বাসের শেষ পরিচয় দিয়া যাইতে পারি।" প্রার্থনা ছোট, কিন্তু বেশ স্পষ্টস্বরে বলিলে। সকালেই নাড়ী ক্ষীণ দেখিয়া মনে সন্দেহ হইতেছিল। তখন সকালে আফিস হইত। আফিসে যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম, তুমি বলিলে "আচ্ছা।" আমার চক্ষে জল দেখিয়া তুমি বলিলে, "কাঁদ্‌ছ"? এই এক কথায় অনেক কথা বলা হইল। বিয়োগ তো কিছু নয়; তুমি আমার কাছে কাছেই থাকিবে; ইচ্ছা হইলেই দেখিতে পাইব, তবে কাঁদিব কেন? আমিও তোমার কথা শুনিলাম; চক্ষের জল পুঁছিয়া ফেলিলাম, ও রাজকার্য্য করিতে গেলাম।

দুই প্রহরের পূর্ব্বেই তুমি সকলকে আহার করিয়া আসিতে বলিলে। লতু ও পাঁড়েয়াইন ও আর সকলকে ডাকাইয়া আনিলে। সুসারকে ডাকিয়া তাঁহার ক্রোড়ে নিজ মস্তক রাখিলে, যেন আপনার সকল ভাব তাঁহাকে অর্পণ করিলে। সুসারও তোমার অর্পিত ভার আজীবন বহন করিয়া গেলেন। ভাই পরেশ বাহিরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন; প্রায় একটার সময় বাড়ী আসিয়াই প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" তখন বোধ হয় তোমার শেষ যাতনা উপস্থিত হইয়াছে; তবু তুমি বলিলে, "এখন বলিব না, আহার করিয়া আসুন, তারপর বলিব।" কি অপরের দিকে দৃষ্টি! ১॥ টার সময় আমি ঔষধ দিলাম, তুমি পান করিলে। তারপরেই ডাক্তার সূর্য্য বাবু আসিলেন, এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "ঔষধ দেওয়া বৃথা।" কেহ নাম করে না দেখিয়া আমিই মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলাম; আর সকলে যোগ দিলেন। মনে হইল তুমিও যোগ দিতেছিলে। যেন ওষ্ঠ নড়িতেছিল। ২-১২ মিনিটে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিলে।



অঘোরকামিনীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে প্রকাশচন্দ্র এবং কন্যা ও পুত্রগণ—সুবোধ, সাধন, বিধান

উত্তর-পশ্চিমের কুঠরীতে তোমার দেহ রাখা হইল। চতুর্দ্দিকে আমরা বসিয়া উপাসনা করিলাম। সুবোধ ও সুসারও প্রার্থনা করিলেন। তারপর তোমার দেহের ফটো লওয়া হইল। তোমার দেহ নয়াটোলার বাড়ীতে আনয়ন করা গেল। পল্লীর যত দরিদ্র লোক (অধিকাংশই স্ত্রীলোক) তোমার দেহকে ঘিরিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। উপাসনার ঘরের কাছে নামাইয়া আবার প্রার্থনা করা হইল। তারপর ৪টার সময় দেহ তীরস্থ করা হইল। সঙ্গে অনেক ভদ্রলোক গিয়াছিলেন। সুসার ও লতুও গিয়াছিলেন। তোমার শেষশয্যা প্রস্তুত হইল। তোমার এই পুরাতন বন্ধু ও সেবক তোমার দেহের শেষকার্য্য করিল। তোমার জন্য প্রার্থনা করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া অগ্নিদান করিলাম। রাত্রি ৯টার সময় আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পৃথিবীর জীবন এইরূপে শেষ হইল। কিন্তু তোমার অমর আত্মা নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় নহে। এখান হইতে যে প্রেম, নিঃস্বার্থ ভাব ও পরহিতকামনা অর্জ্জন করিয়াছিলে, অমরধামে তাহার বড়ই প্রয়োজন, তাই তুমি সে সকলে সুসজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলে।

পরিশিষ্ট

এক

[প্রকাশচন্দ্র রায়ের জীবনচরিতের বাকী অংশ (১৮৯৬-১৯১১)]

১৫।৬।৯৬—অঘোরকামিনী পাটনায় মারা যান। সংকারের পর একটি পাত্রে ভস্ম রাখা হইল এবং তাঁহার উপাসনাগৃহের সম্মুখে একটি নীচু স্থানে পাত্রটি রাখা হইল। তাহার উপরে একখণ্ড মার্বেল পাথর দিয়া চাপা দেওয়া হইল। (৮নং প্লেট দেখুন।) ঐ জায়গায় পরে ছোট সিমেণ্টের চন্দ্রাতপ নির্মাণ করা হইয়াছিল।

জানুয়ারি ১৮৯৭—প্রকাশচন্দ্র রায় বর্ধমানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কলেক্টররূপে বদলি হইলেন।

অক্টোবর—১৮৯৭—গয়ায় বদলি হইলেন।

১৯০১—সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ।

১৯০১-১৯১১—পাটনাকে হেড কোয়াটার করিয়া তিনি ক্রমাগত বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং আত্মীয়বান্ধবদের আধ্যাত্মিক কুশল সংবাদ গ্রহণ করিতেন। তিনি তাঁহাদের উন্নততর জীবন-যাপনেও উৎসাহ দিতেন। প্রতিবেশীর অভাব অনটন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও পরিদর্শন তাঁহার প্রাত্যহিক কর্তব্যের অঙ্গ ছিল। তাঁহারাও সর্বদাই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন এবং তাঁহার নিকট সুখদুঃখের বোঝা উজাড় করিয়া দিয়া বিপদে আপদে তাঁহার পরামর্শ চাহিতেন। তাঁহার নিয়মিতভাবে লিখিত ডায়েরীতে এসব কথা লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত বলিয়া সেগুলি প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

তাঁহার অন্যতম দৈনন্দিন কর্তব্য ছিল ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে অল্পক্ষণস্থায়ী কিন্তু বারংবার উপাসনা পরিচালনা করা। সাধারণতঃ এগুলি যথাযথ ভাবে লেখা হইত এবং পরে একটি কপি তাঁহার

সন্তান, আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে একে একে পড়িতে দেওয়া হইত। আধ্যাত্মিক তথ্যে সেগুলি পরিপূর্ণ থাকিত এবং সমগ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাড়ে তিন হাজারেরও অধিক পৃষ্ঠায় ৪৪টি খণ্ডে সেগুলি প্রকাশ করেন। এগুলি বাংলায় লেখা এবং যদি কেহ তাঁহার লেখা এবং উপদেশাবলী পছন্দ করেন তবে চাহিলে পাইতে পারেন।

তিনি যেসব স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি পড়ে।

কাশ্মীর উপত্যকা, উত্তরের রাজ্যগুলির নগরসমূহ, মোতিহারী (বিহার), গয়া, আরা, খগোল (দিনাপুর) এবং বিহারের কয়েকটি স্থান, গিরিডি, দেওঘর, দার্জিলিং, ধুবরি, উত্তর আসাম, শিলং (কয়েকবার), শিলচর এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকটি স্থান এবং অবশেষে তাহার নয়াতলা, বাঁকিপুর পাটনাস্থিত বাড়ি।

অঘোরকামিনীর মৃত্যুর পর তাঁহার আরব্ধ কার্যভার তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুসারবাসিনীর উপর ন্যস্ত হইল। কিন্তু তিনিও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মারা গেলেন। ক্রমশঃ বিদ্যালয়টি সরকার গ্রহণ করেন এবং এখন পর্যন্ত মেয়েদের স্কুল এবং কলেজ ভালোভাবেই চলিতেছে।

অঘোরকামিনী এবং সুসারবাসিনীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তিনি বলিতেন তাঁহার ডান হাত গিয়াছে এবং বাঁ হাতও গেল। তাঁহার শূলবেদনা ও বহুমূত্র প্রভৃতি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৈর্যভরে তিনি রোগভাগ বহন করিয়াছিলেন।

১৯১১র ৭ই ডিসেম্বরে তিনি অঘোরকামিনীর প্রিয়স্মৃতি বিজড়িত কক্ষে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি এই অনুরোধ করিয়া যান যে, তাঁহার সৎকারের পর যেন তাঁহার ভস্ম অঘোরকামিনীর ভস্মাধারে রাখা হয়। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। মর্মর প্রস্তরখণ্ড সরাইয়া ভস্মাধার খোলা হইল। এবং তাহাতে যে দুজন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক মিলনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শেষ পার্থিব চিহ্ন রহিল।

দুই

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্বর্গীয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম কন্যা। হেমলতা দেবী আজ আর ইহজগতে নাই। হেমলতা দেবী ব্রাহ্মসমাজের এক মনীষী কন্যা, তিনি নারী শিক্ষার জন্য দার্জ্জিলিংএ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ঐখানেই শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

অঘোরকামিনী দেবীর ১৯১২ সালের ১৫ই জুনের সাম্বৎসরিক দিনে দার্জ্জিলিং সহরে উপাসনান্তে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দার্জ্জিলিং, ১৫ই জুন, ১৯১২

গত বৎসর এই দিবসে আমরা এই গৃহেই প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার পত্নীর পবিত্র বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছিলাম। সেই দিন আর আজ এই দিন। প্রভেদ অনেক। ছয় মাস হইল, প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া সেই অমরধামে বাস করিতেছেন। আজ কেবল আমরা স্বর্গীয়া অঘোরকামিনী দেবীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতেছি না, তাঁহাদের যুগলাত্মার প্রতি হৃদয়ের অকপট শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিতেছি। আজ আর শোক করিবার দিন নহে। আজ তাঁহাদের যুগলাত্মার অপূর্ব্ব মিলন চিত্র দেখিবার দিন।

বাস্তবিক প্রকাশচন্দ্র রায় ব্রাহ্মসমাজের সাধক শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপে সাধন করিতে হয় তাহা তিনি স্বীয় জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ অঙ্গের সাধক যে কেহ আবির্ভূত

হন নাই তাহা নহে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই তো সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। কিন্তু একটী বিষয়ে প্রকাশচন্দ্র রায় অদ্বিতীয় এবং আদর্শ স্বামী। জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন অনেকেই করিয়াছেন। কিন্তু পত্নীকে এমন করিয়া সহধর্ম্মিনী কেহ করিতে সমর্থ হন নাই। 'অঘোর প্রকাশ' নামক গ্রন্থে তিনি পত্নীর ধর্ম্ম জীবনের বিকাশ যেরূপ ভাবে বিবৃতি করিয়াছেন তাহা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। কেবল নিঃস্বার্থ প্রেমের গুণে সংসারে কি অমৃত ফল ফলিতে পারে এই গ্রন্থখানি তাহার নিদর্শন।

দশ বৎসর বয়সে অঘোরকামিনীর বিবাহ হয়। সাধারণ গ্রাম্য বালিকার সহিত এই বর্ণজ্ঞান বিহীনা বালিকার কোনই প্রভেদ ছিল না। অঘোরকামিনী যে দেখিতে সুন্দর ছিলেন তাহাত নয়। প্রকাশচন্দ্র রায়ের কি আশ্চর্য্য প্রেমপ্রাণ প্রকৃতি ছিল। শুভদৃষ্টি হইবামাত্র অঘোরকামিনী তাঁহার জীবনের ধ্যানজ্ঞান হইয়া গেলেন, অমনিই মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন নিজের স্বভাব সংশোধন করিয়া, এই বালিকার উপযুক্ত হইবেন। এমনি করিয়া বাল্যের প্রতিজ্ঞা কেহ সারাজীবনের সাধনার দ্বারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয় নাই। নিজ জীবনের কথা প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন 'তখন আমার প্রাণের ঈশ্বরকে চিনিতাম না যে তাঁহাকে ভাল বাসিব, ঘোরীকেই চিনিতাম, আর ঘোরীকেই ভাল বাসিতাম'। প্রেম এমন স্বর্গীয় বস্তু যে এই পত্নীপ্রেম তাঁহার জীবনকে পবিত্র করিয়া তুলিল। পত্নীর জন্যই পবিত্রতা তাঁহার বাঞ্ছনীয় হইল। প্রথম জীবনে প্রকাশচন্দ্র রায় দার্শনিক পুস্তক সকল পাঠ করিয়া নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিল না। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে এস্, কে, হিল (Rev : S. K. Hill) নামক একজন খ্রীষ্ট শিষ্যের আদর্শ চরিত্র দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ হন। এমন কি, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া কৃত সংকল্প হইলেন। ব্যাপ্‌টাইস হইবার দিনস্থির হইয়াও খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা হইল না। একটী খ্রীষ্টিও যুবকের অসাধু

ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে খ্রীষ্টান হইলেই ধর্ম্মলাভ হয় না। ক্রমে তাঁহার স্বগ্রামস্থ কতিপয় ব্রাহ্মযুবকের সংসর্গে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এই সম্বন্ধে 'অঘোর প্রকাশ' গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। 'এই সময়ে কেদার প্রচারক হইবেন বলিয়া শ্রীপুরে গমন করেন। তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম, ব্যাকুলতা, ফণীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পঞ্চাননের সরলতা, আমার অত্যন্ত সহায় হইয়াছিল। পঞ্চানন আমার সঙ্গ প্রায় ছাড়িতেন না। দুইজনে প্রায়ই নদীতীরে ভ্রমণ করিতাম তিনি গান করিতেন, আমার তাহা বড় ভাল লাগিত। আমাকে ফিরাইবার জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কোথা হইতে দেবতা যেন ইহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন'। এইরূপে প্রকাশচন্দ্র রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার উচ্চ জীবনের বিশেষত্ব এই যে উহা তাঁহার দাম্পত্য প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রকাশচন্দ্রের হৃদয় দাম্পত্যপ্রেমে অতি সুন্দর ও সরস হইয়া উঠিয়াছিল। বিধাতা দয়া করিয়া সেই প্রস্ফুটিত হৃদ্-পদ্মটী নিজ সেবায় নিয়োগ করিলেন। যে বৎসর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর ব্রহ্মোৎসবে অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার হইয়াছিল। প্রকাশচন্দ্র রায় সে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং সেদিনকার স্বর্গীয় দৃশ্য তাঁহাকে চির বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। দর্শক হইয়া আসিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু আর ফিরিতে পারিলেন না। সেইদিন হইতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ হইল। ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। একাকী উপাসনা করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। পত্নীকেও উপাসনার সময়ে বসিতে বলিতেন। অঘোরকামিনী তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা কিছুই বুঝেন না। স্বামী প্রার্থনা করিতেন, ব্রহ্ম সঙ্গীত করিতেন, তিনি শ্রবণ করিতেন মাত্র। এমন কি, মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মের কথা লইয়া স্বামীকে

উপহাস করিতেও ছাড়িতেন না। এই সময়ে একদিন একটী ঘটনা ঘটে ঃ—

১৮৭০ সালের শীতের ছুটীতে দেশে গিয়াছিলাম ; সেই সময়ে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা পড়িতে ভাল লাগিত। একদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া নিদ্রার পূর্ব্বে উক্ত পুস্তক একমনে পাঠ করিতেছিলাম, ভীষণ শ্মশানের কথা পাঠ করিতেছি, এমন সময়ে তুমি শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলে ও আমাকে নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতে দেখিয়া বিদ্রূপচ্ছলে কি বলিতে লাগিলে। তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হইল। ভালভাবে বলিলাম যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কৌতুক করিলে অত্যন্ত ব্যথা পাই। সেই যে তুমি নিবৃত্ত হইলে, আর কখনও আমার বিরোধী হও নাই। ইহার পর হইতে আমি তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্য যাহা কিছু চেষ্টা করিতাম, তুমি সে সকলের পক্ষপাতিনী হইতে। বাল্যকাল হইতে গ্রামে প্রতিপালিতা বলিয়া গ্রামের লোকেদের মত তুমিও ছোট ছোট বিষয়ে সত্যের অপলাপ করিতে। আমার তাহাতে অত্যন্ত ক্লেশ হইত। আমার কথাতে তুমি তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিলে। ক্রমে তুমি আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস সকল গ্রহণ করিতে লাগিলে ; আমার মনে আনন্দ আর ধরিত না। এই সময়েও রাত্রিতে গোপনে শয্যাতে বসিয়া তোমাকে পড়াইতাম, ও তোমাকে লইয়া প্রার্থনা করিতাম। তখনও তুমি ব্রাহ্মসমাজের মুখ দেখ নাই। ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাদি অতি অল্পই পাঠ করিয়াছিলে। পাঠ করিবার ক্ষমতাও তত ছিল না।

অঘোরকামিনীর ধর্ম্মজীবনের প্রথম দৃশ্য। স্বামীর চেষ্টায় ধীরে ধীরে তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয় বুঝিতে লাগিলেন। ক্রমে বিধাতা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিবার সুযোগ দিলেন। প্রকাশচন্দ্র রায় মতিহারীতে কর্ম্মোপলক্ষে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। পারিবারিক জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম

সাধন করিবার এই প্রথম সুযোগ হইল। দৈনিক উপাসনাকে ধর্ম্ম জীবনের প্রথম সোপান বলিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহারা আলিঙ্গন করিলেন এবং তখন হইতে অঘোরকামিনীর ধর্ম্ম জীবনের অপূর্ব্ব বিকাশ আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় সে জীবন অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইল! এই সময়কার ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে 'অঘোর প্রকাশ' গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

মতিহারী থাকিতেই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করিতে শিখিয়াছিলাম। এবার সেই জীবন নানা দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে জীবনকে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব হইল না। বুঝিলাম বাহিরের জনসমাজের সেবা না করিলে ঘরের ধর্ম্মও ঠিক থাকে না, আর বাহিরের জগত দেখিয়া মনটা বড় না হইলে, ভাল লোকের সঙ্গে মিশিয়া আত্মা উন্নত না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করা যায় না। তুমিও ইহা বুঝিতে পারিলে তাই এ সময় হইতে আমাদের চেষ্টা হইল যে কিসে আমাদের জীবন, বিশেষতঃ তোমার জীবন সংসারের সীমা ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। নিত্য উপাসনা করিতে শিখিয়াছিলে, কিন্তু মণ্ডলী কাহাকে বলে তাহা তখনও জানিতে না। বাহিরের জগত দেখিয়া মনের যে প্রসার হয়, তাহা তখনও তোমার হয় নাই। ভাল ভাল লোকের সহিত তোমার পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলাম, তোমার অজ্ঞান আঁধার দূর হইতে লাগিল। তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার আনন্দ আর ধরিত না, আমার উৎসাহ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। নারীসুলভ লজ্জা ও ভয় থাকিলে যথার্থ উন্নতি হয় না, ক্রমে ক্রমে এই লজ্জা ও ভয় অতিক্রম করিতে লাগিলে। তোমার সাহস বাড়িতেছে ও অন্য লোকের সঙ্গে মিশিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী তুমি শিখিতেছ দেখিয়া আমারও সাহস বাড়িল। একদিকে আমি যেমন তোমার মনের প্রসার কিসে হইবে তাহার জন্য ব্যস্ত

হইতাম আবার তুমিও সদাই ভাবিতে কিসে আমার ধর্ম্ম জীবন সরস থাকিবে ও কষ্ট শ্রান্ত আত্মা বল লাভ করিবে।

প্রকাশচন্দ্র রায় পত্নীর ধর্ম্ম জীবনের উৎকর্ষতার জন্য প্রাণপ যত্ন এবং চেষ্টা করিতেন সত্য, কিন্তু অঘোরকামিনীর ন্যায় শিক্ষা না পাইলে তাঁহার এ চেষ্টা কখনও এরূপ সফলতা লাভ করিত না। আশ্চর্য্য তেজস্বিতা ছিল, এই কারণেই তাঁহার ধর্ম্মজীবন এমন সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। পুরুষেরা যখন প্রমত্তভাবে উপাসনা সংকীর্ত্তন করিতেন তখন অঘোরকামিনীর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত, কবে নারীগণ এ সুখ সম্ভোগ করিবেন। প্রাণময়ী অঘোরকামিনী এ সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

বিধাতাও তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন না। দেখিতে দেখিতে তিনি দ্রুত পদে ধর্ম্ম রাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় অঘোর-কামিনীর শিশু সন্তানদের জননী গৃহ ধর্ম্ম পালনে ব্যাপৃতা, নিজ হস্তেই সমুদয় গৃহের কর্ম্ম তাঁহাকে করিতে হইত।

তথাপি একদিনের জন্যও কেহ তাহার ধর্ম্মসাধনে শিথিলতা দেখে নাই। কিছুতেই তাঁহার দৈনিক সাধনের ব্যতিক্রম হইত না। ধর্ম্মই এই সাধক দম্পতীর প্রাণের প্রিয় বস্তু হইয়াছিল। উপাসনার বিমল আনন্দে তাঁহারা দিবানিশি মগ্ন থাকিতেন। এমন আদর্শ ব্রাহ্মপরিবার কি আর হইতে পারে? তাঁহারা যে ভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পালন করিতেন আমাদের সকলের নিকটেই তাহা অনুকরণীয়। তাঁহাদের পারিবারিক ধর্ম্মসাধনের কয়েকটী নিয়ম ছিল। যথা— (১ম) উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা (২য়) পারিবারিক সমুদয় কার্য্যে ঈশ্বর স্মরণ (৩য়) প্রাণান্তেও কপর্দ্দক ঋণ না করা (৪র্থ) ভগবানের সঙ্কেত বুঝিয়া জীবনের সমুদয় কার্য্য করা।

এই সমুদয় নিয়মের উপকারিতা আমরা সকলেই স্বীকার করি, অথচ আমরা কেহ কার্য্যে তাহা পালন করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করি না। বাস্তবিক সকল পরিবারেই নির্দ্দিষ্ট উপাসনা গৃহ থাকা

উচিত। প্রকাশ বাবুদের উপাসনা গৃহের কথা শুনিলে মন পুলকিত হয়। অঘোরকামিনীর হৃদয় যখন সাংসারিক দুঃখ বিপদ পরীক্ষায় চঞ্চল হইত, তখনই ছুটিয়া সেই গৃহে গিয়া প্রার্থনা করিয়া সবল হইতেন। অঘোরকামিনী প্রতিদিন যে কতবার গিয়া উপাসনা গৃহে বসিতেন তাহার সংখ্যা হয় না। আমাদের গৃহ-সংসারে দেখি উপাসনার জন্য মন ব্যাকুল হইলেও একটু নির্জ্জন স্থান খুঁজিয়া পাই না। বাস্তবিক প্রতিবারে এই প্রকার সুন্দর উপাসনা গৃহ প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে অবহেলা করিলে পরিবারে ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। (২) পারিবারিক সমুদয় কার্য্যে ঈশ্বর স্মরণ—প্রকাশ বাবুর গৃহে প্রতিদিন উষাকালে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইত। উপাসনা না করিয়া তাঁহাদিগের কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হইত না। প্রার্থনা করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেন, প্রার্থনা করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতেন। এই পরিবারে যাহা কিছু প্রেরিত হইত, বিধাতার দান বলিয়া গৃহীত হইত। (৩) অঘোর প্রকাশ কখনও কপর্দ্দক ঋণ গ্রহণ করেন নাই। জীবনে এই নিয়ম রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহারা অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। এমন কি, সপরিবারে উপবাসী থাকিয়াছেন, তথাপি নিয়মভঙ্গ করেন নাই। প্রকাশ বাবুর মুখে শুনিয়াছি দেবী অঘোরকামিনীর ঈশ্বর বিশ্বাস এরূপ অস্থিমজ্জাগত হইয়াছিল যে কিছুতেই তাহা বিচলিত হইত না। এই স্থানে দুই দিনের দুইটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। ১। তাঁহার প্রথম দৌহিত্রের পীড়ার সময়ে অঘোরকামিনী দেবী দিবানিশি অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেন। ঔষধ ও পথ্যে প্রতিদিন ৪।৫ টাকা ব্যয় হইত। রোগ অতি গুরুতর। শিশুর জীবনের কোনও আশাই ছিল না, মাসের শেষভাগে অঘোর-কামিনীর অর্থের অনটন হইল। ঋণ করিবেন না বা জামাতার নিকট অর্থ সাহায্য চাহিতে পারেন না। এমন অবস্থায় বড়ই সঙ্কট উপস্থিত হইল। প্রকাশচন্দ্র চিন্তাকুল হইলেন ; কিন্তু দেবী অঘোর-

কামিনী স্থির মনে শিশুর পরিচর্য্যা করিতেছেন। অনটনের কোন কথাই তাঁহার মুখে নাই। অবশেষে একদিন এমন হইল যে ঔষধ পথ্যের জন্য অর্থ রহিল না। প্রকাশ বাবু আসিয়া ব্যাকুল চিত্তে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার হাতে আর কি আছে'? অঘোরকামিনী শিশুর পথ্য প্রস্তুত করিতে করিতে স্থির ভাবে বলিলেন, 'ব্যস্ত হও কেন? মা কি দেখিতেছেন না, এখনি ইহার উপায় করিবেন। তুমি স্থির হও'। প্রকাশ বাবু পত্নীর কথা শুনিয়া বাহিরে আসিবা মাত্র ডাক হরকরা তাঁহার হাতে মনি অর্ডারের ৩০ টাকা দিল। কোথা হইতে অযাচিত ভাবে কে তাঁহাকে ৩০টী টাকা ধার শোধ করিয়াছে। টাকা হস্তে পাইয়াই প্রকাশ বাবুর চক্ষে জল আসিল। তিনি প্রাণ ভরিয়া সেই জগন্মাতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

(২) দ্বিতীয় ঘটনাটী এই—এ সম্বন্ধে অঘোরকামিনীর দৈনিকে এরূপ লিখিত আছে ঃ—২৫শে ডিসেম্বর, খ্রীষ্টমাস, বাগানে উপাসনা। প্রায় ৫৪ জন উপাসনায় উপস্থিত। তাহার ভিতর ৫।৬টি বালক বালিকা। এতগুলি লোক আহার করিবেন। আজ আর কিছু নাই আহারের। গত রজনীতে একবার মনে হইল কি হইবে? কিন্তু মার উপর নির্ভর করিয়া নিদ্রা গেলাম। সকালে ৭টা পর্য্যন্ত বিছানায়, শরীর অসুস্থ থাকায়। কন্যারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইবে? বলিলাম, সকল মেয়ে ছেলেদের নিকট ভিক্ষা কর। দু পয়সা, আড়াই পয়সা, এইরূপে এক টাকা হইল। এই পয়সা দ্বারা চাউল ইত্যাদি খরিদ করিয়া যাত্রা করা গেল। সেখানে গিয়া দেখি অনেক পরিবার হইতে পুরী মিঠাই, রুটি, মুড়ি, ইত্যাদি আসিয়াছে। লেবু কিছু লইয়াছিলাম, কিছু অন্যেরাও আনিয়াছিলেন। এইরূপে খুব ভাল আহারাদি হইল। পায়েসও আসিয়াছিল। ৫৪ জন আহার করিয়া কিছু চাউল বাঁচিল ও ৪ জনের ভাতও বাঁচিয়াছিল। ঈশার কথা মনে পড়িল, তিনি দুটী মাছ ও দুইখানি রুটীতে কেমন করিয়া

এত লোককে খাওয়াইয়াছিলেন, আর বাঁচিয়াছিল। ফলে বিশ্বাসই মূল। ঘরে অসিবামাত্র স্বামী মহাশয় বলিলেন, তোমার বিশ্বাসের পুরস্কার লও। এই বলিয়া ৫৲ টাকা দিলেন। পাইয়া অবাক্ হইলাম। পরে বলিলেন, মোকামা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল এই টাকা পাঠাইয়াছেন। মার দয়া দেখিয়া সকলের বিশ্বাস শতগুণ বাড়িল'।

(৩) বিধাতার সঙ্কেত বুঝিয়া চলিতে চেষ্টা করা।

ইঁহারা কখনও সাংসারিক বুদ্ধিতে হিসাব করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। বিধাতা যেরূপ ঘটাইবেন সেই মঙ্গল, ইহাই তাঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা সদ্‌গোপ পাত্রে হৃদয় দান করিলেন, জনক জননী আপত্তি মাত্র উত্থাপন করিলেন না। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করিলেন, অঘোর-প্রকাশ নির্ব্বাক। বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন তাহারই হাতে সমর্পণ করিলেন। ইহার পরিণাম যে শোচনীয় হয় নাই তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু পিতামাতার বিশ্বাস তাহার জন্য একবিন্দু শিথিল হইল না।

অঘোর প্রকাশের ধর্ম্মজীবনের কাহিনী অতি সুন্দর, অতি মধুর। প্রকাশচন্দ্র রায় 'অঘোর প্রকাশ বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিতেন'। অঘোরকামিনী আপনাকে অঘোর প্রকাশ বলিতেন। এমন করিয়া কি কোন পতি পত্নী মিলিত হইতে পারেন। অঘোর-কামিনী প্রকাশচন্দ্রের জীবনের ভিতর দিয়া কি অপূর্ব্ব শোভায় প্রস্ফুটিত হইলেন। প্রকাশচন্দ্র অঘোরকামিনীর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বিনিময় নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, দাবী নাই এই দান মহাদান। সেই বিবাহের রাত্র হইতে অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্রের জীবন ক্রয় করিয়াছিলেন। সে কি এক দশম বর্ষিয়া বালিকার গুণে। গুণ প্রকাশচন্দ্র রায়ের, প্রকাশচন্দ্র কি সামান্য প্রেম দিয়া অঘোরকামিনীকে জয় করিয়াছিলেন। এমন ঐকান্তিকী

নিঃস্বার্থ প্রেম কি কেহ দেখিয়াছে। সংসারের স্বামী তাহার স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার অন্বেষণ করে, সুখাদ্য আহরণ করে, সুন্দর করিয়া গৃহ সাজায়। আমাদের অপার্থিব প্রকাশচন্দ্র খুঁজিতেন বৈরাগ্য ও ধর্ম্মের ভূষণ, খুঁজিতেন স্বর্গীয় আহার, নামামৃত ও সাধু সঙ্গ। সাজাইলেন সাধুকর্ম্ম দ্বারা। হায়! এমন স্বর্গীয় দাম্পত্য প্রেম কে কবে দেখিয়াছে! প্রকাশচন্দ্র বলিয়াছেন, 'তোমার জন্য আধ্যাত্মিক আহার আহরণ কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যেখানে যাহা ভাল পাইতাম একান্ত হৃদয়ে তোমাকে উপহার দিতে লাগিলাম।

প্রকাশচন্দ্রের এত আয়াস বৃথা যায় নাই। অঘোরকামিনী লিখিয়াছেন 'এর চেয়ে (অর্থাৎ ধর্ম্মের চেয়ে)' সংসারে ভাল জিনিষ তুমি কি দিতে পারিতে। এখন ভাবি আমি কি চতুর। যদি সংসারের সুখ তোমার নিকট চাহিতাম এ অপূর্ব্ব বিভুযোগ আমি পাইতাম না। মার কৃপা ভাবিলে, প্রকাশ, আমার প্রাণ আর স্থির থাকে না। কেন তিনি এত ভালবাসেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসেন, উত্তর দেন না। তারপর বলেন হইয়াছে কি? আরও ভালবাসিব। প্রকাশ, আমাদের একি হইল। লোকে যে পাগল বলিবে। আমি তো সর্ব্বদা ব্যস্ত যাহাতে আমার অমন যোগে মার কার্য্য না বন্ধ হয়।

তোমার ঘোরী প্রাণ থাকিতে কিছুতেই পিছপা হইবে না। তোমার ঘোরী কিছু জানে না, প্রকাশ, তুমি যাহা বলিয়া দিবে এ দাসী প্রাণ দিয়া তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। আর এমন কঠিন কাজ মা দেবেন না যা আমরা পারিব না। না পারি, কাজ করিতে করিতে তো যাইতে পারিব। মা তো আমাদের এমন কঠিন মা নন যে যাহা না পারিব তাই দেবেন। তিনি জানেন যে আমরা কত দূর পারিব। যদি আমাদের দ্বারা তাঁর কাজ করাইতে ইচ্ছা হয় অবশ্যই পারিব। প্রকাশ! তোমার ঘোরীর সমস্ত রক্ত দিলেও কি মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।

অনেক দাম্পত্য প্রেমের কাহিনী কবিতায় পড়িয়াছি, অনেক শুনিয়াছি, অঘোর প্রকাশের দাম্পত্য প্রেম মহাকবিকেও নির্ব্বাক করিয়াছে। কোথায় ছিলেন অঘোরকামিনী, অশিক্ষিত গ্রাম্য বালিকা, তুচ্ছ সুখ দুঃখ লইয়া দিনপাত করিতেন। আর এ কোন্ স্বর্গধামে উপনীত হইলেন। এ পথের সাথী কে? নেতা কে? পতিগুরু ধর্ম্মবন্ধু প্রকাশচন্দ্র। সাধে কি অঘোরকামিনী বলিয়াছেন —পত্নীপ্রাণ! তোমায় কি বলিয়া সম্বোধন করিব ভাবিয়া পাই না। স্বর্গের সঙ্গি! তোমাকে নমস্কার করিতে বড় ইচ্ছা করিতেছে তোমার মূল্য এখনও বুঝিতে পারি নাই।

এই সাধক দম্পতি ধর্ম্ম লাভের জন্য কত যে আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, কত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, প্রকৃতির ভিতর প্রকৃতিনাথকে দেখিবার জন্য কত তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। উপাসনা, আরাধনা, নামগান ইঁহাদের নিকট পরম প্রীতিকর ছিল। এক্ষণে ইঁহাদের ধর্ম্মজীবনের পরিণতির দু একটী কথা বলিয়া আমি আমার অর্ঘ্যের শেষ অঞ্জলি দান করিব।

অঘোরকামিনী নিজ জীবনে গৃহ-পরিবারে ধর্ম্মসাধন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। জীবন দিয়া গৃহে ও বাহিরে প্রভুর সেবা করিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল। এখন তাঁহার আর লজ্জা, ভয়, মান, সম্ভ্রম কিছুই রহিল না। প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়া চক্ষুর জলে ভাসিয়া অপরকে ব্রহ্মনাম শুনাইতেন। বালিকাদিগের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিবার জন্য স্কুল ও বোর্ডিং স্থাপন করিলেন। নিজে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করিবার জন্য গৃহ পরিবার পতিপুত্র ছাড়িয়া লক্ষ্মৌ College ও Boardingএ গেলেন জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে রুগ্ন ও আর্ত্ত ব্যক্তির সেবার জন্য দেহ মনের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিলেন। প্রকাশবাবু Deputy Magistrate ছিলেন। অঘোরকামিনীর সংসারে অপ্রতুল কিছুই ছিল না। কিন্তু ইঁহারা প্রভুর নামে সকলই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের

'আমার' বলার কিছুই ছিল না। প্রভুর সেবার জন্য কত যে পরিশ্রম করিতেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অঘোরকামিনী নিজেও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে পতি পুত্রের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। উপার্জ্জক স্বামীর পত্নী হইয়াও অভাবের জন্য স্থুলভ মোটা বস্ত্র বা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন। মূল্যবান বস্ত্র কিনিবার সম্বল আর রাখেন নাই। এমন করিয়া দারিদ্র্য আর কে বরণ করিয়াছে। তিনি যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার জন্য দুরন্ত পরিশ্রম করিতেন। অকাতরে স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল কোনও ছাত্রী শিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলে তাহাকে ফিরাইতেন না বা কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। এমন করিয়া সাধ্বীর জীবনপাত করিয়া যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার কি বিনাশ হইতে পারে। কবি যে গাহিয়াছেন তাহা যথার্থই ঃ

তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি।

বিধাতা অঘোর প্রকাশকে তাঁহার পতাকা বহিবার ভার দিয়াছিলেন, তাহা বহন করিবার দুর্জ্জয় শক্তিও তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। যে অঘোরকামিনী কুলে কুলবধূ ছিলেন, আজ তাঁহার কি অবস্থা হইল? তিনি মুক্ত হৃদয় লইয়া মুক্ত জগতের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুঃখে শোকে অপরাজিতা, ভগবৎ প্রেমে আত্মহারা, জনসেবায় যিনি সর্ব্বত্যাগ করিলেন সেই নারী যে দেবী আখ্যা পাইবার যোগ্যা তাহাতে আর সংশয় নাই। প্রচারকগণ যে তাঁহাকে ব্রহ্মকন্যা মৈত্রেয়ী বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তাহাও অত্যুক্তি নয়। এমন করিয়া কোন রমণী কি জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? এ সমুদয় প্রকাশচন্দ্র রায়ের কীর্ত্তি। তিনি একদিনের জন্যও নিজের সুখ ও স্বার্থের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। তিনি স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রম করিতেন।

অঘোর প্রকাশের গৌরবে সমুদয় ব্রাহ্ম সমাজ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আশা হইতেছে অঘোর প্রকাশের জীবনের শিক্ষা বিফল হইবে না। এই সাধক দম্পতীর জীবনের মোহন চিত্র কি ব্রাহ্ম সমাজ বিস্মৃত হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না।

বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন অঘোর প্রকাশের জীবনের শিক্ষা কখনও যেন বৃথা না যায়।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।*

---

* নিবেদন—প্রকাশচন্দ্র রায় পৃষ্ঠা ৩৯৫৭-৩৯৬৮

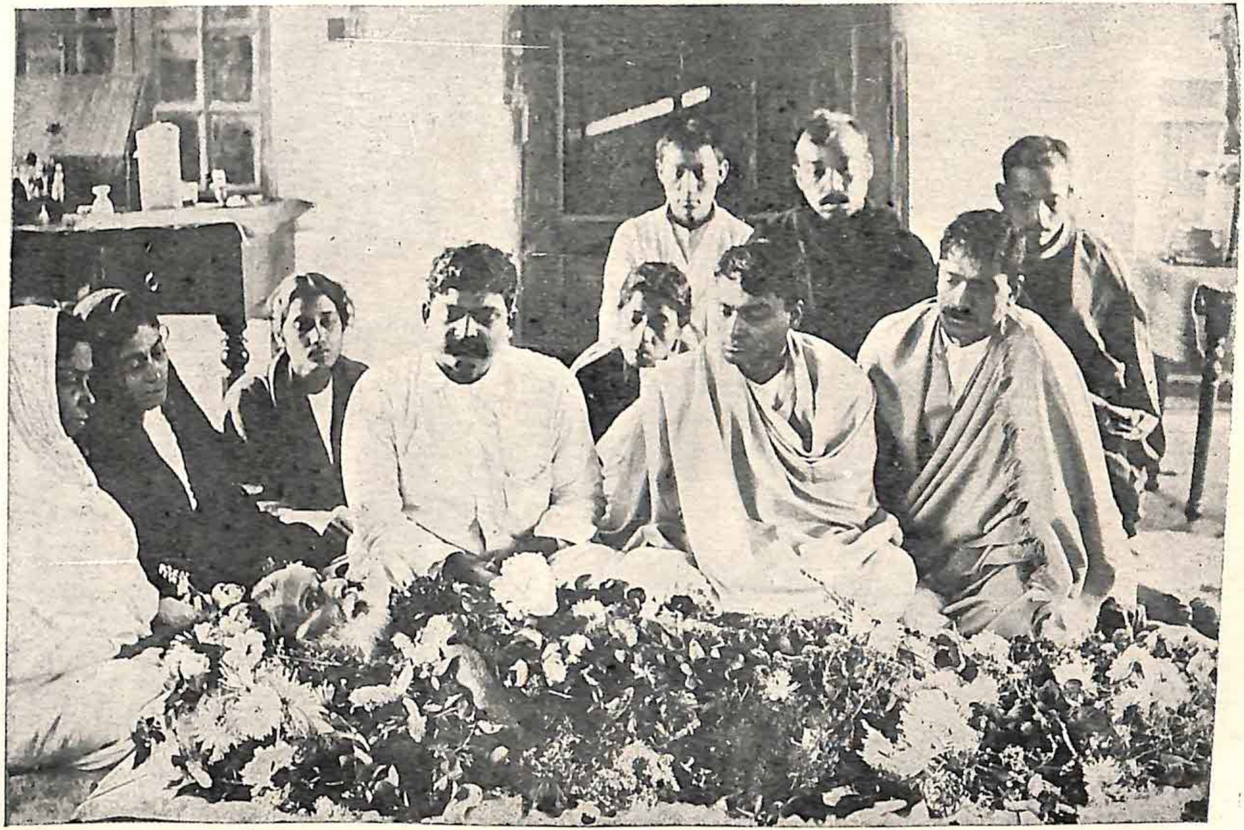
তিন

স্বর্গত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী পুণ্যবতী স্বর্গতা শ্রীযুক্তা সুদক্ষিণা সেন প্রকাশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁহার 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল ঃ

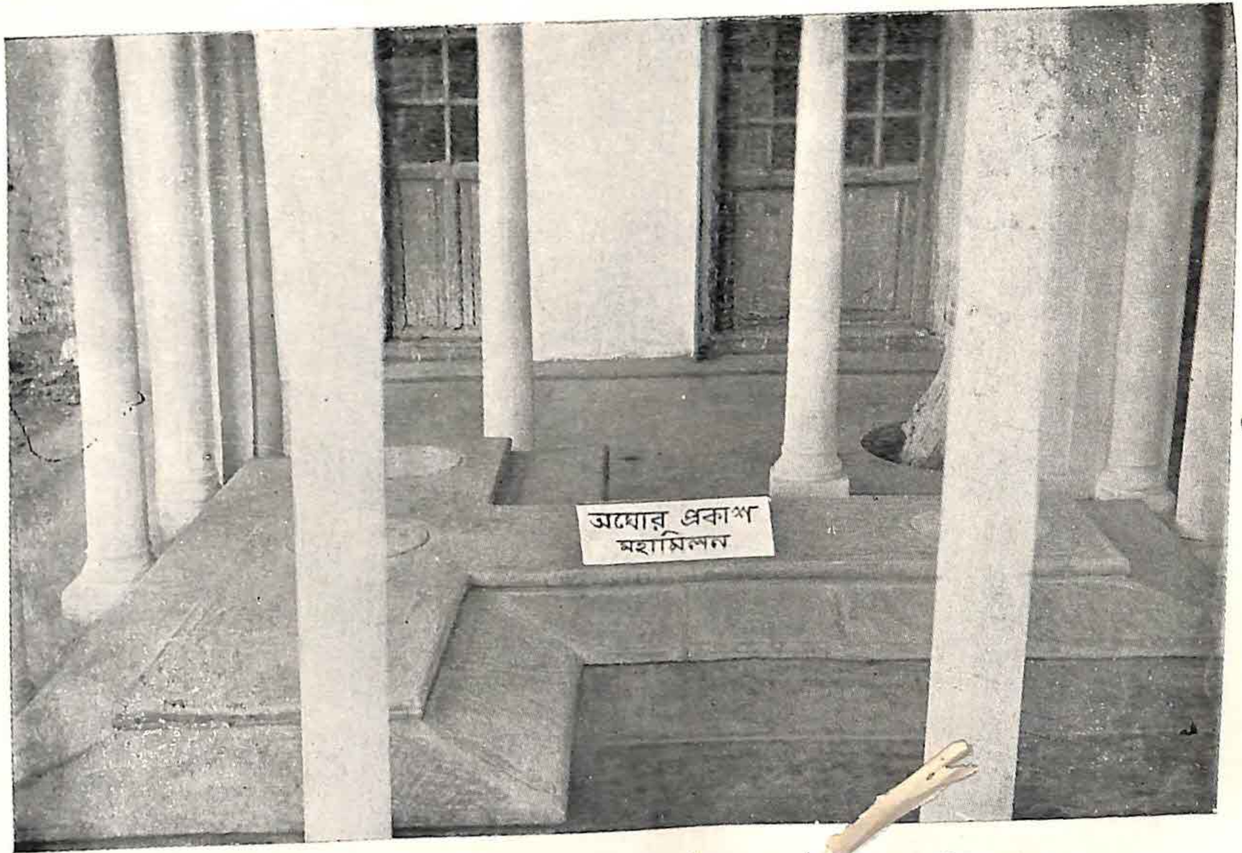
শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়

সেই সময়ে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া আসেন। তিনি প্রথমে আমাদের বাড়ীতেই উঠিয়াছিলেন। পরে অন্য বাটী ভাড়া করেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্বে আমাদের পরিচয় ছিল না; উভয়েই উভয়ের নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র। তিনি ব্রাহ্ম বলিয়াই একজন ব্রাহ্ম ভ্রাতার বাড়ী নিঃসঙ্কোচে আসিয়া উঠিলেন। স্বামী তাঁহার সহিত উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া অনেক সময় কাটাইতেন। এইরূপে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্রের সহিত আমাদের একমাত্র কন্যা সরযূবালার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন, এবং ১৯০১ সালের আগষ্ট মাসে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৯০২ সালের ২৯শে জানুয়ারী তাহার সহিত কন্যা সরযূর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র শুধু জামাতা নহেন আমাদের পুত্রস্থানীয় হইলেন। সেই সঙ্গে আদরের সাধনচন্দ্র ও বিধানচন্দ্র আমাদের স্নেহের স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহারা আমাদের অত্যধিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এ স্থলে ভগবানের অসীম দয়ার কথা স্বীকার না করিয়া পারি না।

বর্দ্ধমানে যে সময়ে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আসেন, তাহার কিছুদিন পরে ১৮৯৭ সালের মাঘোৎসবের



প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে পুত্রগণ সুবোধ, সাধন, বিধান ও কন্যা সরোজিনী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন



অঘোরকামিনী ও প্রকাশচন্দ্রের পবিত্র দেহাবশেষ এইখানে একই আধারে রক্ষিত আছে

সময় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার পত্নীসহ এবং কলিকাতা হইতে কয়েকজন ব্রাহ্ম আমাদের বাড়ী আসেন। উপাসনা, জমাট কীর্ত্তন গান ও সৎ-প্রসঙ্গাদিতে সেই সময়টি কি সুন্দর ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আজিও মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই সময় মাঘোৎসব উপলক্ষে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানে আমাদের বাড়ীতে আসেন এবং মহাসমারোহে উৎসব হয়। *

বৈবাহিক মহাশয়ের স্বর্গারোহণ ঃ

স্বামীর স্বর্গারোহণের ঠিক একমাস পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর, বৈবাহিক প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ও আমাদের শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। স্বামীর পবিত্র শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁহার উপস্থিত থাকিবার একান্ত অভিলাষ ছিল কিন্তু চিকিৎসকের অনুমতি না পাওয়াতে তিনি আসিতে সক্ষম হয়েন নাই। তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, শুদ্ধমাত্র প্রাণের টানেই তিনি আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক স্বর্গের শাশ্বত আনন্দের মধ্যেই তাঁহারা পুনর্মিলিত হইলেন।

শ্রীমান্ সুবোধ এবং সরযূ এখানকার পবিত্র শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া বাঁকীপুরের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সমাধান করিতে রওনা হইলেন। আমাকেও তাহাদের সহিত লইয়া গেলেন। অশ্রুজলে ভাসিয়া আমি তাহাদের ক্রিয়া কর্ম্মে যোগদান করিলাম।†

* 'জীবন-স্মৃতি'—সুদক্ষিণা সেন, পৃঃ ১৭০-১৭১

† 'জীবন-স্মৃতি'—সুদক্ষিণা সেন, পৃঃ ১৯৩-১৯৪

চার

এই পুস্তকটি একটি সাধিকার জীবনী। তাঁহার স্বামী এই জীবনী লিখিয়াছেন। চিরাচরিত প্রথায় লেখা জীবনীর ন্যায় এখানে কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির জাবন, তাঁহার কীর্তি ও উত্তরাধিকারের বিবরণ নাই। পুস্তকটির লিখনভঙ্গীর একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বস্তুতঃ ইহা পতি-পত্নীর যুক্ত আত্মজীবনী। ইহাতে বরাবর একজন অপরজনকে সম্বোধন করিয়াছেন, এবং ১৮৬৬ হইতে ১৫ই জুন ১৮৯৬ পর্যন্ত ঘটনাবলী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

তিনি ছিলেন একটি নিরক্ষর গ্রাম্য মহিলা। অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহসের সহিত সকল কুসংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ভারতে নারী-জাগরণের কার্যে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি সর্বদাই তাঁহার স্বামীর পার্শ্ববর্তিনী ছিলেন। তাঁহার স্বামীও বঙ্গের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারভুক্ত ছিলেন।

এই জীবনীতে আমরা তাঁহাদের যুক্ত জীবনের একটি সম্পূর্ণ যথাযথ চিত্র পাই। কেবল গার্হস্থ্য জীবনে এবং বৃহত্তর জনকল্যাণ-ক্ষেত্রে নহে, তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় জীবনেও যে সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাঁহাদের চলিতে হইয়াছিল তাহার নিছক খাঁটি বিবরণ ইহাতে পাই। এ বিষয়ে কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জন বা সত্য গোপন নাই। বস্তুতঃ, পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই আমরা স্বামী স্ত্রীর যুক্ত আধ্যাত্মিক জীবনের আভাস পাই। এই জীবন লাভ করিতে তাঁহাদের অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং প্রায়ই অশ্রু সাগর সন্তরণের প্রয়োজনও হইত। এ সবই পুস্তকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। অবশ্য তিনি তাঁহার প্রিয়জনদের কখনই

অবহেলা করিতেন না। তাহাদের তিনি স্বরচিত সুন্দর এক পরিবেশে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী। সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য তাঁহার নিয়ত প্রচেষ্টার ফলে আমরা, তাঁহার সন্তানগণ দেখিয়াছি অবশেষে তিনি এমন এক স্তরে উঠিয়াছেন যেখানে তিনি ভয়শূন্য, যেখানে তিনি দীন দরিদ্রের প্রতি দয়াশীল, অক্লান্তকর্মী, যেখানে করুণকঠোরের অপরূপ সংমিশ্রণ, এবং যেখানে জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে তিনি ঈশ্বরের প্রতি একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই জীবনী গ্রন্থে এসবেরই বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে। তিনি নিয়মিতভাবে দিনলিপি রাখিতেন। এই দিনলিপির মূলগ্রন্থ এখনও আমাদের কাছে আছে। এখান হইতে বহু উদ্ধৃতি বইটিতে দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহার শেষ সন্তান হইয়াছিল ২৬ বৎসর বয়সে, এবং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪০ বৎসর। সুতরাং তাঁহার বহুমুখী কর্মধারা কয়েকটি বৎসরেই আবদ্ধ ছিল। যদিও তিনি পাটনার কালেক্টর এবং সিনিয়র ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের মহিমান্বিতা পত্নী ছিলেন, দিনের বেলায় মেয়েদের বিদ্যালয়ে এবং ছাত্রী আবাসে যাওয়া, এবং দিনে হউক রাতে হউক, তাঁহার কর্তব্য ছিল দরিদ্রের, আর্তের শয্যাপার্শ্বে যাওয়া। তাঁহার 'বৃহৎ পরিবারের' লোক সংখ্যা প্রায়ই বৃদ্ধি পাইত, সেখানে নিতান্ত দরিদ্র হইতে অতি ধনী,—যেই তাঁহাকে চাহিত, সকলেরই স্থান ছিল। তাঁহার মন কিন্তু সর্বদাই প্রার্থনাগৃহে পড়িয়া থাকিত। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কিভাবে এমন কি মৃত্যুর পরে পর্যন্ত স্বামীর সহিত যুক্ত আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে পারেন।

৫৭ ল্যান্সডাউন রোড
কলিকাতা ২৫

শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়

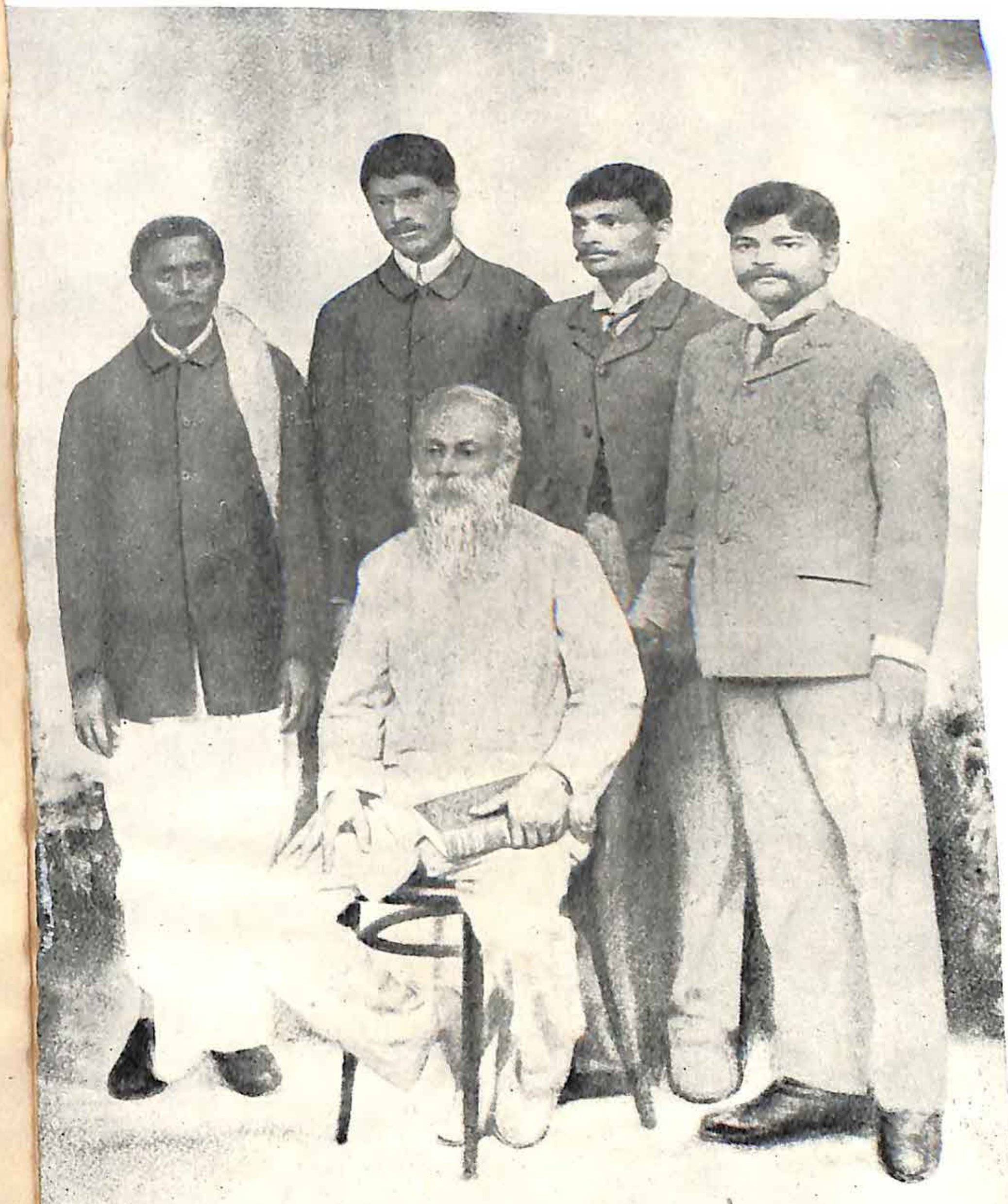
- বিরাট গুহ (১)
  - প্রতাপাদিত্য রায় (১৬)
    - প্রাণকালী রায় (২০)
      - প্রতাপচন্দ্র (২১)
      - প্রবীণচন্দ্র (২১)
      - পূর্ণচন্দ্র (২১)
      - প্রকাশচন্দ্র (২১)
      - প্রবোধচন্দ্র (২১)

- হরচন্দ্র বসু (১)
  - বিপিনচন্দ্র বসু (২)
    - অঘোরকামিনী দেবী (৩)

(অঘোর-প্রকাশ)

- সুনার বাসিনী দেবী (২২)
- সরোজিনী ঘোষ (২২)
  - দেবপ্রসাদ ঘোষ (২৩)
  - অমিয়া দে (২৩)
- সুবোধচন্দ্র (২২)
  - সুজাতা বসু (২৩)
    - সঞ্জিৎকুমার (২৪)
    - রঞ্জিৎকুমার (২৪)
  - ৺সুধীরা (২৩)
  - সুকুমার চন্দ্র (২৩)
    - জয়া রায় (২৪)
  - সুবিমলচন্দ্র (২৩)
    - সুনন্দা রায় (২৪)
    - ইন্দিরা রায় (২৪)
    - অমৃতা রায় (২৪)
    - খোকন (২৪)
- সাধনচন্দ্র (২২)
  - রেণু চক্রবর্তী (২৩)
    - সুস্মিত চক্রবর্তী (২৪)
- বিধানচন্দ্র (২২)

নির্ঘণ্ট



অঘোর-পরিবার

উপবিষ্ট ঃ প্রকাশচন্দ্র। দণ্ডায়মান ঃ (ডান হইতে বামে) প্রকাশচন্দ্রের পুত্রগণ
সুবোধ, সাধন, বিধান ও ভ্রাতুষ্পুত্র মহাতাপ

স

হ

৷৷ ওরিয়েণ্টের জীবনী-সাহিত্য ৷৷

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মচরিত	১০৲
রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত	৪৲
ডাক্তার বিধানচন্দ্রের জীবন-চরিত—নগেন্দ্রকুমার গুহরায়	৮৲
মহাত্মা গান্ধী—রোমাঁ রোলাঁ	৩৲
বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ	৬৲
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ	৬৲
বার্নার্ড শ'—ঋষি দাস	৪৷৷০
শেক্‌স্‌পীয়র—ঋষি দাস	৬৲
গান্ধী-চরিত—ঋষি দাস	৪৷৵
লোকমান্য তিলক—ঋষি দাস	১৷০
ছোটদের গিরিশচন্দ্র—ঋষি দাস	১৷০
ছোটদের নজরুল—ঋষি দাস	১৷৵
সীমান্ত গান্ধী—সুকুমার রায়	১৷৵
আবুল কালাম আজাদ—ঋষি দাস	২৲
আমাদের গান্ধীজি—ধীরেন্দ্রলাল ধর	৬৲
মনিষী-জীবনকথা, ১ম খণ্ড—সুশীল রায়	২৲
মনিষী-জীবনকথা, ২য় খণ্ড—সুশীল রায়	২৲
বন্দী-জীবন—ধীরেন্দ্রলাল ধর	২৲
নবযুগের মহাপুরুষ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৬৲
সাধিকা-মালা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	২৲
শ্রীরামকৃষ্ণের যারা এসেছিল সাথে—স্বামী অমিতানন্দ	২৲
ভগবান বুদ্ধদেব—কবি কৃষ্ণধন দে	২৲
দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ—প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	১৷০

৷ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ঃ কলিকাতা-১২ ৷